কবিগুরু গেটে

(চরিতকথা ও সাহিত্য-পরিচয়)

প্রথম খণ্ড

কাজী আবদুল ওদুদ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৩

মূল্য:
প্রথম খণ্ড ৫৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৩৷৷০

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

বাংলা ১৩৩৬ সালে ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য সমাজে" গ্যেটে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে এই গ্রন্থে অবতরণিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য গ্যেটের বিরাট জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই কল্যাণীয় আবদুল কাদির যখন ১৩৩৭ সালে তাঁর "জয়তী" প্রকাশ করেন তখন তাতে গ্যেটের কিছু বিস্তৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করি। "জয়তী" বন্ধ হয়ে গেলে "প্রদীপে" ও পরে "ছায়াবীথি"-র কয়েক সংখ্যায় এই লেখা চলে। এই ভাবে ধীরে সুস্থে ১৩৪১ সাল পর্যন্ত গ্যেটের প্রথম জীবনের পরিচয় একরকম দেওয়া হয়। সেই দিনে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহোদয় আমার জন্য গ্যেটে সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁর সেই প্রীতি আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

প্রায় সাত বৎসর পরে পুনরায় গ্যেটের আখ্যায়িকা আরম্ভ হয়—প্রধানত আবদুল কাদিরের আগ্রহে আর "শিশমহলে"র তরুণ সম্পাদকের তাগিদে। "শিশমহল" বন্ধ হয়ে যেতে দেরি হয়নি; কিন্তু এই মহাজীবনের প্রতি আমার নবীভূত অনুরাগ যে মন্দীভূত হয়নি এজন্য নিজেকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করছি।

গ্যেটে সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোনো গ্রন্থ নেই বল্লেই চলে—তেমন বিস্তৃত আলোচনাও নেই। কিন্তু বাংলার একালের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে গ্যেটের যোগ নিবিড়। বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন গ্যেটের জীবনের সমৃদ্ধি আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে যোগ তা এত গভীর যে তাকে আত্মিক যোগ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের মাত্র একজন বড় কবি নন, আমাদের একালের বাংলার বা ভারতের জীবন-সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর সেই সাধনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে আমাদের অতীত ও বর্তমানের বোধ, ভবিষ্যতের আশা, আর জগতের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ। এ সম্বন্ধে দেশের চিন্তাশীলরা ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছেন। হয়ত সেই চেতনাই আমাকে দুঃসাহসী করেছে একালের ইয়োরোপের ভাব ও জীবন-খনির এই মহামূল্য হীরকের সন্ধানী হতে: এই সুপরিজ্ঞাত ও সুপরীক্ষিত হীরকের সঙ্গে তুলনায় আমাদের নবলব্ধ হীরকের মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হবে এই আশায় আমি আশান্বিত হয়েছি; আর কালে কালে সবাই হয়ত এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের যে নবমানবিকতার সাধনা—New Humanism—পাশ্চাত্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল গ্যেটে, আর

প্রাচ্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ যার ব্যাপকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে।

এই গুরু ব্রতের উদ্‌যাপনায় যে সামর্থ্যের প্রয়োজন দুর্ভাগ্যক্রমে তার অভাব আমাতে যথেষ্ট। জার্মান আমি জানি না, তাতে গ্যেটের মূল রচনার সৌন্দর্য উপলব্ধির ভাগ্য আমার হয়নি। তবু পশ্চাৎপদ হইনি প্রধানত এই মহাপুরুষেরই অভয়দানে—তিনি বলেছেন অনুবাদে যে সাহিত্য মর্যাদাহীন হয় সে-সাহিত্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়,—আর তার সঙ্গে আমার অন্তরের এই প্রত্যয়ে যে এই প্রতিভার প্রতি রয়েছে আমার অশেষ শ্রদ্ধা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অনুবাদ ও অনুরাগ সাধারণত অবিশ্বাস্য, কিন্তু আসলে হয়ত এ দুটি কম নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা, সত্য দুজ্ঞের্য়, যা নিয়ে আমাদের কারবার তা মোটের উপর অনুবাদ আর অনুরাগের মতো ব্যাপার। অবশ্য এই অনুরাগের সত্যকার মূল্যও বিবেচ্য, তবে সে-বিবেচনার ভার আমার পরে নয়।

গ্যেটের সাহিত্যেরও পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি কেননা তাঁর জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁর অপূর্বসমৃদ্ধ জীবন আমার স্বদেশীয়দের সামনে উন্মোচিত করা—সেই জীবন পরমমনোহর রূপ ধারণ করেছে তাঁর সাহিত্যে। সেই জীবনকে খ্যাতনামা দিনেমার সাহিত্যিক ব্রাণ্ডেস (Brandes) বলেছেন উৎকৃষ্টতম মানবতার বিগ্রহ—the incarnation of humanity at its loftiest. বহুদিন পূর্বে কার্লাইল ও এমার্সন এই ধরণের মত ব্যক্ত করেছিলেন আর একালে ক্রোচেও প্রকারান্তরে এই মত সমর্থন করেছেন। আমরা এই মত পুরোপুরি স্বীকার করি আর না-ই করি এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নেই যে একালের মানুষের যে ব্যাপক জীবন-বোধ ও বিশ্ব-বোধ তার এক মহা মন্ত্রদ্রষ্টা ও দৃষ্টান্তস্থল এই গ্যেটে। পতিত ভারতের সৌভাগ্যক্রমে তারও কোলে একালে এমন দুই জীবনবাদী ও বিশ্ব-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন, আর তার দুর্ভাগ্যের বড় কারণ হয়ত এই যে এই বরেণ্য ভারত-সন্তানদের নির্দেশ আজো তাঁদের স্বদেশীয়দের অনেকের চোখে পরিচ্ছন্ন রূপ গ্রহণ করেনি। গ্যেটের স্বচ্ছ ও সবল মুক্তবুদ্ধি হয়ত আমাদের দেশকেও সাহায্য করবে জীবনের দায়িত্ব, প্রতিভা, ধর্ম, স্বদেশপ্রেম, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ ও যোগাযোগ, সব কথাই আরো ভাল করে' বুঝতে, যেমন ইয়োরোপের ও আমেরিকার চিৎ-প্রকর্ষ তাঁর প্রভাবে লাভবান হয়েছে। বুদ্ধ কবীর আকবর রামমোহন রবীন্দ্রনাথ—ভারতের এই পঞ্চ জাগ্রত আত্মার মণ্ডলে স্থায়ী আসন লাভ করুন ইয়োরোপের জাগ্রত আত্মা গ্যেটে।

যে শক্তিমান জাতির ভিতরে গ্যেটের জন্ম আজ তার গতি হয়েছে তাঁর নির্দেশের বিপরীত পথে। তাঁর স্বজাতির এই দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। জগতে এমন ঘটনা নূতন নয়! ভারতের ঋষি বলেছিলেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, কিন্তু সেই

ভারতে দেখা দিল উৎকট অস্পৃশ্যতা ; মুসলমানের লাভ হয়েছিল এই নির্দেশ—ধর্মে বল প্রয়োগ নিষেধ, কিন্তু মুসলমানের ইতিহাসে মতের অসহিষ্ণুতা আজো চোখে পড়বার মতো। এই সব অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-বিপত্তির ঊর্ধ্বে সত্য আর সত্যময় জীবনের প্রসন্ন অধিষ্ঠান—যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝার দুর্যোগে অবিচলিত সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রের মহিমা।

গ্যেটের প্রথম জীবনের কাহিনী তাঁর আত্ম-চরিত থেকে সংগ্রহ করেছি, আর তাঁর শেষ বয়সের "একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ" থেকে সংগ্রহ করেছি তাঁর বহু অমূল্য বাণী। তাঁর যেসব চরিতকারের সাহায্য গ্রহণ করেছি তাঁদের নাম গ্রন্থমধ্যে সসম্মানে উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে লুইস (Lewes) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের লোক, আর সবাই একালের লোক। কিন্তু পুরাতন হলেও লুইসের গ্রন্থ আজো মূল্যবান। ব্রাণ্ডেসের গ্যেটে-চরিতের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পরে তথ্যের দিক দিয়ে লুইসের মূল্য হয়ত কিছু হ্রাস পেয়েছে কিন্তু বিচারের দিক দিয়ে নয়। হিউম ব্রাউন (Hume Brown) বেশ সহজ সরল। পল কেরাসের (Paul Carus) বইখানি বহুচিত্রভূষিত, গ্যেটের বহু কবিতার অনুবাদও তাতে রয়েছে। রবার্টসনের (Robertson) দুইখানি গ্রন্থই কতকগুলো প্রবন্ধের সমষ্টি ; তাঁর Goethe in the Twentieth Century বইখানি আমার বেশী কাজে লেগেছে। লুড্‌ভিগের (Ludwig) গ্রন্থ বোধ হয় সব চাইতে জনপ্রিয়। তা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তাঁর মত সব সময়ে গ্রহণ করতে পারিনি। মনে হয়েছে তিনি কিছু বেশী তত্ত্বপ্রিয়। ক্রোচের (Croce) বইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু বিচারের পরিচ্ছন্নতায় সব চাইতে মূল্যবান। এক হিসাবে তাঁর গ্রন্থ লুড্‌ভিগের গ্রন্থের প্রতিবাদ। লুডভিগ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে গ্যেটে জীবনের প্রায় চিরকাল ধরে চলেছে দেবাসুরের তীব্র সংগ্রাম, কিন্তু ক্রোচে দেখাতে চেষ্টা করেছেন : গ্যেটের প্রতিভা অল্প বয়সেই এক অসাধারণ সমুন্নতি লাভ করেছিল আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ণ ছিল—সংগ্রাম এক হিসাবে চিরকালই তাঁর জীবনে চলেছিল কিন্তু অনিশ্চিত জয়-পরাজয়ের পালার অবসান হয়েছিল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। গ্যেটের জীবনের ঘটনা পরমঅর্থপূর্ণ হলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত এই মতের উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন।

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাজসাহী কলেজ গ্রন্থাগার ও কতিপয় বন্ধুর পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে ও সহৃদয় বন্ধুবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি। জার্মান গ্রীক প্রভৃতি নামের প্রতিলিখনে যথাসম্ভব ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবর্তী হয়েছি। তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

বইখানি যাঁদের কাছে আকারে বড় মনে হবে তাঁরা এটি ধারাবাহিকভাবে না

পড়ে যখন যেখানে খুশী পড়তেও পারেন। ভলটেয়ার তাঁর এক বড় বই এইভাবে পড়বার জন্য পাঠকদের আহ্বান করেছিলেন। আমি আহ্বান করছি আমার নিজের কৃতিত্বের স্পর্ধায় অবশ্য নয়—কেননা এ ক্ষেত্রে আমি মুখ্যত আহরণকারী—আমার বিষয়টি অসাধারণ ভাবে সারবান ও রসাল এই ভরসায়।

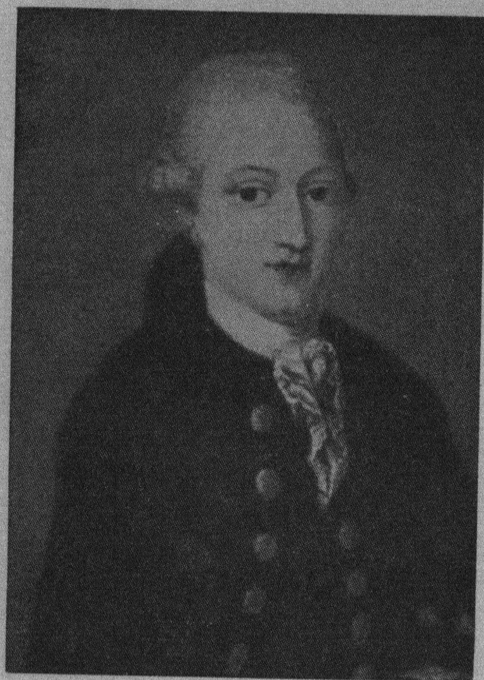
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

পুনশ্চঃ—স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় মূল "প্রাচ্য-প্রতীচ্য দিউয়ানে"র একটা বড় অংশের সঙ্গে আমার অনুবাদ মিলিয়ে দেখেছেন। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "জার্মান প্রাইমারে"র লেখক কবিবৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস মহাশয় অশেষ শ্রম স্বীকার করে মূল " ফাউস্ট" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, "প্রাচ্য-প্রতীচ্য দিউয়ানে"র অবশিষ্ট অংশ, আর "অনুরাগত্রয়ী"র সঙ্গে আমার অনুবাদ মিলিয়ে দেখেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্বত্রই মাজাঘষার প্রয়োজন হয়েছে খুব কম। এই সহৃদয় বন্ধুরা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। বন্ধুবর হরগোপাল মূল বইগুলো সংগ্রহ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর লেভি ও কলিকাতা-প্রবাসী জার্মান-দন্ত-চিকিৎসক ডক্টর পল এম্ ডক্টরের গ্রন্থাগার থেকে। এঁদেরও ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি।

ফাল্গুন, ১৩৫১

সূচী

চিত্র-সূচী



১৬ বৎসর বয়সে

অবতরণিকা

ক্রোচে তাঁর 'গ্যেটে' গ্রন্থে গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে নানা বিচার-বিশ্লেষণের পরে বলেছেন : সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমবর্ধনের ধারায় গ্যেটের কি স্থান তা নির্দেশ করতে তিনি অক্ষম। বলা বাহুল্য এই অক্ষমতার অন্য নাম আপত্তি, কারণ, তাঁর মতে, প্রত্যেক কবি হচ্ছেন এক একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা, আর তাঁর সৃষ্টির বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবনের সঙ্গে যার অবসান, পরে পরে যাঁরা আসেন তাঁরা যদি সত্যকার কবি হন তবে নতুন-কিছু সৃষ্টি করেন আর তা না হলে অনুকরণ করেন, কিন্তু অনুকারীর স্থান কাব্যের ইতিহাসে সত্যই নেই। তবু তিনি স্বীকার করেছেন :

> গ্যেটের কাব্যে, তাঁর সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যবিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবোধ চিত্তে প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল আধুনিকতার বহুদিক।

অনেক সাহিত্যিকই গ্যেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয় কার্লাইলের। তিনি তাঁর Hero and Hero-worship গ্রন্থে Hero as man of letters অধ্যায় গ্যেটের কথা দিয়ে শুরু করেছেন আর গ্যেটের প্রতিভা যে জগতে এক নূতন বিস্ময়, যে মরুভূমির মহামানবের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর প্রতিভার চাইতেও গ্যেটের প্রতিভা যে উচ্চতর গ্রামের, এসব কথা বলবার পর বলেছেন—গ্যেটের কথা থাকুক, আপাতত কেউ তাঁকে বুঝবে না, এই বলে' তিনি রুসো বার্ণস্ প্রমুখ সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য-কীর্তনে মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু ক্রোচে যে গ্যেটের প্রতিভাকে আধুনিকতার —modern spiritএর—এক বড় প্রতীক বলেছেন সেইটি বুঝতে পারলে গোটের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় খানিকটা হবে।

গ্যেটের ভিতরে এই যে সুবৃহৎ নূতন মন, বলা যেতে পারে, Renaissance-সূচিত মানসিকতার তা এক বড় পরিণতি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন ইয়োরোপের রেনেসাঁস (নবজন্ম) কয়েক শতাব্দীব্যাপী ঘটনা, বহু লক্ষণের দ্বারা জটিল, আর তা শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দের কাহিনীই নয় তার সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি কদর্যতাও—টলস্টয় তাঁর শেষ বয়সের কতকগুলো রচনায় যার দিকে তাঁর বলিষ্ঠ তর্জনী নির্দেশ করেছেন। তবু এ সত্য যে রেনেসাঁস-কাহিনী মোটের উপর মানুষের উষর চিত্তক্ষেত্রের শ্যামশ্রী ভূষিত হবার কাহিনী, মানুষের মর্ত্য-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুখ-সম্ভোগের এক মধুর গভীর কাহিনী। কিন্তু এই রেনেসাঁস-পুষ্পের সৌরভে ফ্রান্স ইতালী ইংলণ্ড

প্রভৃতি দেশে আমোদিত হলেও তুহিনাবৃত জার্মানী তা থেকে বহুদিন পর্যন্ত বঞ্চিত ছিল। যে'ড়শ শতাব্দীতে সেখানে দেখা দিল ধর্মান্দোলন—Reformation—আপাত-দৃষ্টিতে যা বহুদিক দিয়ে রেনেসাঁসের বিপরীতধর্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর যে Classicism – প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা—তারই সঙ্গে বরং রেনেসাঁসের আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্মানীর এই প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের পরিচয় লাভের চেষ্টা তার পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের বিপরীতধর্মী বোধ হলেও আসলে এটি রেনেসাঁস ও ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের এক সমন্বয়। এই প্রাচীন-গ্রীক-শিল্পের-পুনরুজ্জীবনবাদীদের সৌন্দর্যানুরাগ রেনেসাঁসের, কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশ-অনুরাগ, অন্য কথায় কল্যাণ-অনুরাগ, ধর্মসংস্কার আন্দোলনের। এই পুনরুজ্জীবনবাদীদের একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক লেসিঙের (Lessing) একটি উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য। শিল্পতত্ত্ব বোঝাবার জন্য তিনি লিখেছিলেন 'লাওকোওন' (Laokoon)—এক জগদ্বিখ্যাত বই যদিও আকারে ক্ষুদ্র—তিনিই বলেছিলেন :

> ঈশ্বর যদি এক হাতে পূর্ণজ্ঞান অন্য হাতে প্রয়াসের অনন্ত দুঃখ···এই দুটি নিয়ে বলেন, কোন্‌টি নেবে বল, তাহলে বল্‌বো, পিতঃ, প্রমাদহীন পূর্ণজ্ঞান তোমাতেই সাজে, আমাকে দান কর অনন্ত প্রয়াস।

একটা দেশের বা জাতির নবজন্মে প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য। বসন্তের আগমনে দেখা দেয় গাছে গাছে নতুন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখীর আনন্দ-গান, বর্ষায় দেখতে দেখতে নদীনালা ভরে' ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে; একটা জাতির নবজন্ম-কালে তেম্‌নি একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান-নবজন্মে দেখতে পাই—চিত্রের ক্ষেত্রে এজর (Æser) ভিঙ্‌কল্‌মান (Wincklemann), সঙ্গীতে মোৎসার্ট (Mozart) বেটোফন (Bethoven), সাহিত্যে লেসিঙ্‌ ক্লপষ্টক (Klopostock) ভীলাণ্ড্‌ (Wieland) হের্ডর (Herder) গ্যেটে (Goethe) শিলার (Schiller) শ্লেগেল (Schlegel), দর্শনে কাণ্ট হেগেল ফিক্‌টে শোপেনহাউয়র ইত্যাদি। এ যেন—দেখতে দেখতে গগন বিদীর্ণ করে' দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ বিরাট পর্বতমালা! বিশেষজ্ঞেরা বলেন এই শৃঙ্গমালার উচ্চতম মহত্তমটির নাম গ্যেটে।

লুইস বলেছেন :

> সাহিত্যিকদের চরিত্রে সাধারণত যে সব দুর্বলতা দেখা যায় সেসবের মধ্যে ঈর্ষা প্রধান, এই ঈর্ষা গ্যেটেতে ছিল না বলা চলে; যে সব গুণ মহত্ত্বের অলঙ্কার সেসবের মধ্যে ঔদার্য প্রধান, এই ঔদার্য গ্যেটেতে ছিল অপর্যাপ্ত।

এ আদৌ অতিরঞ্জন নয়। এই অসাধারণ প্রতিভা তাঁর প্রতিভার ভার অবলীলাক্রমে বহন করেছেন; কত সহজভাবে তিনি বলেছেন :

> শুধু নিজের উপরে নির্ভর করে' খুব উঁচুদরের প্রতিভাও বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু অনেক সাধুসংকল্প ব্যক্তি এই ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারে না, তার ফলে তাদের মৌলিকতার স্বপ্ন নিয়ে অর্ধেক জীবন তারা অন্ধকারে হাৎড়ে কাটায়।···আমি যা করতে পেরেছি তা শুধু আমার নিজের জ্ঞানের ফলেই নয়, আমার চারপাশের শত সহস্র ব্যাপার ও ব্যক্তি আমাকে যেসব উপকরণ জুগিয়েছে তারও ফলে। মূর্খ ও পণ্ডিত, উদার মন ও সংকীর্ণ-মন, বালক যুবক বৃদ্ধ, সবারই কাছ থেকে জেনেছি কি তারা অনুভব করেছে, ভেবেছে, কেমন করে' তারা জীবন কাটিয়েছে. কাজ করেছে, আর কি অভিজ্ঞতা তাদের লাভ হয়েছে। অপরে যে-ফসল পত্তন ক'রে গেছে, হাত বাড়িয়ে তা সংগ্রহ করার চাইতে বেশী-কিছু আমি করিনি।

তাঁর পূর্ববর্তী ভিঙ্কল্‌মান্‌ লেসিঙ্‌ হের্ডর প্রভৃতির কাছে তাঁর ঋণ বারবার তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু এ সত্য যে গ্যেটে যদি এমন অপরিসাম-কীর্তি-মণ্ডিত না হতেন তবে তাঁর পূর্ববর্তীদের মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হবার সুযোগ কম ঘট্‌তো—যেমন কোনো পরিবারকে লোকচক্ষে গৌরব-মণ্ডিত করে তার বহু স্বল্পকীর্তি সন্তান নয় তার একজন অতুলকীর্তি সন্তান।

তাঁর গুরুদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের সঙ্গে রুসোর নামও উল্লেখযোগ্য। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বনামধন্য দার্শনিক স্পিনোজার নাম। কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তাঁর এই গুরুরা যতখানি তার চাইতে অনেক বেশী তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা—বিশেষ করে' তাঁর প্রণয়-ব্যাপার। এই প্রেমের দহন তিনি প্রায় সারাজীবন ভোগ করেছেন। বাস্তবিক গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে এই দুই ধারা প্রবলভাবে বিদ্যমান—একটি জ্ঞান-অন্বেষণ, অপরটি প্রেম-বিধুরতা।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিহাসে খুব বড় জায়গা দখল করে' আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁকে ভুল বোঝা এতই স্বাভাবিক যে তাঁর স্বদেশ-বাসীরাও বহুকাল পর্যন্ত তাঁকে হীন রঙে রঞ্জিত করে' এসেছেন। আমাদের জন্য ব্যাপারটি আরো জটিল এইজন্য যে আমাদের সংস্কার অনেক বিভিন্ন তা যতই কেন আমরা ইয়োরোপের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন না হই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ফন্‌ ষ্টাইন-পত্নীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্ক। তাঁর চরিতকারদের কেউ কেউ এটিকে বলেছেন এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক—আত্মিক প্রেম, অপরে এ মত স্বীকার করেন নি। তেম্‌নিভাবে অদ্ভুত বৃদ্ধ বয়সে যুবতী বন্ধুপত্নী মারিয়ানা ফন ভিলেমার-এর সঙ্গে তাঁর প্রীতির যোগ যা

বিশেষ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল ইরাণী-কবি হাফিজের অনুসরণে তাঁর সুবিখ্যাত প্রতীচ্য-প্রাচ্য দিউয়ান (West-Eastern Divan) রচনায়। কিন্তু এসবের জন্য যাঁরা তাঁকে স্বৈরাচারী বলতে চান তাঁদের মত গ্রহণ করতে অনেক সাহিত্যিকের মতো আমাদেরও বেধেছে বিশেষ করে' এই কারণে যে কবির অন্তরাত্মা প্রতিফলিত হয় যাতে সেই কাব্যে গ্যেটে যেসব প্রেমের ছবি অঙ্কিত করেছেন সেসবে ফুটেছে অপরিসীম পবিত্রতা আর অলোভ। এখানে দু'টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর নবযৌবনের 'তরুণ ভের্টরের দুঃখ' এ (Sorrows of young Werther) নায়ক ভের্টর বিবাহিতা শার্লোটের প্রতি অনুরাগে আত্মহারা, সে এক জার্মান মজনু; কিন্তু সেই ভের্টরই শার্লোটকে লক্ষ্য ক'রে এক জায়গায় বলছে :

> তার প্রতি আমার ভালবাসা নিষ্পাপ, পরম পবিত্র নয় কি? আমার অন্তরাত্মা কি কখনো একটি পাপচিন্তার দ্বারাও কলুষিত হয়েছে?

আর তাঁর বৃদ্ধ বয়সের 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী' (Elective affinities) উপন্যাসে নায়ক এডুয়ার্ড তার স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে ওটিলীর প্রেমে পাগল হয়েছে; কিন্তু ওটিলী তার কাছে দেববিগ্রহের মতো পবিত্র, ওটিলীর একটু ইঙ্গিতে কঠোরতম সংযমে সে নিজেকে বাঁধছে।

ক্রোচে বলছেন বটে 'ফাউসট' প্রথমখণ্ডে মার্গারেটের সম্পর্কে ফাউসটের লোভ উৎকট হয়ে উঠেছে, ফাউসট তার সমস্ত জ্ঞানতৃষ্ণা বিস্মৃত হয়ে দূতীর সাহায্যে মার্গারেটকে আয়ত্ত করছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে ক্রোচে এক্ষেত্রে কিছু অতিশয়োক্তি করেছেন। দূতী এবং তার আনুষঙ্গিক কদর্যতা অবশ্য অপরিহার্য, কিন্তু প্রথম কয়েক দৃশ্যের বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর ও সবল-চিত্ত ফাউসট বাস্তবিকই যে বদলে ভোগলিপ্সু হয়ে পড়েছে তা সত্য নয়। মার্গারেটের প্রেমে বাস্তবিকই সে আত্মহারা, মার্গারেটের কক্ষে গোপনে প্রবেশ করে' সে নিজের ভিতরে এক রহস্যময় পরিবর্তন অনুভব করছে :

> আর আমি? কিসের প্রবল আকর্ষণ আমাকে এখানে এনেছে?
> কি গভীর আন্দোলন চলেছে এখন আমার অন্তরে!
> কি চাই আমি? কেন হৃদয় আমার এমন উদ্‌বেলিত ও ব্যথিত?
> হায় ফাউসট! চেনা যায় না আর তোমাকে।
>
> •
>
> এখানে কি কোন জাদু-বাষ্প আছে?
> আশুতৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম
> কিন্তু প্রেমের স্বপ্নরসে আমি এখন নিমজ্জিত!
> হাওয়ার প্রতি পরিবর্তনের খেল্‌না কি আমরা?

গ্যেটের অগণিত প্রেম-কাহিনীর তাৎপর্য বোঝা কিছু সহজ হবে তাঁর এই সব উক্তি স্মরণে রাখলে :

পবিত্র বন্ধনে ধরা দিতে চ ও না—
তাহলে হে যুবক অভ্যস্ত হও সংযমে।
এইভাবেই রক্ষা পাবে তোমার স্বাধীনতা,
আর প্রেমহীন হবে না তোমার অন্তর।

ভাল সে বাসে না কাউকে ;
তার প্রেমের স্বপ্নকে সে দিয়েছে আমাদের নাম।

বৃথা গর্জন করে প্রবৃত্তির বন্যা
কঠিন অজিত উপকূলের সামনে,
বেলাভূমে ছড়ায় তা কবিত্বের মুক্তা -
লাভ হয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত ধন।

কিন্তু এমনিভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থন করা সম্ভবপর হলেও আমাদের দেশে নর-নারীর এমন সম্বন্ধ কল্পনা করা সহজ কি ? তবে যেদিন আমরা নারীর ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি স্বীকার করবো সেদিন হয়তো আমাদেরও ধারণা করা কঠিন হবে না যে গ্যেটের প্রেম ও প্রয়াস মানুষের সাধারণ জীবনেরই ব্যাপার।

ফরাসী ভাবুক এমিয়েল গ্যেটে সম্বন্ধে বলেছেন :

তিনি হচ্ছেন গৌরব-যুগের গ্রীক, ধর্মবোধের আত্মিক বেদনা তাঁর কাছে অজ্ঞাত…জগতের বঞ্চিত দুর্বল ও অত্যাচারিতদের প্রতি তিনি প্রকৃতির মতোই উদাসীন।

কিন্তু গ্যেটে সম্বন্ধে এই ধরণের মত—এক সময়ে বহুলপ্রচলিত—যে অভ্রান্ত নয় তা এমিয়েল নিজেই সেদিনের ডায়ারির শেষে ব্যক্ত করেছেন :

এই সব জটিল প্রকৃতির লোকদের সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি একটা ধারণা করা অনুচিত।

এই ধরণের মত সম্পর্কে গ্যেটের এই উক্তিটি স্মরণীয় :

যে সব চাইতে অনুভূতি-প্রবণ কেবল সে-ই হতে পারে সব চাইতে কঠিন ও নির্বিকার ; কেননা তার পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্মে আবৃত করা…আর বহু সময়ে এই বর্মে সে পীড়া বোধ করে।

বলা হয়েছে গোটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেম-বিধুরতা ও জ্ঞান-অন্বেষণ

বিদ্যমান। এ ব্যাপারটি গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের গভীর অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর একটি চেতনা যেন বসে' বসে' তাঁর সেই মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য বাস্তবপ্রীতি— এই যেন গ্যেটে-প্রতিভার সবখানি কথা। তাঁর গুরু ও বন্ধু মের্ক (Merk) তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন: বাস্তব যা তুমি তাকে দাও কাব্যরূপ। তাঁর কাব্যসৃষ্টির এর চাইতে সুন্দর পরিচয় আর দেওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর এই বাস্তবপ্রীতি কেন তথাকথিত বস্তুতন্ত্রতায় পরিণত হলো না সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই:

> প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ; সে একই সঙ্গে তার প্রভু ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝাবার জন্যে; আর প্রভু এই কারণে যে এইসব পার্থিব সামগ্রী সে উপায়স্বরূপ ব্যবহার করে তার উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে। সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তার মনোভাব ব্যক্ত করে। এই সমগ্রতা কিন্তু প্রকৃতিতে নেই; এটি শিল্পীর নিজের মনের ফল, অথবা ফলসঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা।

গ্যেটের এই ধরণের মতামত অনুসরণ করে' ডক্টর রুডোল্‌ফ্ ষ্টাইনর গ্যেটে সম্বন্ধে একটি ছোট বই লিখেছেন, তাতে গ্যেটেকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন এক নব সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা রূপে। তার মূল কথা কতকটা এই: প্রকৃতির ভিতরে বুঝতে পারা যায় এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, মানুষের জীবনে রয়েছে তারও চাইতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত—শিল্পীর রচনায় তারই প্রকাশ। এ সম্পর্কে তিনি গ্যেটের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন:

> প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে', তার কাজ হচ্ছে অন্তর লোকে আর এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার শক্তির উৎকর্ষসাধন করে,—সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপণায় নিজেকে করে ভূষিত, নির্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ এসবের হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্পসৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম ও কীর্ত্তির পাশে লাভ করে এক বিশেষ মর্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস সত্য রূপে তা'হলে এর লাভ হয় এক স্থায়ী প্রভাব—শ্রেষ্ঠতম প্রভাব—কেননা বহু শক্তির সম্মেলন-ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি রূপে এ যে নিজেকে বিকশিত করে' তোলে সেইজন্য জীবনে যা কিছু শ্রেয় প্রেয় ও গৌরবের সে-সবই এর নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এইভাবে মনুষ্য-মূর্ত্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে' মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও

কর্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত-ও-ভবিষ্যৎ-সমন্বিত বর্তমানে তাকে দান করে দেব-মহিমা।

ডক্টর ষ্টাইনর তাঁর বইখানিতে শেষ মন্তব্য করেছন এই :

সৌন্দর্য পার্থিব আবরণে এক দিব্য সামগ্রী নয় বরং দিব্য আবরণে সত্য।

'একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে গ্যেটের আরো বহু উক্তি আমরা পাব; তাঁর এই কয়েকটি গভীর উক্তি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য :

সাময়িক কবিতাই আদি ও সব চাইতে অকৃত্রিম কবিতা।

প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম ও শেষ দাবি সত্য-প্রীতি।

প্রত্যেক ব্যাপারে আমি এমন কিছু খুঁজি যা থেকে
প্রভূত বিকাশ সম্ভবপর।···বন্ধ্য সত্য সত্য নয়।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় Poetry শীর্ষক লেখায় কবি-দৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: Absolute Vision—শুদ্ধদৃষ্টি, আর Relative Vision—আপেক্ষিক দৃষ্টি। এই শুদ্ধদৃষ্টির দৃষ্টান্ত লেখক দেখেছেন শেক্‌স্‌পীয়রে ও হোমরে। শুদ্ধদৃষ্টি বলতে তিনি বুঝেছেন বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি ও বিবৃতি—কবি নিজের রাগদ্বেষ একেবারে ভুলে গিয়ে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির মর্মে প্রবেশ করে' তাকে বুঝছেন, রূপায়িত করছেন।—এইভাবে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে শুদ্ধদৃষ্টি লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি না, অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়র ও হোমর তাঁদের এই শুদ্ধদৃষ্টির মুহূর্তেও শেক্‌স্‌পীয়রত্ব ও হোমরত্ব বর্জিত হয়েছিলেন কি না, সহজেই বোঝা যায়, তা সন্দেহের বিষয়। তবে এই আত্মবিলোপ মানুষ হিসাবে কবির পক্ষে যতখানি সম্ভবপর সেদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সত্যকার শুদ্ধদৃষ্টি, অর্থাৎ মানুষের মনের বহু স্তরের বহু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে যথাসম্ভব অনাবিল চেতনা, গ্যেটের চাইতে হোমরে ও শেকস্‌পীয়রে বেশী নয়।†

যৌবনেই গ্যেটে বলেছিলেন :

আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব মন্দ হব, তোমাদের যত আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

এই যাঁর সাধনা, প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় কবিত্ব, কাব্য-সৌন্দর্য, তাতেই যে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তা সম্ভবপর নয়। ঘটেছেও তাই; গ্যেটে শুধু কবি নন। তিনি বিজ্ঞানবিৎ—বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে—চিত্র-সমঝদার, শেষ বয়সে

† ফাউস্‌ট দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, এমন কি মরমী সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত। আর তাঁর এই বহুমুখী জ্ঞান ও অনুভূতি সামঞ্জস্য লাভ করে' তাঁর ব্যক্তিত্বকে দান করেছে এক অপরূপ মহিমা। জনৈক আধুনিক ইংরেজ লেখক (John Macy : The Story of the World Literature) তাঁর প্রতিভার মর্যাদা নিরূপণ করেছেন এইভাবে :

> আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি, যে কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন। যাঁরা নৈতিক পদ্ধতির চাইতে কাম্য জ্ঞান করেন নৈতিক শক্তি, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে চান আন্তর্জাতিক সহযোগ, সাহিত্যে জীবনে রাজনীতিতে ও চিন্তায় স্বপ্নচারিতার চাইতে বেশী মর্যাদা দেন প্রয়োজনের অনুশীলনকে, তাঁরা এই একটি লোকের জীবন দৃষ্টান্ত ও রচনা থেকে—যার দৈবাৎ-রচিত চিঠিপত্র ও বচন কণিকাও এইসব রচনার অন্তর্ভুক্ত—অফুরন্ত প্রেরণা বীর্য ও আলোক লাভ করবেন।

গ্যেটে নিজেও বলেছেন :

> যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের মর্মগ্রাহী হয়েছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি এক প্রকার চিত্তের স্বাধীনতা লাভ করেছেন।

প্রচলিত ধর্মে আস্থাবান্ না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন তার গৌরব অসাধারণ। ফাউসটের মুখে (তার প্রিয়া গ্রেটখেনের প্রতি) তাঁর এই উক্তি ভাবুকদের জন্য বিস্ময় ও আনন্দের প্রস্রবণ :

> স্পর্ধা কার তাঁকে ব্যক্ত করবে !
> বলবে কে : তাঁকে জানি, তাঁতে বিশ্বাস রাখি !
> অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে
> অস্বীকার করবে কে তাঁকে ! বলবে কে বিশ্বাসী তাঁতে নই !
> সর্বধর
> সর্বাশ্রয়
> ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে আমাকে নিজেকে ?
> মাথার উপরে নেই কি আকাশের খিলান ?
> পায়ের নীচে অবিচলিত ধরণী ?
> সামনে জলছে না কি বন্ধুর-মতো-চেয়ে-থাকা চিরদিনের তারা ?
> চোখ কি আমার তাকাচ্ছে না তোমার চোখে দেখছে না তোমাকে ?
> অনুভব কি করছ না তুমি মনে প্রাণে

তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির লীলা
—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য ?
পূর্ণ হোক সেই বিরাট শক্তির দ্বারা তোমার হৃদয়।
আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে তখন নাম দিয়ো এর—
আনন্দ হৃদয় প্রেম ভগবান্—যা খুশী।
আমি অক্ষম এর নাম দিতে!
অনুভূতিই আমার সব :
নাম শুধু কোলাহল ও কুহেলি,
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় আচ্ছন্ন।

ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অপর দুটি বিখ্যাত উক্তি এই :

যারা ধর্মপ্রাণ সৃষ্টিধর্মী হতে পারে কেবল তারাই।

যদি ভালবেসে থাক বিজ্ঞান আর শিল্প
তবে অন্তরে পেয়েছ ধর্ম,
যদি প্রয়োজন বোধ না কর এর কোনোটিতে
তবে বন্ধু, ধর ধর্মের পথ।

গ্যেটের ভিতরে স্বজাতি-প্রেমের তীব্রতা ছিল না। এজন্য তাঁকে কম নিন্দা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু মনীষী ক্রোচে এতে মহা আনন্দিত হয়েছেন :

মহাকবিরা হচ্ছেন আশা ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ, সেই মহাকবিদের মধ্যে এমন একজনও যে আছেন যিনি মানবপ্রকৃতির সর্বক্ষেত্রের জ্ঞানে অদ্বিতীয় হয়েও জাতিতে জাতিতে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের বহু ঊর্ধ্বে নিজের চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, এ এক মহা সৌভাগ্য বলে' আমি জ্ঞান করি।

গ্যেটের আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃত পরিচয় আমরা পরে পাব; এ সম্পর্কে তাঁর দু'টি বিখ্যাত বাণী এই :

জাতীয় সাহিত্য এখন প্রায় এক অর্থহীন কথা। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন হয়েছে, আর প্রত্যেকেরই উচিত তাকে এগিয়ে আনা।

মোটের উপর বিজাতি-বিদ্বেষ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশী। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে অনুভাবকের স্থান লাভ হয় অনেকটা জাতীয়তার ঊর্ধ্বে, পড়শী জাতির দুঃখ-বিপত্তি তখন তার

মনে হয় স্বজাতির দুঃখ-বিপত্তির মতো। চিত্তোৎকর্ষের এই স্তরের সঙ্গে আমার প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল।

মধ্যযুগে মানুষকে জ্ঞান করা হতো ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব—microcosm. প্রত্যেক মানুষ এমন ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব কি না বলা কঠিন, তবে গ্যেটে যে একটি ক্ষুদ্রায়তন বিশ্ব তা যথার্থ। প্রকৃতির প্রবলতা আর অকৃত্রিমতা আর মানব-প্রকৃতির সন্ধানপরতা, দুয়ের অপূর্ব মিলন ঘটেছে তাঁর জীবনে ও প্রতিভায়, আর এর কোনোটি ক্ষুণ্ণ হয়নি তাঁর মধ্যে।

গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য বিবেচিত হবে হয়ত সর্বকালে।

কৈশোর

পিতৃগৃহ

কবিগুরু গোটের জন্ম হয় ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৮ অগাস্ট তারিখে মধ্যাহ্নে—জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্ট (Frankfort on Maine) নগরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। তাঁর নামকরণ হয় য়োহান ভোল্ফ্‌গাঙ্‌ গোটে (Johann Wolfgang Goethe)। আত্ম-চরিতে তিনি লিখেছেন, যে ক্ষণে তাঁর জন্ম জ্যোতিষশাস্ত্র মতে তা শুভক্ষণ। জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর এই মত লুড্‌ভিগের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে :

> ফলিত জ্যোতিষের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বজগতের যোগাযোগ সম্বন্ধে এক অস্পষ্ট ধারণার উপরে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, আবহাওয়া গাছপালা ইত্যাদির উপরে নিকটবর্তী গ্রহ-উপগ্রহের বিশেষ প্রভাব রয়েছে; আর মানুষের বিবর্তন ও বিকাশ যখন ক্রমে ক্রমে ঘটে তখন গ্রহ-উপগ্রহের সেই প্রভাব যে কোন্ স্তরে নিঃশেষিত হয় তা বলা অসম্ভব। মানুষের ভবিষ্যৎ-বোধই তাকে ভাবতে প্রলুব্ধ করে যে সেই প্রভাব তার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যরূপ সামাজিক ব্যাপারের উপরেও রয়েছে। এ'কে কুসংস্কার বলতে চাই না—আমাদের স্বভাবের সঙ্গে এর এত নিকট-সম্পর্ক। অন্যান্য বিশ্বাসের মতো এটি দিয়েও কাজ চলে।

আত্মচরিতে গোটে তাঁর বাল্যজীবনের যে-ছবি অঙ্কিত করেছেন তা একান্ত হৃদয়গ্রাহী। তেমন অঙ্কনকুশলতা আছে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে ও 'ছেলেবেলা'য়, তবে গোটের আত্মচরিতের তুলনায় এসব গ্রন্থ স্বল্পপরিসর। এই বাল্যজীবনের দুইটি ব্যাপার সব পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে : একটি, তাঁর স্বভাবদত্ত প্রতিভা, অপরটি তাঁর পিতার শিক্ষা-ব্যবস্থা। তাঁর পিতা য়োহান কাস্‌পার গোটে (Johann Kaspar Goethe) সুশিক্ষিত, শিল্পানুরাগী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমজীবনে তিনি আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করেন, কিন্তু তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেন না। তাঁর পুত্র যাতে সফলতা লাভ করতে পারে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কতকটা তাঁর সাধনার বিষয়। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় চৌদ্দ বৎসর বয়সে ভোল্ফ্‌গাঙ্‌ মাতৃভাষা ভিন্ন ফরাসী, ইতালীয়, লাতিন, হিব্রু ও ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেন, এ ভিন্ন কবিতা-রচনা অসিচালনা নৃত্য চিত্রাঙ্কন ইত্যাদিতেও কিছু কিছু পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর ফ্রাঙ্কফোর্টে জন্মও তাঁর প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল হয়েছিল—সে-সময়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট ছিল এক বিশ্ব-বন্দর।

তাঁর বালক-কালের দুইটি ঘটনায় রয়েছে তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য পরিচয়। তাঁর বয়স যখন ছয় সাত বৎসর তখন সুপ্রসিদ্ধ লিস্‌বন-ভূমিকম্প ঘটে। মানুষের উপরে সেই বিপৎপাত তাঁর বালক-হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সবারই মুখে যিনি দয়াল প্রেমময় ইত্যাদি আখ্যায় সর্বদা ভূষিত হন তাঁর সামনে এমন নিদারুণ ব্যাপার কেমন করে ঘটতে পারে এ-চিন্তা তাঁর মনকে কিছুকাল ভারাক্রান্ত করে' রাখে। কিন্তু তাঁর স্বভাবত-আনন্দময় ও সৌন্দর্য্যানুরাগী মনে এ দুশ্চিন্তার ভার স্থায়ী হয়নি। এর উপরে ধর্ম সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ সর্বদাই তিনি তাঁর চারপাশের লোকদের মুখে শুনতেন। এ-সবের ফলে ওল্‌ড্ টেস্‌টামেণ্টের ক্রোধী দণ্ডধারী ঈশ্বরে অপ্রত্যয় ও প্রকৃতির অধীশ্বর শান্তসুন্দর জগৎপ্রভুতে প্রত্যয় তাঁর মনে প্রবল হতে থাকে। এই শান্তসুন্দর বিশ্ব-প্রকৃতির অধীশ্বরকে কেমন করে' তাঁর অন্তরের পূজা নিবেদন করবেন সে-কথা ভাবতে ভাবতে এক অভিনব পূজা-পদ্ধতি তাঁর বালক মনে খেলে। তাঁর সংগ্রহে বহু খনিজ-দ্রব্য ছিল। বালক-পূজারি ঠিক করলেন সেই সব খনিজ দ্রব্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক স্বরূপ একটি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাবেন। কিন্তু কেমন করে' মানুষের মনের স্তব ব্যক্ত হবে? শেষে ঠিক হলো চিত্রাঙ্কণের জন্য তাঁর যে প্যাস্‌টেল-পেন্সিল আছে ধাতুদ্রব্যের উপরে তা দাঁড় করিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন—তা থেকে যে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে তাই হবে মানুষের স্তবের প্রতীক। এক সুন্দর প্রভাতে এইভাবে তিনি তাঁর পূজা নিবেদন করলেন—প্যাস্‌টেল-পেন্সিলে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্যের দিকে আতস-কাচ ধরে'। তাঁর এই স্তব-নিবেদনের এক মন্দ ফল ফলেছিল—প্যাস্‌টেল-পেন্সিল পুড়ে গিয়ে সেই সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরে' তাকে বিকৃত করেছিল। এর উপরে গ্যেটে এই সুগভীর মন্তব্য করেছেন:

> এই ধরণের ঈশ্বর-লাভের কামনায় সর্বদা যে বিপদ বিদ্যমান এই দুর্ঘটনাকে গণ্য করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে এক সঙ্কেত ও সাবধান-বাণীর তুল্য।

অপর ঘটনাটি এই। ছেলেবেলা তিনি বাড়ীতেই পড়াশুনা করতেন, এক সময়ে অল্প কিছু দিনের জন্য এক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। একদিন তাঁর সহপাঠীরা এই বলে' তাঁকে জব্দ করতে চেষ্টা করে যে তাঁর পিতা তাঁর পিতামহের পুত্র নন অন্য কোনো ধনীর পুত্র। (তাঁর পিতামহ দর্জি-ব্যবসায়ী ছিলেন ও সেই ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করেন।) কিন্তু সহপাঠীদের এই নির্মম কথায় বালক-গ্যেটে শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন: এই যদি সত্য হয় তাতেও ক্ষতির কিছু নেই; জীবন এমন এক মহা দান যে কার কাছে এই জীবনের জন্য মানুষ ঋণী সে কথা সে না ভেবেও পারে, কেননা, অন্তত এইটুকু সত্য যে ঈশ্বরের কাছ থেকেই তা এসেছে আর তাঁর সামনে সবাই সমান।

ার বালক-বয়সের কোনো কোনো ঘটনায় রয়েছে তাঁর জন্মগত সৌন্দর্য-বোধের

পরিচয়। তাঁর বয়স যখন তিন বৎসর তখন নাকি এক কুৎসিত শিশুকে দেখে তিনি কান্না আরম্ভ করেন, সেই শিশুটিকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁর কান্না থামে নি। মাংসের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে তাঁর গায়ে কাঁটা দিত, আর নদীর পুলের উপরে বেড়াতে তাঁর খুব আনন্দ বোধ হতো।

বালক-বয়সেই তিনি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য তাঁর পিতা অনেকসময়ে বলতেন—তাঁর মতো স্বভাবদত্ত গুণপণা থাকলে তিনি (পিতা) জীবনে অনেক কিছু করতে পারতেন।

পিতা যত্ন নিয়েছিলেন তাঁর মনঃশক্তি বিকাশের, আর তাঁর গুণবতী মাতার যত্নে লালিত হয়েছিল তাঁর কল্পনা ও অনুভূতি। তাঁর মাতার প্রকৃতিতে হাসিখুশীর প্রাচুর্যের সঙ্গে মিশেছিল কাণ্ডজ্ঞান ও অসাধারণ শান্তিপ্রিয়তা। ভৃত্যদের উপরে তাঁর আদেশ ছিল কোনো দুঃসংবাদ যেন তাঁর কাছে বহন করা না হয়। বিশেষ করে' তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসামান্য। ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌-এর শৈশব-কল্পনা মাতার অফুরন্ত রূপকথার রসে রসায়িত হয়েছিল।

তাঁর বাল্যকালেই ইয়োরোপে 'সাত বৎসরের যুদ্ধ' আরম্ভ হয়; ফ্রাঙ্কফোর্টে ফরাসী সৈন্যের আগমন ঘটে ও সেই সৈন্যদলের অধ্যক্ষ তাঁদের গৃহেই দীর্ঘকাল বাস করেন। এই সূত্রে ফরাসী নাট্যকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর সম্মানিত মাতামহ (এঁর কুল ছিল কবির পিতৃকুলের চাইতে সম্ভ্রান্ততর) তাঁকে একপ্রস্ত বড় খেলনা দিয়েছিলেন, সেগুলোর সাহায্যে বাইবেলের কোনো কোনো ঘটনা নাটকাকারে দেখানো যেতো। এ-সবের ফলে অল্প বয়সেই নাট্যকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। তাঁর 'ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার' উপন্যাসের সূচনায় এই পুতুল-নাট্যের দীর্ঘ বিবৃতি রয়েছে।

লাইপ্‌ৎসিগ্‌

ষোলো বৎসর বয়সে গ্যেটে লাইপ্‌ৎসিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি আইন অধ্যয়ন করবেন কিন্তু কবি নিজে মতলব আঁটেন সাহিত্য অধ্যয়ন করতে, উদ্দেশ্য, শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনা 'নোট' নেওয়া বেশ চল্‌লো। কিন্তু এ উৎসাহ মন্দীভূত হতে দেরী হলো না। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন :

> দর্শনে আমি কোনো আনন্দ পেতাম না, আর তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে এই অদ্ভুত মনে হতো যে কিশোর কাল থেকে যে সমস্ত চিন্তা-প্রক্রিয়া আমি অবলীলা-ক্রমে সম্পাদন করে এসেছি যথাযথভাবে বুঝবার জন্য এখন করতে হচ্ছে সেই সবেরই চুলচেরা ভাগ, অর্থাৎ বিনাশ। বস্তুর স্বরূপ, বিশ্বজগৎ,

ঈশ্বর, এ-সব সম্বন্ধে মনে হতো আমার জানাশোনা অধ্যাপকের চাইতে বেশী কম নয়। ফলে অনেক জায়গায়ই খুব মুশকিলে পড়ে যেতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই :

অধ্যাপকবর্গ সবাই এক বয়সের হতে পারেন না। যাঁরা বয়সে নবীন তাঁদের পড়ানোর অন্য নাম হচ্ছে শেখা; এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাবান্ তাঁদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে, তাঁরা সেই সবেরই ব্যাখ্যা করে' চলেন যাতে ছাত্রদের নয় তাঁদের নিজেদের প্রয়োজন, ফলে ছাত্রদের কোনো উপকার হয় না। যাঁরা প্রবীন অধ্যাপক তাঁদের অনেকের মানসিক উন্নতি বহুদিন হলো থেমে গেছে, তাঁরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মতামত ব্যক্ত করে চলেন কিন্তু সে-সবের বেশীর ভাগ অকেজো হয়ে পড়েছে। এই নবীনে প্রবীনে লাগে ধ্বস্তাধ্বস্তি, আর এই দুয়ের মাঝে পড়ে ছাত্রদের মনে চলে টানা-হিঁচড়া। এই সঙ্কটে মধ্যবয়সী অধ্যাপকদের কাছ থেকেও তারা তেমন কোনো উপকার পায় না, এঁরা যথেষ্ট বিজ্ঞ ও মার্জিতরুচি, কিন্তু এঁদের প্রবণতা জ্ঞান-আহরণ ও মনস্বিতার দিকে।

বলা বাহুল্য 'ফাউসটে'র মেফিসটোফিলিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-বাণে তীক্ষ্ণতা জুগিয়েছিল কবির নিজের ছাত্র-জীবনের এইসব অভিজ্ঞতা।

কিন্তু ক্লাসের পড়াশুনায় অমনোযোগী হলেও তাঁর মানস-উৎকর্ষ ব্যাহত হয়নি। অধ্যাপক ব্যোমে-র (Bohme) বিদুষী পত্নী তাঁকে স্নেহ করতেন। তিনি বড় কঠোর সমালোচক ছিলেন, সমসাময়িক অনেক কবিযশঃপ্রার্থীর প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরূপ। গ্যেটের প্রিয় ভাববিলাসী তরুণ কবিরা তাঁর হাতে লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করতেন। তাঁর নিজের রচনা অনেক সময়ে তিনি তাঁর এই গুরুপত্নীর কাছে পাঠ করতেন অপরের রচনা বলে', কিন্তু সে-সবও তাঁর কঠোর মন্তব্য থেকে নিস্কৃতি পেতো না। ছেলেবেলা থেকে যিনি সবার কাছে পেয়ে এসেছেন অযাচিত প্রশংসা তিনি এখন এই সমালোচকের সামনে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন! কিছুদিন দারুণ মানসিক অস্বস্তি ভোগ করে' শেষে একদিন তাঁর সমস্ত রচনা জ্বলন্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করলেন।

সাজপোষাক সম্বন্ধেও তাঁর এক কঠোর শিক্ষালাভ হয়। খুব দামী ও জমকালো পোষাক তিনি পরতেন। তাই নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা করলে গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু একদিন থিয়েটারে গিয়ে দেখলেন তাঁর মতো পোষাক পরে একজন সঙ সেজেছে।

এখানে শেক্‌স্‌পীয়র, রাসীন (Racine), প্রভৃতির রচনার সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় হয়। কিন্তু শিল্পচর্চার দিকেই তিনি বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন। শিল্পে

তাঁর গুরু ছিলেন এজর—স্বনামধন্য ভিঙ্‌কল্‌মানের গুরু ও বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

> তাঁর উপদেশ প্রভাব বিস্তার করে' চলবে আমার সমস্ত জীবনের উপরে। তিনিই শিখিয়েছিলেন: সৌন্দর্যের আদর্শ হচ্ছে অনাড়ম্বর ও প্রশান্তি, সেজন্যে এতে তরুণের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

এই সময়ে জার্মানসাহিত্যরথী লেসিঙের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পসমালোচনা গ্রন্থ 'লাওকোওন' প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থখানি অনেক অজার্মান সাহিত্যিকের জীবনেও প্রেরণা জুগিয়েছে। গ্যেটে বলেছেন:

> লেসিঙের 'লাওকোওনে'র প্রভাব আমাদের উপরে কি ধরণের হয়েছিল তা বুঝতে হলে যুবক হতে হবে। অস্পষ্ট বোধের স্তর থেকে এই বই আমাদের নিয়ে গিয়েছিল মননের উন্মুক্ত রাজ্যে।

বইখানি পড়ে প্রাচীন শিল্পসমূহ স্বচক্ষে দেখবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মে। অনতিবিলম্বে তিনি ড্রেসডেন অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু সেখানকার চিত্রাগারে রক্ষিত ওলন্দাজ শিল্পীদের চিত্রই তাঁকে আকৃষ্ট করে বেশী অথচ এজর ভিঙ্‌কল্‌মান লেসিঙ প্রমুখ তাঁর গুরুরা সবাই ইতালীয় চিত্রের ভক্ত ছিলেন।

ড্রেসডেনে গ্যেটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এক চর্মকার-গৃহে তাঁর সাধুতা ও জ্ঞানবত্তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে। এর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

> যাঁরা অজানিতভাবে দার্শনিক বিশেষ করে' এঁকে আমি তাঁদের শ্রেণীভুক্ত মনে করি।

এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর চরিতকার পল কেরাস বলেছেন: যাঁরা মৌলিকত্বার অধিকারী সমাজের উচ্চস্তরের হোন আর নিম্নস্তরের হোন তাঁরা চিরদিন গ্যেটের চিত্ত আকৃষ্ট করতেন।—কিন্তু শুধু এই-ই নয়; মনে হয় বিদ্বজ্জনের সঙ্গ, গ্রন্থপাঠ, এ-সবের চাইতেও তাঁর মনোবিকাশের সহায় হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব। ফ্রাঙ্কফোর্টে অবস্থানকালেও তিনি সব শ্রেণীর লোকদের পরিচয় লাভের চেষ্টা করতেন; ইহুদি-পল্লীতেও তাঁর গতিবিধি ছিল। লাইপ্‌ৎসিগে অবস্থান-কালে এই ধরণের আলাপ পরিচয়ের সুযোগ তিনি অনেক বেশী পান।

এখানে আন্না কাতারীনা (Anna Katharine) নাম্নী এক তরুণীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তাঁর এই প্রেমপাত্রী ছিলেন এক হোটেল-স্বামীর কন্যা, সেই হোটেলে তিনি তাঁর সাহিত্যরসিক বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই খানাপিনা করতেন। তাঁর সংগৃহীত রচনাবলীর প্রথম রচনা 'খেয়ালী প্রেমিক'এর উৎপত্তি এই প্রেম থেকে। এর পূর্বে ফ্রাঙ্কফোর্টে অবস্থানকালে পনের বৎসর বয়সে আর একটি মেয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে—অনুরাগ অবশ্য এক-তরফা। সেই মেয়েটি ছিলেন তাঁর চাইতে বয়সে

কিছু বড়, দরিদ্র ঘরের, কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী। আত্মচরিতে তাঁর নাম তিনি দিয়েছেন গ্রেট্‌খেন্ (Gretchen)। তাঁর 'ফাউস্‌ট' নাটকে এই নাম তিনি অমর করেছেন।

লাইপ্‌ৎসিগে আর একখানি নাটক তিনি রচনা করেন, নাম, 'সম-অপরাধী'। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতার ইতিহাস অনেকখানি ব্যক্ত করেছেন :

> গ্রেট্‌খেনের সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে অল্প বয়সেই আমাদের চোখে পড়ে সমাজ-জীবনের ভিত্তিমূল ক্ষয় হচ্ছে কত অদ্ভুত সুড়ঙ্গের দ্বারা। ধর্ম নীতি পদবী সম্পর্ক লোকাচার সবই কেবল উপরকার জিনিষ ; যেন সুদৃশ্য রাজপথ, তার দুইধারে বড় বড় বাড়ী ; রাস্তায় লোকদের সবারই ব্যবহার নিখুঁৎ ; কিন্তু ভিতরে সেই পরিমাণে গলদ। নোনাধরা দেয়ালের উপরে যেন করা হয়েছে পাৎলা আস্তর, আর নিশুতি রাতে সব হুড়হুড় করে' ভেঙে পড়ে' করে বিভীষিকার সৃষ্টি। ব্যাঙ্কফেল, বিবাহবিচ্ছেদ, কন্যার কুলত্যাগ, হত্যা, চুরি, বিষদান ইত্যাদির দ্বারা কত গৃহের সর্বনাশ অথবা সর্বনাশের উপক্রম হতে আমি দেখেছি ; আর ছেলেমানুষ ছিলাম বলে' এদের উদ্ধারের জন্য হাতও বাড়িয়েছি। আমার অকপটতার গুণে লোকে আমাকে আপনার ভাব্‌তো, আর যখন তারা দেখতো আমার কাছ থেকে কথা ফাঁস হয় না, ক্ষতিস্বীকারে ও বিপদে মাথা দিতে আমি পশ্চাৎপদ নই, তখন বহু মনোমালিন্য ও বিবাদের মধ্যস্থতা-আদি করবার সুযোগও আমার জুট্‌তো। এইভাবে মানুষের জীবনের অনেক দুঃখগ্লানির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ পরিচয় ঘটে। মনের ভার লাঘব করবার জন্য আমি বহু নাটকের সূচনা করি, অনেকগুলোর প্রস্তাবনাও লিখে ফেলি ; কিন্তু প্লটগুলোর সবই ছিল ছল-চক্রান্তের, আর প্রায় সবগুলোর পরিণতি দাঁড়িয়েছিল বিয়োগান্তক ; তাই একে একে সবগুলোই বাদ দিই। কেবল 'সম-অপরাধী' নাটকটি লেখা হয়েছিল।

তাঁর এই দুখানি নাটক সম্বন্ধে তাঁর সমালোচকবর্গ প্রায় একমত : তাঁর বাল্য-রচনার সঙ্গে এগুলোও অগ্নিসাৎ হলে ক্ষতির কারণ হতো না। কিন্তু লুইস বলেন, এ দুটিতে গ্যেটের বিশিষ্টতার পরিচয় রয়েছে :

> নিজের অভিজ্ঞতাকে তিনি দিয়েছেন স্থায়ী রূপ—তাঁর নিজের জীবন হচ্ছে সেই মহাশাস্ত্র যার ব্যাখ্যা তিনি করে' চলেছেন।

অন্যত্র বলেছেন :

> সমাজের বহিরাবরণের নীচেই এত গ্লানি দেখেও তীব্র ঘৃণা অথবা বেদনা-বিহ্বলতা প্রকাশ পায়নি—এ ব্যাপারটি অসাধারণ। অল্প বয়সে স্বপ্ন ভেঙে

গেলে আসে অবিশ্বাস ও মানব-দ্বেষ, অথবা তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু গ্যেটের ভিতরে অবিশ্বাসও নেই, ক্রোধও নেই। যা ঘট্‌লো তা স্বীকার করে' শান্তভাবে তার প্রতীকার-চেষ্টা করতে হবে—এই যেন তাঁর মনোভাব। কনিষ্ঠ প্লিনীর (Pliny) মতো তাঁরও যেন ধারণা, ক্ষমা বিচারের অঙ্গ ; কঠোর কিন্তু মানবপ্রেমিক থ্রাসেয়াস-এর (Thraseas) সুরে সুর মিলিয়ে তিনি যেন বলতে চান—যে পাপের প্রতি বিরূপ সে মানুষেরও প্রতি বিরূপ।

অসুস্থতা

লাইপ্‌ৎসিগে গ্যেটের তিন বৎসর কাটে। সেখানে তাঁর বাস দীর্ঘতর হতে পারেনি অসুস্থতার জন্যে। একদিন রাত্রে হঠাৎ তাঁর ফুসফুস থেকে—মতান্তরে অন্ত্র থেকে—ভীষণ রক্তপাত হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এমন হয় যে তিনি প্রাণে রক্ষা পাবেন কি না বহুদিন পর্যন্ত তারই কিছুমাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। এই অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে হিউম ব্রাউন বলেন :

> গ্যেটে তার আত্মচরিতে এর বহু কারণের উল্লেখ করেছেন : এক সময়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে লাইপ্‌ৎসিগে যাবার কালে তিনি বুকে আঘাত পান, এর উপর ঘোড়া থেকে পড়ে যান, ছবি আঁকার সময়ে নানা অ্যাসিডের ধোঁয়া তাঁর নাকে যেতো, কফি ও গুরু 'বিয়ার' পানে তাঁর পাকস্থলীর সমূহ ক্ষতি হয়, রুসোর নির্দেশ মতো চলতে গিয়ে তাঁর ভাঙা স্বাস্থ্য আরো ভেঙে যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এসব তিনি লিখেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে, তাঁর সেই-সময়কার চিঠিপত্র থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় তার অসুখের প্রকৃত কারণ কি। লাইপ্‌ৎসিগে বাসের শেষের দিকে তার কেটেছিল সেদিনের আর দশজন জার্মান ছাত্রের যেমন কাট্‌তো। এক দ্বৈরথ যুদ্ধের ফলে তার বাহুতে অস্ত্রের আঘাত লাগে, যা সহ্য হয় তার বেশী মদ্যপান তিনি করতেন···আর এমন অন্যান্য ব্যাপারেও লিপ্ত হয়েছিলেন যার ফল তাঁর স্বাস্থ্যের উপরে ভাল হবার কথা নয়।

এই 'অন্যান্য ব্যাপার' বলতে তাঁর চরিতকাররা বুঝেছেন পূর্ব-উল্লিখিত আনা কাতারীনা বা কেট্‌খেন শ্যোন্‌কোফ্‌-এর (Kathchen SchonKopf) সঙ্গে তাঁর প্রণয়-ব্যাপার। এঁর প্রতি তাঁর প্রেমের স্বরূপ তাঁর সেই দিনের কতকগুলো পত্রে ব্যক্ত হয়েছে, পত্রগুলোর কতক কেটখেনকে লেখা কতক তাঁর বন্ধু বেরিশকে (Behrisch) লেখা। এই তরুণ বয়সের প্রেম গ্যেটের চিত্তকে যেন করে' তুলেছিল

বিচিত্র অনুভূতির আগ্নেয়গিরি। বেরিশকে লেখা তাঁর একখানি পত্রের কতক অংশ এই :

> হাঁ—কিন্তু বেরিশ, ধীরেসুস্থে যে বলতে পারবো সে-প্রত্যাশা করো না। হায় ভগবান্! আজ সন্ধ্যায় আমি খবর পাঠিয়েছিলাম...আমার চাকর এসে সংবাদ দিলে সে গেছে থিয়েটার দেখতে তার মায়ের সঙ্গে। আমার তখন কাঁপুনি শুরু হয়েছিল, এই সংবাদে আমার রক্তে যেন আগুন ধরে' গেল। থিয়েটারে! যখন সে জানে সে যাকে ভালবাসে সে রোগ-শয্যায়! ভগবান্ ভগবান্...তবে আনা তার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেছে! এই চিন্তা আমাকে যেন মুষড়ে দিলে। জানা চাই। কাপড় পরলাম—আর পাগলের মতো ছুটে গেলাম থিয়েটারে।
>
> শোনো বলছি! তার পেছনের সীটে বসেছিল রীডেন (Ryden)। ভাবখানা তার কত কোমল। ভাবতে চেষ্টা কর আমার কথা! গ্যালারি থেকে অপেরা-গ্লাস দিয়ে আমি এদের দেখছি! গোল্লায় যাক্! বেরিশ, মনে হয়েছিল রাগে আমার মস্তিষ্ক বুঝি ফেটে বেরিয়ে পড়বে।...মাঝে মাঝে রীডেন একটু সামনে ঝুঁকছিল, একটু পরে ঠিক হয়ে বসছিল। আবার একটু সামনে ঝুঁকে কি বলছিল। দাঁতে দাঁত চেপে আমি এই সব দেখছিলাম। চোখে আমার জল এসেছিল, কিন্তু সে সোজা তাকিয়ে থাকার দরুণ—এই সমস্ত সন্ধ্যাটা আমি কাঁদতে পারিনি।...হঠাৎ জ্বর খুব চেপে এলো, মনে হলো এই মুহূর্তেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।...আমার মতো এতখানি শক্তি, এমন উঁচু চিন্তাভাবনা, এমন সুযোগসুবিধা নিয়ে আর কাউকে এতখানি অসুখী হতে দেখেছ ?... আর একটা কলম নিচ্ছি...একটু বিশ্রাম। কিন্তু আমি যে তাকে ভালবাসি। মনে হচ্ছে তার হাত থেকে বিষ নিয়ে আমি খাব। কাল কি করবো ? জানি একবার যদি তাকে চোখে দেখি তবে মনে মনে ভাব্‌বো আমি যেমন তোমাকে ক্ষমা করছি ঈশ্বরও তোমাকে তেম্‌নি ক্ষমা করুন, আর আমার যতখানি আয়ু তুমি ক্ষয় করেছ ততখানি আয়ু তিনি তোমাকে দিন...অহো! আমাদের সমস্ত আনন্দ আমাদেরই মধ্যে। আমরাই আমাদের শয়তান, নিজেদের স্বর্গোদ্যান থেকে নিজেদেরই করি বহিষ্কৃত।

কিন্তু পরদিন কবি যখন জানলেন সন্দেহের কোনো কারণ সত্যই উপস্থিত হয়নি, তখন এই চিঠিরই শেষের দিকে লিখলেন :

> এটি ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করতাম যদি আমি যা সেইভাবেই নিজেকে তোমার সামনে প্রকাশ করতে লজ্জা পেতাম। এই দুর্দম কামনা আর

> তেমনি দুর্দম ঘৃণা, বিকট প্রলাপ আর উদ্দাম স্তবগান, এ-সবে পাবে এই তরুণের কিছু পরিচয়। কাল যা নিয়ে নরকের সৃষ্টি হয়েছিল আজ তাই দিয়ে হয়েছে স্বর্গের সৃষ্টি।···যে দুঃখ-বেদনা কাটিয়ে ওঠা গেছে তার স্মৃতি বড় সুখের। আর এমন ক্ষতিপূরণ! আমার সমস্ত সুখ আমার দুই বাহুতে বন্দী।

হৃদয়াবেগের এমন উদ্দামতাই তাঁর দেহকে বিপন্ন করবার জন্য যথেষ্ট।—কবির এমন খেয়ালিপণায় কবিপ্রিয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিরূপ হন।

গোটের এই রোগ-ভোগ প্রায় দেড় বৎসর কাল স্থায়ী হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় তিনি যেভাবে অতিবাহিত করতে পেরেছিলেন সেটিও লক্ষ্যযোগ্য। রোগের সূচনা থেকেই তাঁর নানাশ্রেণীর বন্ধুবান্ধব তাঁর অপরিসীম যত্ন নিয়েছিলেন—নানাভাবে তাঁর চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করেছিলেন যদিও সেই সব বন্ধুদের প্রায় সবাইকে কোনো না কোনো রকমে উত্যক্ত করতে তিনি কসুর করেন নি। বন্ধুদের এই সদয় ব্যবহারে স্বভাবত-কৃতজ্ঞহৃদয় গোটে পরম আপ্যায়িত হন।—কিন্তু শুধু আমোদ-প্রমোদ নয়, যাতে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন তেমন বিষয়ের আলোচনাও এই রোগ-ভোগের কালে তিনি করেছিলেন। লাইপৎসিগে থাকতেই তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বাইবেল পড়ে শোনাতে আরম্ভ করেন। রোগ ভোগের এই দেড় বৎসরে তিনি ধর্মালোচনাই করেন বেশী। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-চর্চা, প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের চর্চা, প্রাচীন আলকেমি-শাস্ত্রের চর্চা, এসবও কম করেন নি।

এই সময়ে তাঁর মাতার বন্ধু কুমারী ফন ক্লেটেনবের্গের (Fraulein Von Clenttenberg) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর কথা যথেষ্ট হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন :

> এঁরই সঙ্গে কথোপকথন ও চিঠিপত্র থেকে ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টার-এর 'সুন্দর আত্মার আত্মপরিচয়' খণ্ডটির উৎপত্তি। হের্ণহুট-সম্প্রদায়ের মহিলাদের মতো তিনি অতি নির্মল পরিচ্ছদ ধারণ করতেন। তাঁর অন্তরের প্রসাদ ও প্রশান্তি কখনো বিলুপ্ত হতো না। তাঁর ব্যাধিকে তিনি জ্ঞান করতেন ক্ষণস্থায়ী মরজীবনে এক প্রয়োজনীয় উপাদান ; অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে তিনি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতেন, আর যখন যন্ত্রণার উপশম হতো তখন হাসিখুশী মুখে আলাপ জমাতেন। তাঁর প্রিয় অথবা একমাত্র বিষয় ছিল যারা আত্মপর্যবেক্ষণশীল সেইসব মানুষের যেসব নৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ হয় তার কথা ; এর সঙ্গে মনোরমভাবে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি বলতেন ধর্মের কথা—তার দুই ভাগ তিনি করতেন—প্রাকৃত আর অতিপ্রাকৃত।

তরুণ গ্যেটেকে তিনি কি চক্ষে দেখতেন ও তাঁদের পরস্পরের কথাবার্তা কি ধরণের হতো সে-সম্বন্ধেও আত্মচরিতে সুন্দর বর্ণনা আছে :

> আমাতে তিনি পেয়েছিলেন—যেমনটি তিনি চান—এক প্রাণবন্ত তরুণ, এক অনির্দেশ্য সুখের সন্ধানী, মহাপাপী বলে' সে নিজেকে জানে না, অথচ মনে তার স্বস্তিও নেই, তার দেহ ও মন দুয়েরই পূর্ণ স্বাস্থ্যের অভাব। আমার প্রকৃতিদত্ত ও আহৃত গুণপণা দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন।··· আমার অশান্তি, অধৈর্য, চেষ্টা, সন্ধান, চিন্তা ও চিত্তদোলার ব্যাখ্যা তিনি নিজের ভাবে দিতেন, আমার কাছে তাঁর মনোভাব লুকোতেনও না, অকপটে বলতেন, এসবের কারণ ঈশ্বর আমার প্রতি অপ্রসন্ন। আমার কিন্তু কিশোর-কাল থেকে ধারণা ছিল যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ খুব ভাল, এমন কি কখনো কখনো মনে হতো তিনি বরং আমার কাছে ঋণী, আর সাহস করে' ভাবতাম, কোনো কোনো বিষয়ে তাঁকে আমার ক্ষমা করবার আছে। আমার এই অদ্ভুত সাহসের মূলে ছিল আমার অপরিসীম শুভেচ্ছা, মনে হতো, তাতে ঈশ্বরের আরো সাহায্য কর্তব্য। কল্পনা করা যেতে পারে এ থেকে আমার আর আমার শ্রদ্ধেয়া বান্ধবীর মধ্যে কত বাদানুবাদের সৃষ্টি হতো; অবশ্য সব বাদানুবাদেরই মধুর অবসান হতো, প্রায়ই তাঁর শেষ বক্তব্য দাঁড়াতো—আমার বুদ্ধি হয়নি, আমাকে বহু ক্ষমা করা যেতে পারে।

কুমারী ফন ক্লেটেনবের্গের কোনো প্রভাব গ্যেটের উপরে পড়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা বিচিত্র নয়, কেননা, গ্যেটের সাধারণ পরিচয় এই যে তিনি প্রকৃতিবাদী ও জীবনবাদী—মরমী বা ভক্ত নন। তবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়সূত্রে গ্যেটের আল্‌কেমি-শাস্ত্রে প্রবেশলাভ ঘটে আর তাঁর এক দুরারোগ্য উদরপীড়া আল্‌কেমির প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত লবণে প্রশমিত হয়।

এই সময়ে গট্‌ফ্রীড আর্নোল্ডের 'চার্চ ও প্রতিবাদীদের নিরপেক্ষ ইতিহাস' বইখানি তাঁর হাতে পড়ে, এই বই পড়ে তিনি উপকৃত হন। এই গ্রন্থকার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

> ইনি শুধু চিন্তাশীল ঐতিহাসিকই নন, ধার্মিক ও হৃদয়বান্‌ও বটেন। এঁর মতের সঙ্গে আমার মতের খুব মিল হলো, আর সব চাইতে বেশী খুশী হলাম এই জন্য যে এঁর লেখায় অনেক বিদ্রোহী সম্বন্ধে অনুকূল মত পেলাম—এই সব বিদ্রোহীকে এতদিন জেনে এসেছিলাম উন্মাদ অথবা ধর্মহীন বলে'।

প্রচলিত খৃষ্টধর্মে ভক্তিমান গ্যেটে কোনো দিনই ছিলেন না, বরং নিজেকে তিনি বারবার বলেছেন Pagan, প্রকৃতিপন্থী—মুসলমানী ভাষায় 'কাফের'। তবু 'ভক্তি'

'বিশ্বাস' এসব বলতে কি বোঝায় তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এ সম্বন্ধে পল কেরাস ভিলহেল্‌ম্‌ মাইস্‌টার-এর 'সুন্দর আত্মার আত্মপরিচয়' থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন :

> একদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করলাম—"ভগবান, ভক্তি আমাতে দাও।" আমার মনের তখন সেই অবস্থা—এমন অবস্থা কদাচিৎ ঘটে—যে অবস্থায় প্রার্থনা ভগবান শোনেন। তখন আমার মনের যে ভাব হয়েছিল কার সাধ্য তা বর্ণনা করবে। যে ক্রুসে যীশু আত্মদান করেছেন আমার অন্তরাত্মা প্রবলভাবে সেই ক্রুসের দিকে আকৃষ্ট হলো। যিনি মানুষের স্তরে নেমে এসে ক্রুসে প্রাণ দিয়েছেন আমার আত্মা তাঁর নৈকট্য অনুভব করলো। তখন বুঝলাম ধর্মবিশ্বাসের কি অর্থ। ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলাম—হাঁ, এই ই ধর্ম-বিশ্বাস বটে! এই সমস্ত ভাব ভাষায় প্রকাশ করে' বলবার নয়।†

তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে হিউম ব্রউনের এই মন্তব্যটি সুন্দর :

> তাঁর জীবনের প্রত্যেক স্তরেই মরমী ভাবের অসদ্ভাব নেই, কিন্তু সেই মরমী-ভাব সংযমিত হতো তাঁর অতিপ্রবল বাস্তব-বোধের দ্বারা—এই কঠিন বাস্তবের ভিত্তির উপরে নির্মিত হবে তাঁর জীবন-সৌধ এই ছিল তাঁর অন্তরতম কামনা।

গ্যেটের এই ধরণের ধর্মজীবনের উপরে কুমারী ফন ক্লেটেনবের্গের প্রভাব কিছুই যে ছিল না তা না বলাই সঙ্গত। এই মরমী-ভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়েছিল এর কিছুকাল পরেই স্পিনোজা-দর্শন থেকে তিনি যে শিক্ষা পান সেইটি।

এই দীর্ঘ রোগ ভোগ গ্যেটের জীবনে এক হিসাবে কল্যাণকর হয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

> আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠেছিলাম; আমার দীর্ঘ অসুস্থতা তখনো দূর হয়ে যায়নি, কিন্তু অন্তরে পূর্বের চাইতে অনেক বেশী আনন্দ অনুভব করছিলাম, অন্তর-প্রকৃতির একটা মুক্তিও অনুভব করছিলাম।

আর হিউম ব্রাউন বলেছেন :

> রোগ-ভোগের পরে ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে লেখা চিঠিপত্রে গ্যেটের জ্ঞানবত্তা ও সংযম দুইই চোখে পড়ে · মানুষ ও অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বাণী···এখন থেকে তাঁর লেখনীমুখে স্বতঃউৎসারিত হয়ে চল্‌লো।

আরোগ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্কফোর্ট তাঁর আর ভাল লাগছিল না। তাঁর অকৃতকার্যতার জন্য পিতার অসন্তোষ তাঁর গভীর অস্বস্তির কারণ হয়েছিল।

†ভিলহেল্‌ম্‌ মাইস্‌টার ষষ্ঠ খণ্ডের বিবৃতি দ্রষ্টব্য

তরুণ কবি

স্ট্রাসবুর্গ

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গ্যেটে স্ট্রাসবুর্গে গমন করেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য। তাঁর পিতাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তাঁর অবস্থিতিকাল প্রায় দেড় বৎসর। এই সময়ে তাঁর বয়স বিশ বৎসর। লুইস বলেন: তাঁর মতো আর একজন সুদর্শন যুবক হয়ত আর কখনো স্ট্রাসবুর্গে পদার্পণ করেন নি। প্রসিদ্ধি লাভের বহু পূর্বেই গ্রীকদেবতা আপোলোর (Apollo) সঙ্গে তাঁর সৌসাদৃশ্যের কথা সবাই বলতো। কথিত আছে তিনি এক সময়ে এক ভোজন-গৃহে প্রবেশ করলে সবাই কাঁটা চামচ রেখে তাঁর পানে চেয়ে থাকে। তাঁর অত্যন্ত নিখুঁৎ ছবি ও মূর্তিতেও তাঁর চেহারার সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য অংশ কমই ফুটেছে, কেননা সেসবে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন কিছু ফুটেছে কিন্তু ফোটেনি সেসবের খেলা।

আত্মচরিতে গ্যেটে স্ট্রাসবুর্গের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। স্ট্রাসবুর্গের সুন্দর শহর, চারদিকের সুন্দর মাঠ—তার মাঝে মাঝে সুন্দর বনস্পতি নিকুঞ্জ লোকালয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, আর সকলের উপরে চারদিকের গাঢ় সবুজ শ্রী—দীর্ঘ রোগ-ভোগের বন্দীদশার পরে কত ভাল লেগেছিল এসব এই তরুণ কবির চোখে তা সহজেই অনুমেয়। স্ট্রাসবুর্গের লোকেরা ভ্রমণবিলাসী। তাদের সাহচর্যে এখানকার বহু স্থান—পাহাড়, নদী, খনি, জঙ্গল—তিনি পরিদর্শন করেন। তাঁর খনিজ-বিদ্যায় আসক্তির সূচনা এখানে থেকে। আর মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে স্ট্রাসবুর্গের বিখ্যাত গির্জার সুউচ্চ গ্যালারিতে বসে' রাইন-মদ্য-পূর্ণ পাত্র হস্তে তিনি অস্তগামী সূর্যকে অভিবাদন জানাতেন।

ব্যাধির অস্বস্তি তখনো তাঁর একেবারে চুকে যায়নি; খুব উঁচুতে উঠে নীচের দিকে তাকালে তাঁর মাথা ঘুরতো। এটি দূর করবার জন্যে তিনি গির্জার সব চাইতে উঁচু চূড়ায় উঠে বসে' থাকতেন। আর কাল্পনিক ভয় দূর করবার জন্যে গির্জা ও অন্যান্য নির্জন স্থানে ভ্রমণ করতেন। কদর্য ও বীভৎস দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এজন্য তাঁর ডাক্তার-বন্ধুদের সঙ্গে শব-ব্যবচ্ছেদ দেখতেন।

স্ট্রাসবুর্গে গ্যেটে বাস করতেন কয়েকজন চিকিৎসাবিদ্যার্থীর সঙ্গে। এদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ডক্টর জাল্‌ৎস্‌মান (Salzman)—বয়স আটচল্লিশ বৎসর, অবিবাহিত, পোষাকের পরিচ্ছন্নতায় নিখুঁত, সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ। এঁর কথা তিনি

তাঁর আত্মচরিতে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। স্ট্রাসবুর্গে এসে প্রথমে তিনি চেষ্টা করেছিলেম কয়েকজন 'ধর্মভীরু' ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে—কুমারী ক্লেটেনবের্গের স্মৃতি তখনো তাঁর মনে প্রবল; কিন্তু ধর্মভীরুদের সঙ্গ তাঁর বিরক্তিকর হতে বেশী দিন লাগেনি। তাঁদের নিরানন্দ আলাপ তাঁর স্ফূর্তিভরা প্রকৃতিতে সইবে কেন। এঁদের পরিবর্তে ডক্টর জাল্‌ৎস্‌মানের সঙ্গই তিনি বেশী কাম্য জ্ঞান করেন। তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: তিনি শান্তভাবে জগদ্‌ব্যাপার গ্রহণ করেন; তিনি বুঝেছেন যে আমরা এই জগতে এসেছি এই বিশেষ উদ্দেশ্যে যে আমাদের দ্বারা জগতের কাজ হবে, ধর্ম আমাদের এই কাজের হবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে; তাঁর মতে, যিনি মানুষের বেশী কাজে লাগেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।—এটি গোটের পরিণত বয়সের মত, কাজেই ডক্টর জাল্‌ৎস্‌মানকে গ্যেটের একজন বড় গুরু জ্ঞান করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর চরিত-কাররা বলেন, এই ধরণের চিন্তার সঙ্গে এই বয়সেও গ্যেটের অপরিচয় ছিল না, কাজেই ডক্টর জাল্‌ৎস্‌মানের প্রভাবে তাঁর চিন্তাধারা আরো পরিচ্ছন্ন হয়েছিল এই বলা যায়।

এই দলে তাঁর আর দুইজন বন্ধু লাভ হয়। একজন ফ্রান্‌ৎস্‌ লেরসে (Franz Lerse) অপর জন য়ুঙ্‌-ষ্টিলিঙ্‌ (Jung-Stilling)। লেরসে-চরিত্রের সবলতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে তিনি অমর করেছেন তাঁর প্রথম বিখ্যাত নাটক 'গ্যোৎস্‌ ফন বের্লিখিঙ্গন' (Gotz Von Berlinchingen—লৌহপাণি গ্যোৎস্‌) নাটকে। আর উত্তরকালে য়ুঙ্‌-ষ্টিলিঙের আত্মচরিত তিনি নিজের খরচে প্রকাশ করেন। য়ুঙ্‌-ষ্টিলিঙের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথমে তিনি কয়লা পোড়াতেন, তারপর হয়েছিলেন দর্জি, তারপর স্কুলমাষ্টার, তারপর গৃহশিক্ষক ও শেষে এসেছিলেন স্ট্রাসবুর্গে ডাক্তারি পড়তে। ষ্টিলিঙ্‌ তীক্ষ্ণধী ও কর্মতৎপর ব্যক্তি ছিলেন, তার সঙ্গে মিশেছিল তাঁর অন্তরের একটি সহজ ভক্তির ভাব। সাচ্চা মানুষ চিরদিনই গ্যেটের প্রিয়পাত্র ছিলেম তা তাঁদের মত বিশ্বাস যাইই হোক। ষ্টিলিঙ্‌ও গ্যেটের ভালবাসার মর্যাদা বুঝতেন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি বিখ্যাত:

> গ্যেটের মস্তিষ্ক যে অসাধারণ সে কথা সবাই জান্‌তো, কিন্তু তাঁর হৃদয়ও যে তাঁর মস্তিষ্কের মতোই অসাধারণ একথা জানতো কম লোকেই।

ব্যাপকভাবে জার্মান-সংস্কৃতি সম্বন্ধে চেতনা গ্যেটের স্ট্রাসবুর্গ-বাসের এক বিশেষ ফল। এই সময়ে লেসিঙ্‌ প্রমুখ জার্মানসাহিত্যরথী প্রবলপ্রতাপ ফরাসী সংস্কৃতির অপকৃষ্টতা প্রমাণে যেন দেহ-মন উৎসর্গ করেছিলেন। গোটে এ সম্বন্ধে এতদিন উদাসীন ছিলেন। কিন্তু স্ট্রাস্‌বুর্গের বিখ্যাত গির্জা তার গঠনের বিরাটত্ব ও কারু-কার্যের মনোহারিত্বের দ্বারা তাঁর হৃদয়-মন আকর্ষণ করে। কতদিন যে এর গঠন-নৈপুণ্য তিনি তন্ন তন্ন করে' দেখেন তার ইয়ত্তা নেই। শেষে এ সম্বন্ধে তিনি একটি

প্রবন্ধ লেখেন—সেটি বিখ্যাত। কিন্তু পরবর্তী জীবনে জার্মান-স্থাপত্যের মাহাত্ম্যকীর্তনে তিনি আর মনোযোগী হননি। আর বিশেষজ্ঞেরা বলেন, জার্মান-স্থাপত্যের উৎপত্তির মূলে ফরাসী প্রেরণা। মধ্যযুগের ধর্মভাবের প্রতীক এই গথিক স্থাপত্য।

মাতৃভাষার গৌরবও তিনি এখন থেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। তিনি ফরাসী ভালই জানতেন তবু তাঁর ফরাসী রচনা ও কথাবার্তা খাঁটি ফরাসীর কটাক্ষ থেকে রেহাই পেতো না। তিনি ও তাঁর ডাক্তার-বন্ধুরা ঠিক করলেন মাতৃভাষা জার্মান ভিন্ন তাঁরা আর কোনো ভাষায় কথাবার্তা বলবেন না। এর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের কৃত্রিমতার পরিবর্তে শেক্‌স্‌পীয়র ও ওশিয়ানের স্বাভাবিকতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।—এই যুগে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ওশিয়ানের খুব সমাদর হয়; কিন্তু বহু পরে প্রমাণিত হয়েছে এইসব কবিতা কৃত্রিম—খাঁটি প্রাচীন লোক সাহিত্য নয়।

হের্ডর

গ্যেটের এই নবদীক্ষার শ্রেষ্ঠগুরু অন্যতম জার্মানসাহিত্যরথী হের্ডর (Herder) —রুসোর মন্ত্রশিষ্য। হের্ডরের বয়স গ্যেটের চাইতে পাঁচ বৎসর বেশী ছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে স্ট্রাসবুর্গে পরিচয় হলে গ্যেটে বুঝলেন, হের্ডর তাঁরই প্রিয় বিষয়সমূহে তাঁর চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর। হের্ডর এসেছিলেন তাঁর চোখের চিকিৎসার জন্য। সমস্ত শীতকালটা তাঁকে ঘরে বসে' কাটাতে হয়। গ্যেটে সকালে বিকালে তাঁর কাছে গিয়ে বসতেন ও উৎকর্ণ হয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা শুনতেন। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। সাধারণত কাব্য বিষয়েই আলাপ হতো। হের্ডর কাব্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও লোক-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন—এ সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করছিলেন। গ্যেটে বলেছেন: হের্ডরের কথা থেকে কাব্য সম্বন্ধে তাঁর নতুন ধারণা জন্মে; এতদিন তিনি মনে করতেন—কাব্য এক বিলাসের সামগ্রী, ব্যক্তির জীবনে এক অলঙ্কার, হের্ডর তাঁকে শেখালেন—কাব্য জাতীয় চেতনা থেকে উদ্‌ভূত, মানবতার সারভূত সামগ্রী, মানবজাতির আদিম ভাষা—the mohther speech of the human race. এই কথাটি হের্ডরের গুরুস্থানীয় হামান-এর; তিনি ফরাসী সাহিত্যের কৃত্রিমতায় বীতস্পৃহ হয়ে ও ইংরেজী সাহিত্যের স্বাভাবিকত্বে মুগ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান জাগরণে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব গভীর।

গ্যেটে মুক্তকণ্ঠে হের্ডরের ঋণ স্বীকার করেছেন। গ্রীক সাহিত্য, হিব্রু সাহিত্য এসব সম্বন্ধেও নূতন নূতন জ্ঞান তিনি তাঁর কাছ থেকে লাভ করেন—অবশ্য সবই যে

নির্ভুল জ্ঞান তা নয়। হের্ডারের মেজাজ ছিল রুক্ষ; গ্যেটেকে তিনি মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না মুখ্যত তাঁর চপলতার জন্যে। একখানি চিঠিতে গ্যেটে হের্ডারকে লেখেন যে নিজের চপলতার মূল কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন পিন্দারের (Pindar) এক কবিতা পড়ে'—সেই কবিতায় বর্ণিত সেকালের বিজয়ী মল্লের গৌরব তিনি নিজের ভিতরে অনুভব করেছেন। গ্রীক-কবি পিন্দারের এই সব চরণ তাঁর পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে :

বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছ তোমার রথে,—
চার তেজীয়ান ঘোড়া উদ্দাম ভঙ্গিতে টানছে তোমার রথ,
তুমি নিয়ন্ত্রিত করছ তাদের গতিবেগ,
যেটি বেশী এগোতে চাচ্ছে কশ্‌ছো তার লাগাম,
যেটি পিছিয়ে পড়ছে মারছ তাকে চাবুক,
ছুটিয়েছ তাদের,
চালাচ্ছ তাদের,
ফেরাচ্ছ তাদের যেদিকে খুশী,
হান্‌ছো চাবুক,
এই কশ্‌ছো লাগাম,
এই ছুটিয়েছ উদ্দাম বেগে,
ষোলো পা উঁচু করে' ছুটছে তারা তোমাকে নিয়ে,
ছন্দ রেখে,
তোমার লক্ষ্যে——
এরই নাম কর্তৃত্ব।

গ্যেটের প্রতিভার কোনো পরিচয় হের্ডারের চোখে পড়ে নি। তবু তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণে এতটুকু শিথিলতা তাঁতে দেখা দেয় নি। হের্ডারের কৃতজ্ঞতা-বোধের অভাব সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে যে মন্তব্য করেছেন তা অপূর্ব। হের্ডারের স্ট্রাস্‌বুর্গ ত্যাগ করে' যাবার কালে গ্যেটে ঋণ করে' তাঁকে কিছু অর্থ দেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে হের্ডারের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। গ্যেটে কিছু ব্যস্ত হলেন। অবশেষে অর্থ ও পত্র দুই ই এলো কিন্তু ধন্যবাদ অথবা ত্রুটি স্বীকারের পরিবর্তে এলো ছন্দোবদ্ধ বিদ্রূপ। গ্যেটে বলেছেন, আর কেউ হলে এতে না চটলেও হতভম্ব হতো কিন্তু হের্ডার সম্বন্ধে তাঁর এত উঁচু ধারণা জন্মেছিল যে তাঁর মনে কোন দাগ কাট্‌লো না। তাঁর মন্তব্যটি এই :

আমি সাধারণত অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনিচ্ছা, বিভিন্ন করে' দেখি। এর প্রথমটি মানুষের প্রকৃতিগত; জীবনে যা বিসদৃশ ও যা

মধুর সবই সহজভাবে বিস্মৃত হবার প্রয়োজন থেকে এর উদ্‌ভব—নইলে জীবন দুর্বহ হতো। একটি সাধারণ জীবন যাপনের জন্যও অতীত ও বর্তমানের এত বেশী সহায়তার প্রয়োজন যে সেজন্য লোকে যদি সূর্য ও পৃথিবী, ঈশ্বর ও প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ ও জনক-জননী, বন্ধু ও সঙ্গী, সবার প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা অনুক্ষণ জ্ঞাপন করতো তবে নূতন নূতন দান গ্রহণ করবার অবসর ও আনন্দ তাদের জন্য দুর্লভ হতো। কিন্তু এই স্বভাবত-বিস্মৃতিপরায়ণ মানুষেরই আস্তে আস্তে প্রীতিহীন ঔদাসীন্যের দিকে প্রবণতা জন্মে, শেষে উপকারীকে মনে হয় নিঃসম্পর্ক—যার ক্ষতি আমাদের জন্য আদৌ গণনার বস্তু নয় যদি তাতে আমাদের নিজেদের লাভ হয়। এই-ই সত্যকার কৃতঘ্নতা, অনুভূতিহীন বর্বরতা থেকে এর উৎপত্তি—আর এই বর্বরতাই অমার্জিত প্রকৃতির শেষ আশ্রয়। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে অনিচ্ছা—উপকারের পরিবর্তে বদ্‌মেজাজ—এ কদাচিৎ চোখে পড়ে। খুব উঁচু-দরের লোকদের মধ্যেই এটি ঘটে। প্রকৃতিদত্ত মহৎ প্রতিভার তাঁরা অধিকারী, সে-বিষয়ে তাঁরা সচেতন, অথচ জন্ম হয়েছে সমাজের নিম্নস্তরে অথবা অসহায়তার মধ্যে, তাই নবযৌবন থেকে আপ্রাণ চেষ্টায় ধাপে ধাপে তাঁদের উঠ্‌তে হয়; এই প্রত্যেক ধাপে যে সাহায্য ও আলম্বন তাঁরা পান দাতাদের অনুভূতির স্থূলত্বের জন্য অনেক সময়ে সে-সব হয়ে যায় বিস্বাদ ও বিতৃষ্ণাজনক, কেননা তাঁরা যা পান তা পার্থিব, আর যা দেন তা উচ্চতর মর্যাদার, কাজেই যাকে বলা যেতে পারে ক্ষতিপূরণ তাই-ই ত' তাঁদের বেলায় জোটে না।

নৃত্যশিক্ষা

হের্ডরের প্রভাবে শেক্‌স্‌পীয়র-প্রীতিও গ্যেটের ভিতরে প্রবল হয়। লাইপ্‌ৎসিগেই তিনি ভীলাণ্ডের জার্মান অনুবাদ ও মূল শেক্‌স্‌পীয়র পড়েছিলেন। এই সময়ে বন্ধুমহলে শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে তিনি এক উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা দেন:

> তাঁর রচনার এক পৃষ্ঠা পড়েই আমি যেন তাঁর কেনা হয়ে গেলাম; আর যখন একটি নাটক পড়ে ফেললাম তখন মনে হলো জন্মান্ধ আমি হঠাৎ যেন কার করস্পর্শে মুহূর্তে পেলাম দৃষ্টিশক্তি। প্রাচীন (গ্রীক) আদর্শের নাটক বিসর্জন দিতে আমার দ্বিধামাত্র হলো না, স্থানের একত্ব মনে হলো যেন কারাগার, ঘটনা ও সময়ের একত্ব মনে হলো কল্পনার পায়ে অনাবশ্যক নিগড়†—আমি যেন উন্মুক্তক্ষেত্রে ছাড়া পেয়ে প্রথম অনুভব করলাম আমার হাত পা আছে।

† গ্রীক নাটকের একত্ব-ত্রয় স্মরণীয়।

অন্যান্য বিষয়েও, বিশেষত বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, তাঁর পড়াশুনা খুব হচ্ছিল। এখানেই তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও সর্বব্রহ্মবাদী (Pantheist) ব্রুনো-র (Bruno) রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু স্ট্রাস্‌বুর্গে শুধু পড়াশুনা নিয়েই তিনি মশগুল থাকেন নি। তিনি খুব বেড়াতেন, সে কথা বলা হয়েছে। এর উপর ডক্টর জাল্‌ৎস্‌মান তাঁকে অনেক ভদ্রপরিবারে পরিচিত করান। তাঁর নির্দেশ-মতো ভদ্রসমাজে সহজে মেলামেশার জন্যে তিনি তাস খেলায় কিছু বেশী মন দেন। পোষাক-পরিচ্ছদের দিকেও তাঁকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখতে হতো। কিন্তু এই সম্পর্কে যে কাজটি তাঁর সব চাইতে অপ্রিয় ছিল সেটি হচ্ছে স্ট্রাস্‌বুর্গের কেশ-প্রসাধকের নির্দেশ মতো কেশ প্রসাধনে রাজি হওয়া। তাঁর মাথার চুল স্বভাবত সুন্দর ছিল। তবু এই নতুন পরিবেশে তাঁকে পরচুলা ব্যবহার করতে হতো; আর যাতে সেই পরচুলা স্থানভ্রষ্ট না হয় সেজন্য অত্যন্ত সংযত হয়ে চলাফেরা ওঠাবসা করতে হতো।

নৃত্যে আগে থাকতেই তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে একজন ফরাসী শিক্ষকের কাছে তিনি নৃত্য শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। স্ট্রাস্‌বুর্গের এই নৃত্যশিক্ষা তাঁর জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা: এই নৃত্যশিক্ষার ব্যপদেশে সেই নৃত্যশিক্ষকের দুই কন্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, পরিচয় ক্রমে প্রেমে ও বিষাদময় বিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হয়।

নৃত্যশিক্ষকের দুই কন্যা লুসিন্দা (Lucinda) ও এমিলিয়া-র (Emilia) সঙ্গে তিনি নাচতেন ও অনেক সময়ে গল্প করতেন। এমিলিয়া ছিলেন অপর একজনের প্রতি অনুরাগিণী—তিনি গ্যেটের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতেন। কিন্তু এমিলিয়ার চলাফেরা হাবভাবই ছিল গ্যেটের চোখে বেশী মাধুর্যপূর্ণ। একদিন এক মেয়ে গণৎকারের মুখে এমিলিয়া শুনলেন তাঁর প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনের আর বেশী দেরী নেই, কিন্তু লুসিন্দা সম্বন্ধে জানা গেল, তিনি যাকে ভালবাসেন তিনি তাঁর থেকে দূরে, অপর এক নারী তাঁর প্রণয়ীর নিকটবর্তিনী। এতে লুসিন্দা মর্মাহত হলেন। ক্রমে গ্যেটে সব কথা পরিষ্কার ভাবে জানতে পারলেন; এমিলিয়া তাঁকে সব জানালেন—বল্লেন, তাঁর নিজের চিত্তও দোদুল্যমান, তাঁদের গৃহত্যাগ করে' যাওয়া গ্যেটের উচিত। বিদায়সম্ভাষণ স্বরূপ এমিলিয়া যখন কবিকে প্রথম ও শেষ চুম্বন দান করছিলেন তখন পাশের দরজা খুলে গেল, আর লুসিন্দা হালকা সুদৃশ্য নৈশ পোষাকে সহসা আবির্ভূত হয়ে বললেন—"শুধু তুমিই তার কাছ থেকে বিদায় নেবে না।" কবি তাঁর আত্মচরিতে লিখছেন:

> এমিলিয়া আমাকে ছেড়ে দিলেন, আর লুসিন্দা আমাকে আকর্ষণ করে' আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—তাঁর কালো চুল আমার গণ্ড স্পর্শ করলো, এমনিভাবে তাঁর কিছুক্ষণ কাটলো—একটু আগে এমিলিয়া যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন দুই বোনকে নিয়ে তেম্‌নি উভয় সংকট আমার সামনে দেখা

দিল। লুসিন্দা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবেগভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন। তাঁর হাতখানি হাতে নিয়ে দুই একটি সমবেদনার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে সামনে খানিকক্ষণ পায়চারি করে' সোফার এক কোণে বসে' পড়লেন।

শেষবার গ্যেটের ওষ্ঠাধরে গাঢ় চুম্বনরেখা অঙ্কিত করে' লুসিন্দা বললেন :

এইবার আমার শাপের কথা মনে রেখো! চিরদুঃখ তার যে আমার পরে প্রথম এই ওষ্ঠাধর চুম্বন করবে।

ফ্রীডেরিকা

গোল্‌ড্‌স্‌মিথের The Vicar of Wakefield বইখানির সন্ধান গ্যেটে হের্ডরের কাছ থেকে পান। এই বইখানির উচ্চ প্রশংসা তিনি তাঁর আত্মচরিতে করেছেন। এই বয়সে কাব্য-বিচারে তিনি খুব ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় দিতেন। কিন্তু হের্ডর ছিলেন কঠোর সমালোচক, তিনি কঠোর মন্তব্যে তাঁকে সংযত করতে চেষ্টা করতেন। গ্যেটে বলেছেন :

হের্ডরের তিরস্কার আমাকে আদৌ বিচলিত করতে পারেনি, তার কারণ, তরুণদের প্রকৃতিই এই যা তাদের মনে দাগ কেটেছে তার প্রভাব তাদের মধ্যে প্রবল হতে না দিয়ে তারা পারেই না—এর ফল অবশ্য ভাল মন্দ দুই ই হয়। উপরিউক্ত বইখানি আমার মনের উপরে এক জোরালো ছাপ রেখে গিয়েছিল, তার কারণ নির্ণয় আমার পক্ষে অসাধ্য; কিন্তু অনুভব করছিলাম এর বক্র বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের সঙ্গে আমার মনোভাবের সঙ্গতি—এই বিদ্রূপাত্মক মনোভাবের অধিষ্ঠান সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য ভাল মন্দ জীবন-মৃত্যু প্রত্যেক ব্যাপারের উর্ধ্বে, এবং এই ভাবেই এর প্রবেশলাভ হয় প্রকৃত কাব্য-জগতে।

এই বইখানির যে কাল্পনিক জগৎ তদনুরূপ একটি বাস্তব জগতের সঙ্গে অনতি-বিলম্বে তাঁর পরিচয় হয়, আর হয়ত তাতেই তার মাধুর্য তাঁর চোখে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

স্ট্রাস্‌বুর্গ থেকে প্রায় ষোলো মাইল দূরে জেজেনহাইম-এ (Sesenheim) এক যাজক-পরিবার বাস করতেন, তাঁদের অমায়িকতা ও আতিথেয়তার কথা তিনি তাঁর জনৈক সঙ্গীর মুখে অবগত হন। সঙ্গীটি এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশপ্রিয় গ্যেটেকে এক গরীব ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রের বেশে সেখানে নিয়ে যান। পরিবারের কর্তা, গৃহিণী, দুই নবীনা কন্যা, পুত্র—সব মিলে সহজেই ওয়েকফিল্ডের

যাজক-পরিবারের সঙ্গে এর সৌসাদৃশ্য গ্যেটের চোখে পড়ে। কনিষ্ঠা ফ্রীডেরিকার (Friederike) মাধুর্য অল্পক্ষণেই তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট করে। তখন এই তরুণীর সামনে নিজের দীন ছদ্মবেশে তিনি অতিশয় কুণ্ঠা বোধ করেন। কোনো রকমে রাত কাটিয়ে খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়ে এই অবাঞ্ছিত ছদ্মবেশ বদলে আসেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, কথোপকথনের ছটা, হাসি-উল্লাস, সহজেই তাঁকে সেখানকার সকলের প্রিয় করে' তোলে।

ফ্রীডেরিকার স্মৃতি গ্যেটে আত্মচরিতে একান্ত হৃদয়গ্রাহী করে' অঙ্কিত করেছেন। ফ্রীডেরিকার বয়স এ সময়ে ষোলো বৎসর। তাঁর সঙ্গে গ্যেটের প্রথম সাক্ষাৎকার, ফ্রীডেরিকার অকুণ্ঠিত মধুর আলাপ, খোলা জায়গায় জ্যোৎস্না-আলোকিত আকাশের নীচে তাঁর গ্রাম্য গান, তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চলাফেরায় প্রাণবন্ততার সৌন্দর্য —সবই নিরতিশয় নিপুণতার সঙ্গে আত্মচরিতে অঙ্কিত হয়েছে :

> কোনো কোনো নারীকে সুন্দর দেখায় ঘরের ভিতরে, কাউকে খোলা জায়গায়। ফ্রীডেরিকা ছিলেন শেষোক্ত শ্রেণীর। তাঁর স্বভাব, তাঁর দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব সুন্দর মনে হতো যখন তিনি কোনো উঁচু পথ ধরে' চলতেন। তাঁর গতির সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলতো ফুলেভরা ধরণীর আর তাঁর চিরপ্রফুল্ল মুখের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলতো নীল আকাশের। সব চাইতে নির্মল আনন্দ আমরা উপভোগ করি যখন দেখি যিনি আমাদের ভালবা'সার পাত্রী অপরেও তাঁকে দেখে খুশী। সামাজিক মেলামেশায় ফ্রীডেরিকার ব্যবহারে সবাই আপ্যায়িত হতেন। বেড়াবার সময়ে তিনি যেন স্ফূর্তিতে দুই পাখা মেলে ভেসে বেড়াতেন, যেখানে যেটুকু ত্রুটি চোখে পড়তো মুহূর্তে তা সংশোধন করে' নিতেন।...সব চাইতে সুন্দর ছিল তাঁর দৌড়। হরিণ যেমন তার স্বভাব প্রকাশ করে যখন নতুন শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে হাল্কা পায়ে ছোটে, ফ্রীডেরিকার স্বভাবও তেমনি নিজেকে অতি সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করতো যখন ফেলে-আসা-কিছু নিয়ে আসতে, হারানো-কিছু খুঁজতে, যাঁরা পেছিয়ে পড়েছেন তাঁদের ডেকে আনতে, অথবা দরকারী-কিছুর ব্যবস্থা করতে তিনি ময়দান ও চষামাঠের উপর দিয়ে লঘুপায়ে দৌড়োতেন।

লুসিন্দার শাপ সব সময় গ্যেটের মনে থাকতো। তাই যে সব খেলায় হার বা জিতের ফলে চুম্বন প্রদানের রীতি আছে (game of forfeits) সেসব তিনি এমন ভাবে খেলতেন যাতে ফ্রীডেরিকাকে চুম্বন করতে না হয়। তাঁর এই সংযমের জন্য ফ্রীডেরিকার পিতামাতার কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, ফ্রীডেরিকার সঙ্গও তিনি যথেষ্ট পান। কিন্তু এক উৎসবের দিনে তাঁদের স্ফূর্তির মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যায়; সেদিন

জেজেনহাইমের সমস্ত অভ্যাগতই অপরিসীম স্ফূর্তিতে রত হন। সেদিন ফ্রীডেরিকার মাধুর্যও গ্যেটের চোখে বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় লুসিন্দার শাপের স্মৃতি কোন্ অতলে তলিয়ে যায় আর খেলার সময়ে ফ্রীডেরিকাকে বারবার তিনি চুম্বন করেন।

কিছুক্ষণ নিদ্রা দেবার পর শেষ রাত্রে সব কথা তাঁর মনে পড়ে। ফ্রীডেরিকার অত্যন্ত অকল্যাণ করা হয়েছে ভেবে তিনি যার-পর-নাই মর্মপীড়া ভোগ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রীডেরিকার মাধুর্য ও তাঁর সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সামনে এ দুশ্চিন্তা মাথা লুকোতে বাধ্য হয়।

গ্যেটের প্রেমপাত্রীদের কারো চিত্রই এত মোহন রঙে রঞ্জিত হয় নি। ফ্রীডেরিকার জন্মস্থান জেজেনহাইম জার্মান-সাহিত্য-রসিকদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। কেন গ্যেটে তাঁকে বিবাহ করেন নি এ অভিযোগ তাঁর আত্মচরিতের অনেক পাঠকই তাঁর বিরুদ্ধে আনয়ন করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর চরিতকারদের মোটের উপর অভিমত এই যে ধনী ও মানীর পুত্র গ্যেটের সঙ্গে গ্রাম্য যাজকের কন্যার বিবাহ বাস্তবিকই অসম্ভব ছিল; তাঁর পিতা যে এ বিবাহে রাজি হবেন পরে ভেবে চিন্তে এমন কোনো সম্ভবনাই তিনি দেখেন নি।—হয়ত এ অনুমান মিথ্যা নয়; গ্যেটে নিজে এর কোনো কারণ নির্দেশ করতে পারেন নি। কিন্তু নিজেকে এজন্য তিনি ক্ষমাও করেন নি। এর পরে আমরা দেখ্‌বো পর পর কয়েকখানি নাটকে তিনি অবিশ্বাসী প্রেমিকের ছবি এঁকে চলেছেন এবং তাদের কশাঘাত করছেন।—অথবা এও হতে পারে যে তাঁর প্রেম ও অবন্ধন-প্রিয় প্রকৃতি একই সঙ্গে প্রেমের অমৃত আর বিচ্ছেদের হলাহল পান করবার তাগিদ অনুভব করেছিল।

ফ্রীডেরিকার স্মৃতি গ্যেটে বৃদ্ধবয়সেও পরম আন্তরিকার সঙ্গে বহন করতেন। লুইস বলেছেন:

> যে সেক্রেটারি এই কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শুনে লিখেছিলেন তিনি আজো (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) জীবিত আছেন; তাঁর পরিষ্কার মনে আছে এই সব স্মৃতি গ্যেটের মনে উদিত হলে তাঁর চিত্ত কত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দুই হাত পেছনে রেখে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে করতে তিনি বারবার থেমে দাঁড়াতেন, বলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হতো, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে এক গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে' মৃদুস্বরে পুনরায় আরম্ভ করতেন।

ফ্রীডেরিকার কাছ থেকে শেষ বিদায়ের ছবিটি তাঁর 'বরণ ও বিদায়' কবিতায় অমরতা লাভ করেছে। গীতি-কবি হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে গ্যেটের অতি উচ্চ আসন—এই কবিতায় পড়েছে তাঁর সেই প্রতিভার প্রথম ছাপ। কবিতাটির শেষ দুটি স্তবক এই:

দেখলাম তোমাকে, তোমার প্রসন্ন নয়ন
আমার অন্তরে জাগালো করুণ গর্ব ;
তোমার বুকের ছন্দে দুলছিল আমার বুক,
তোমার নিশ্বাসে নিশ্বাসে চলছিল আমার নিশ্বাস।
বসন্তের যত রঙ
ফুটেছিল তোমার মুখে ;
বক্ষে তোমার জমেছিল প্রেম—
আমারই জন্য, কিন্তু ভাগ্যহীন আমি ওগো দেবকুল !

এত শীগগির ফুরিয়ে গেল রাত !
বিচ্ছেদের ক্ষণ হানছে কঠিন আঘাত।
কী অমৃত তোমার চুম্বনে !
কী বেদনা তোমার নয়নে !
গেলাম ধীরে চলে, তুমি রইলে দাঁড়িয়ে—নতমুখী,
দেখলে মুখ তুলে—অশ্রু-ছাওয়া তোমার দুই চোখ :
ভালবাসা পাওয়া—সে কী স্বর্গ !
ভালবাসা, ওগো দেবকুল, সে কী সুখ !

ব্রাণ্ডেস বলেন :

> গ্যেটের জীবন ও প্রতিভার উপরে ফ্রীডেরিকার প্রভাব অসামান্য ; এই প্রেম তাঁর জীবনে এনে দিল বসন্তের ঐশ্বর্য। প্রেমকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন ফ্রীডেরিকার অন্তরে ; এই ফ্রীডেরিকাই রূপ পেয়েছে তাঁর বহু নায়িকার মধ্যে, আর শেষে সে চরম পরিণতি লাভ করেছে ফাউসটের মার্গারেটে বা গ্রেট্‌খেনে।

গৃহে প্রত্যাবর্তন

১৭৭১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গ্যেটে স্ট্রাস্‌বুর্গ থেকে ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে মানহাইম-এ এই তিনি প্রথম লাওকোওন, আপোলো বেল্‌ভেডিয়ার, মেডিসি-র ভেনাস, প্রভৃতি প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে' পরম পুলকিত হন। মাইন্‌ৎস্‌-এর মেলায় এক বালক-যন্ত্রী তার বাজনার দ্বারা তাঁকে মুগ্ধ করে। মেলা শেষ হয়ে আসছিল দেখে তিনি তাকে ফ্রাঙ্কফোর্টে আহ্বান করেন ও তার থাকবার জায়গা দেবেন ও আরো সুবিধা করে' দেবার চেষ্টা করবেন এই ভরসা দেন।

পুত্রের এই খেয়ালে মাতা বিব্রত হয়ে পড়লেন। মানী গ্যেটে-ভবনে থেকে এই ছোকরা মদের আড্ডায় বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা রোজগার করবে এ যে বর্ষীয়ান্-গ্যেটের চোখে কত বিসদৃশ ঠেক্‌বে সহজেই তা তিনি বুঝলেন। যাহোক অচিরে পাড়ায় এর থাকবার ও খাবার বন্দোবস্ত তিনি করে' দিলেন।

পিতা কৃতী পুত্রকে এবার সমাদরে গ্রহণ করলেন। আইন সম্বন্ধে তাঁর লাতিন ভাষায় লিখিত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন নি দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। (বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্যেটের গবেষণা নাকি প্রথমে গৃহীত হয় না খৃষ্টধর্মবিরোধী ভাবের জন্য)। তিনি সংকল্প করেন ভবিষ্যতে নিজেই এটি প্রকাশ করবেন; এতে তাঁর পুত্রের যশ অনেক বাড়বে এ ভরসা তাঁর ছিল। পুত্রের সাহিত্য-চর্চায়ও এবার তিনি আনন্দ প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হলেন না। তরুণ ডক্টর গ্যেটে তাঁর আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন—যদিও প্রথম সাত মাসে মাত্র দু'টি মোকদ্দমা তাঁর হাতে পড়েছিল। কিছুদিন পরে অবশ্য বেশী মোকদ্দমা তিনি পান।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট থেকে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর পর্যন্ত এই চার বৎসর দুই মাস গ্যেটের ফ্রাঙ্কফোর্টে কাটে-এর মধ্যে কয়েক সপ্তাহ তিনি ডারম্‌ষ্টাট্ ও ভেৎস্‌লার-এ যাপন করেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবনে এর চাইতে সৃষ্টিবহুল কাল আর কখনো আসে নি, হয়ত বিশ্বের কোনো সাহিত্যিকের জীবনেই আসে নি। এই সময়ে তাঁর 'গ্যোৎস্ ফন্ বের্লিখিঙ্গন' নাটক ও 'তরুণ ভের্টরের দুঃখ' পত্রোপন্যাস প্রকাশিত হয়—শুধু জার্মান সাহিত্য নয় সমগ্র ইয়োরোপের সাহিত্য এই দুই গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। 'প্রমেথেউস' 'গানিমেডে' 'পথচারী' 'মোহম্মদের গান'—তাঁর এইসব বিখ্যাত খণ্ডকাব্যও এইকালে রচিত হয়; আর তাঁর 'ফাউসটে'র অনেকগুলো দৃশ্যও এই সময়ে তিনি লেখেন—ফাউসট, মেফিসটোফিলিস, ভাগনার, গ্রেট্‌খেন, প্রভৃতি চরিত্র এই সময়ে তাঁর হাতে রূপ লাভ করে। ব্রাণ্ডেস বলেন:

> ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টি, যথা, একিলিস, ইউলিসিস, ডন কুইক্‌সোট, হ্যামলেট, ফল্‌স্টাফ্ ইত্যাদি, এ সবের সমমর্যাদা গ্যেটের এই সব চরিত্রের; ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মানসিক সমুন্নতি তাঁর লাভ হয়েছিল।

এই সৃষ্টিকালে গ্যেটের চিত্ত নানা ভাব-তরঙ্গে মহা আন্দোলিত হয়েছিল—তাঁর এই সময়কার চিঠিপত্রে রয়েছে তার বিশেষ পরিচয়। অপরিসীম আশা ও বিশ্বাস আর নিরতিশয় নৈরাশ্য—যার দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মহত্যার কথাও তিনি মাঝে মাঝে ভেবেছেন—অদ্ভুত দাক্ষিণ্য ও অদ্ভুত বক্রকটাক্ষ, সব মিলে তাঁর চরিত্রকে করে' তুলেছিল দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তাঁর অসাধারণত্বও সবারই চোখে পড়তো।

ঝড়-ঝাপ্‌টা যুগ

গ্যেটের তারুণ্যের এমনতর অভিব্যক্তি হয়েছিল এই সময়ের গুণেও। রুসোর স্বভাবধর্ম-বাদ ও হৃদয়তাপ অনাবৃত করবার শিক্ষা, ইংরেজ-সাহিত্যিক স্টার্ণের (Sterne) অত্যধিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা, এই সময়ের লোকদের জন্য এক বিষম ভাবাতিশয্যের আবেষ্টন সৃষ্টি করেছিল। সহজ কথাবার্তা চালচলন ভাবভঙ্গি এই যুগের তরুণ-তরুণীদের জন্য হয়েছিল নিতান্ত অবাঞ্ছিত। জার্মান-সাহিত্যের এই Sturm und Drang (Storm and Stress ঝড়-ঝাপ্‌টা) যুগ সম্পর্কে লুইস বলেন:

> প্রকৃতি প্রকৃতি বলে' চীৎকার চলেছিল। তরুণ-তরুণীদের জন্য এই প্রকৃতি হয়েছিল অগ্নি-উচ্ছ্বাস ও চাঁদের জ্যোৎস্নার মিশ্রণ—তার শক্তি উচ্ছ্বাসে, সৌন্দর্য ভাবালুতায়। কিছু না মানা আর ভাববিলাসী হওয়া, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়া তেম্‌নি কান্নায়ও ফেটে পড়া—এইসব হয়েছিল প্রতিভার অভ্রান্ত লক্ষণ।

কিন্তু এসম্বন্ধে ব্রাণ্ডেসের উক্তি বেশী অর্থপূর্ণ:

> সেদিনের বিশাল কৃত্রিমতার মধ্যে তরুণ-সমাজ হৃদয়-ধর্মের সন্ধান করছিল...যতই মানুষ দেখছিল তারা সমাজ রাষ্ট্র পৌরসভা এসবের নগণ্য অংশ মাত্র ততই তারা আঁকড়ে ধরেছিল এই চিন্তা যে তারা প্রকৃতির বিশ্বজগতের অংশ—অনন্ত প্রাণের মধ্যে এক প্রাণস্ফুলিঙ্গ,...যুগে যুগে মানুষ স্বাধীনতার সীমানির্দেশক যেসব বিধি-বিধান তৈরি করেছে তা নিছক অন্যায় ও অধর্ম; বাইরের কোনো নিয়ম-কানুন নয় অন্তরের প্রতিভাই মানুষের পথ-নির্দেশক,...আর সেই প্রতিভার বাইরে সত্যের প্রকাশ হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতিতে, সুতরাং প্রকৃতিও অনুকরণীয়।

সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর তরুণরাই এই "ঝড়-ঝাপটা" আন্দোলনের নায়ক হয়েছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ফ্রীডরিখ মাক্‌সিমিলিয়ান ফন্ ক্লিঙ্গর-এর (১৭৫২—১৮৩১) বহুলপ্রশংসিত Sturm und Drang নাটক থেকে এর নামকরণ হয়। এই নাটকখানির প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য অবশ্য নগণ্য, কিন্তু এর লেখকের ব্যক্তিত্ব ও জীবন অর্থপূর্ণ। তাঁর জন্ম ফ্রাঙ্কফোর্টের এক দরিদ্র পরিবারে। বাল্যজীবনের দুঃখ ও নির্যাতন তাঁকে করেছিল বিদ্রোহী। রুসো ছিলেন তাঁর একমাত্র গুরু—তাঁর 'এমিল' তাঁর বাইবেল। তাঁতে একদিকে যেমন ছিল দৃঢ়তা, স্বাধীনতা-বোধ, বিনয়, অসাধারণ স্মরণশক্তি, ভাষা-জ্ঞান, অন্যদিকে তেম্‌নি ছিল আহারে-বিহারে চূড়ান্ত অমিতাচার। গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা ছিল তাঁর স্বপ্নের দেশ। পরবর্তীকালে তিনি রাশিয়ায় সেনা-নায়কের পদে উন্নীত হয়েছিলেন, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কিউরেটরে'র

পদও লাভ করেছিলেন; আর বৃদ্ধবয়সে যৌবনের বন্ধু গ্যেটের সঙ্গে নূতন করে' প্রীতির যোগে যুক্ত হয়েছিলেন।

এই আন্দোলনের আর একজন ধুরন্ধর ছিলেন লেন্‌ৎস্—সারাজীবন তিনি করেছিলেন গ্যেটের অনুকরণ। ব্রাণ্ডেস বলেছেন, গ্যেটের অনুকরণে তিনি ফ্রীডেরিকাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন।

এই আন্দোলন সত্যকার সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে গ্যেটের 'গ্যোৎস্' নাটক ও 'ভের্টর' উপন্যাস থেকে।

গ্যোৎস্ ফন বের্লিখিঙ্গন

গ্যোৎস্ নাটকখানি গ্যেটে তিনবার লেখেন। প্রথম পাণ্ডুলিপি তৈরি হয় ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে শীতকালে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি আত্মচরিতে লিখেছেন:

> শেক্সপীয়রের নাটকের প্রতি গভীর প্রীতির ফলে আমার চিত্ত এত সম্প্রসারিত হলো যে রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ পরিসর ও অভিনয়ের জন্য নির্ধারিত স্বল্প সময় কোনো বড় কিছু প্রদর্শনের নিতান্ত অযোগ্য বলে' আমার ধারণা জন্মালো। বীরাগ্রগণ্য গ্যোৎস্ ফন বের্লিখিঙ্গনের (Gotz Von Berlichingen) আত্মচরিত পড়ে' ঐতিহাসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু লিখবার তাগিদ অনুভব করছিলাম; আমার কল্পনা এমন বিপুল-পরিসর হয়ে পড়লো যে আমার পরিকল্পনা ক্রমেই রঙ্গমঞ্চের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে' চল্‌লো—জীবনের বাস্তব ঘটনা হলো তার লক্ষ্য।

কবি তাঁর এই পরিকল্পনার কথা তাঁর সহোদরা কর্ণেলয়ার কাছে ব্যক্ত করলেন। কর্ণেলিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে তাঁকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন এসব লিপিবদ্ধ করতে—শুধু মুখে মুখে শেষ না করতে। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে একদিন আগে থাকতে কিছুমাত্র চিন্তা না করে' তিনি লিখতে বসলেন। প্রথম কয়েক দৃশ্য লিখে সন্ধ্যায় ভগিনীকে পড়ে শোনালেন। তাঁর যারপরনাই পছন্দ হলো, কিন্তু টিপ্পনী করলেন—হয়ত এইই শেষ। এতে কবির জেদ চড়ে গেল। দ্বিতীয় দিন আবার লিখলেন। তৃতীয় দিনও লিখলেন। এম্‌নি করে' লিখতে লিখতে ও পড়ে শোনাতে শোনাতে রচনাটি জমতে লাগ্‌লো। ছয় সপ্তাহে এই নাটকটি লিখে তিনি শেষ করলেন।—নাটকখানি লিখে তাঁর অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু মের্ক-কে পড়তে দিলেন। তিনি মোটের উপর ভালই বললেন। হের্ডরের কাছে পাঠানো হলে তিনি ভাল ত বললেনই না উপরন্তু এইটি উপলক্ষ করে' ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করতেও ছাড়লেন না।—পরে অবশ্য তিনি এর যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছিলেন।

এই নাটকের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই :

গট্‌ফ্রীড বা গ্যোৎস্‌ ষোড়শ শতাব্দীর একজন লুণ্ঠনপ্রিয় ব্যারন, অর্থাৎ পরাক্রান্ত জমিদার। সম্রাটের সে একান্ত অনুগত, কিন্তু অপর ব্যারন নাইট প্রভৃতির সঙ্গে তার কলহের অন্ত নেই। অজেয় তার পরাক্রম, যুদ্ধেই তার আনন্দ। নাইট আডেলার্ট ফন ভাইস্‌লিঙ্গেন তার বাল্যবন্ধু কিন্তু সে গ্যোৎসের পরম শত্রু বাম্‌বের্গের বিশপের* চক্রান্তে পড়ে গ্যোৎস্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। একদিন ভাইসলিঙ্গেন যখন বিশপ-সন্দর্শনে যাচ্ছিল তখন গ্যোৎস্‌ তাকে পরাভূত করে' স্বীয় দুর্গে বন্দী করে। সেখানে নাটকখানিতে গ্যোৎসের সেনানীজনোচিত রূঢ় অটল কর্তব্যনিষ্ঠ চরিত্র আর ভাইসলিঙ্গেনের সভাসদসুলভ দুর্বল ও অব্যবস্থিত চরিত্র পাশাপাশি সুন্দর ফুটেছে। গ্যোৎসের সংস্পর্শে এসে দুর্বলচেতা ভাইসলিঙ্গেনের মতের পরিবর্তন ঘটে; সে তার বাল্যবন্ধুর পক্ষ সমর্থন করতেই কৃতসংকল্প হয় ও তার প্রমাণ স্বরূপ গ্যোৎসের ভগিনী মধুর-স্বভাবা স্নেহময়ী মারিয়াকে তার বাগ্‌দত্তা রূপে গ্রহণ করে। বামবের্গের বিশপের সঙ্গে তার বোঝাপড়া করবার কিছু ছিল, সেজন্য সে সেখানে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে স্বামীহীনা মোহিনী আডেলহাইডের রূপে আকৃষ্ট হয়ে মারিয়ার চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে তার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয় ও এম্‌নি করে' আবার গ্যোৎসের শত্রুপক্ষভুক্ত হয়। এই সময়ে গ্যোৎস্‌ এক বণিকদলের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে—এমনি-ধরণের লুণ্ঠন ছিল তার শৌর্যপ্রকাশের আর দুঃস্থদের সাহায্য দানের উপায়। ভাইসলিঙ্গেন সম্রাটকে গ্যোৎসের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। সম্রাটের সেনাদলের হাতে গ্যোৎস্‌ পরাজিত হয়ে স্বীয় দুর্গে শান্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, ও আত্মচরিত রচনায় মন দেয়। এদিকে দেশে এক বিষম কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়—যাদের তারা অত্যাচারী বলে' জান্‌তো তাদের উপরে তারা ভীষণ অত্যাচার চালায়। গ্যোৎস্‌ এসব থামিয়ে দিতে চেষ্টা পেলে বিদ্রোহীরা তাকে তাদের নেতা হতে অনুরোধ করে। কিন্তু নেতা হয়ে গ্যোৎস্‌ তাদের বশে রাখতে অপারগ হয়। সম্রাটের সৈন্যদের হাতে সে বন্দী হয় ও কারাগারে প্রাণত্যাগ করে। তার শেষ উক্তি এই :

প্রতারণার যুগ আসছে; প্রতারণা স্বাধীনতা ভোগ করছে। অপদার্থরা করবে ছলনার সাহায্যে প্রভুত্ব বিস্তার আর যারা বীর তারা বন্দী হবে কাপুরুষদের পাতা জালে। হায় স্বর্গীয় সমীর স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

* বিশপ—মোহন্ত।

নাটকখানির শেষের দিকে সুন্দরী আডেলহাইডের মূর্তি সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে। ভাইসলিঙ্গেনকে শীগগিরই সে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে ও সিকেঙ্গেন নামক আর একজন বীর নাইটের অনুরাগিনী হয়। তার অনুগ্রহভাজন তরুণ ভৃত্য ফ্রান্ৎস্-এর হাতে সে ভাইসলিঙ্গেনকে বিষ দানে হত্যা করে। ফ্রান্ৎস্ আত্মহত্যা করে; আডলেহাইড নিজেও বিচারকদের হাতে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে। আডেলহাইডের উপরে পড়েছে শেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রার ছায়া। তাকে কবি এক অপূর্ব শয়তানী রূপে অঙ্কিত করেছেন—তার রূপ-যৌবনের সংস্পর্শে এসে তরুণ ফ্রান্ৎস্ কবি হয়ে উঠ্ছে।

পাণ্ডুলিপি তৈরির পরই গ্যেটে বুঝলেন প্রচলিত ফরাসী আদর্শের সময় ও স্থানের একত্ব লঙ্ঘন করতে গিয়ে গ্রন্থের ভিতরকার সত্যকার একত্বের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়নি। শেষের দিকেই এই ত্রুটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই দ্বিতীয় বারে আডেলহাইড-কাহিনী ছোট করা হলো, অন্যান্য জায়গায়ও অনাবশ্যক অংশ বাদ দেওয়া হলো।

তৃতীয়বার এটি বদ্‌লানো হয় ভাইমারে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসী-বিপ্লবের পরে। (ফরাসী-বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।) তৃতীয়বারের গ্যোৎস্ এক সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ, পূর্বের বিদ্রোহী গ্যোৎস্ তাতে যথেষ্ট শান্ত হয়ে গেছে।—সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমালোচকরা প্রথমবারের লেখা নাটকটিরই বেশী প্রশংসা করেন, তাতে তরুণ কবির উদ্দাম হৃদয়াবেগ গৈরিক নিঃস্রাবের মতো এক অদ্ভুত সৌন্দর্য লাভ করেছে।

গ্যোৎস্ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে, গ্যেটে ও মের্কের খরচে—এই প্রতিপত্তি-হীন গ্রন্থকারের রচনা কোনো প্রকাশক নিতে রাজি হবে কেন? কিন্তু প্রকাশ হবা মাত্র এর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। একজন প্রকাশক এসে এমন এক ডজন নাটক লিখে দেবার ফরমাস দিলে। একমাত্র ফ্রেডেরিক দি গ্রেট এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন; তিনি ফরাসী আদর্শের অনুরাগী ছিলেন—ভলটেয়ারের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক যোগ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কিন্তু সমস্ত জার্মানীতে গ্যোৎস্ যে অভিনন্দন পেলো তার সামনে তাঁর অপসন্দ ভেসে গেল।

গ্যোৎস্ নাটকখানি একালের কাব্যরসিকদের তেমন প্রিয় নয়—যদিও ব্রাণ্ডেস বলেন কিশোরকিশোরীদের চিত্ত-বিকাশের সহায় হিসাবে আজো এ এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এর ঐতিহাসিক মর্যাদা কিন্তু খুব বেশী। অনেকের মতে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে Romanticism-এর (উচ্ছ্বাস-বাদের) প্রবর্তনা এর থেকে।* ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ঔপন্যাসিক স্কট এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অতীতমুখী রোমান্টিক

* একালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক আর্ভিং ব্যাবিট রোমান্টিসিজম-এর উৎপত্তি দেখেছেন রুসোতে। তাঁর অভিমতই বেশী সঙ্গত মনে হয় কেননা Sturm und Drang, Romanticism এসব প্রায় সমধর্মী; Sturm und Drang-এর সঙ্গে রুসোর যোগের কথা আগেই বলা হয়েছে।

রুচির সমর্থন তিনি যে এতে পেয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। জার্মান সাহিত্যে এর খুব বড় দান এই যে মার্টিন লুথারের পরে গ্যোৎস্ নাটকেই জার্মান জাতি পেলো সবল অকুণ্ঠিত হৃদয়ের ভাষা।—জাতীয়তার মহাগ্রন্থরূপেও বারবার এটি আদৃত হয়েছে। সেটি অবশ্য এর অপব্যাখ্যা। গেটের কাব্যচেষ্টা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-বোধের ইতিহাস—কোনো সংকীর্ণ বা বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার নয়।

মের্ক

ফ্রীডেরিকাকে ত্যাগ করে' আসার দুঃখ গেটে তীব্রভাবে অনুভব করতেন। তাই মনকে শান্ত করবার জন্য একা একা দীর্ঘ ভ্রমণে বহির্গত হতেন। খোলা আকাশ, উপত্যকা, অধিত্যকা, বিস্তীর্ণ মাঠ, এসবের প্রতি স্বভাবতই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। একদিকে ডার্মষ্টাট অপর দিকে হামবুর্গ এই দুই সুন্দর জায়গার মাঝখানে ফ্রাঙ্কফোর্ট, তিনি বলেছেন এই অবস্থিতির জন্য এই সব ভ্রমণ তাঁর পরম উপভোগ্য হতো। এমন এক দীর্ঘ ভ্রমণ কালে তিনি ভয়ানক ঝড়ের ভিতরে পড়েন সেই ঝড়ের ভিতরে চলতে চলতে মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করেন ও চেঁচিয়ে তা আবৃত্তি করতে থাকেন। আত্মচরিতে এটিকে তিনি বলেছেন অর্ধপ্রলাপ। কবিতাটির নাম 'পথচারীর ঝড়ের গান' (Wanderer's Storm-Song), তার কয়েকটি লাইন এই :

প্রতিভা, প্রতিভা, যে পেয়েছে তোমার আদেশ
বর্ষণ ও ঝঞ্ঝা
তার বুকে জাগায় না ভয়।
প্রতিভা, প্রতিভা, যে পেয়েছে তোমার আদেশ
যমদূতাকৃতি মেঘে
করকায় ও বিদ্যুতে
সে জানায় ফুল্ল উপেক্ষা—
আকাশের
ওই চাতকের মতো।

কিন্তু কাব্য হিসাবে এর চাইতে অনেক উঁচুদরের তাঁর এই সময়ের অন্য একটি কবিতা, নাম 'পথচারী'। দুপুর রোদে এক ক্লান্ত পথচারী এক নারীর দেখা পায়—সেই নারীর কোলে শিশু। নারী তাকে আতিথ্য গ্রহণ করতে কুটীরে আহ্বান করে, ও তাকে সেই কুটীরে বসিয়ে রেখে ঝরণায় জল আনতে যায়। পথিক লক্ষ্য করে এই কুটীর এক ভাঙা মন্দিরের পাথর দিয়ে তৈরি—এই সামান্য আশ্রয়ে আনন্দে কাটছে এই দম্পতির। এই কবিতায় তরুণ কবির চোখে চমৎকার ধরা পড়েছে—

ধ্বংসের উপর দিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে চলেছে জীবনের জয়যাত্রা। এর কয়েকটি চরণ এই :

প্রকৃতি! ওগো শাশ্বতী জনয়িত্রী!
সন্তানদের তুমি জন্মদান করেছ
জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য।
মায়ের যত্ন দিয়ে তুমি ব্যবস্থা করেছ
প্রত্যেকের জন্য তার আপন কুটীর।
... ...
গুটিপোকা বোনে তার বাসা ডালে
তার সন্ততির আশ্রয় হেতু :
আর দাঁড় করিয়েছ তুমি, অতীতের
মহিমান্বিত ভগ্নাবশেষ দিয়ে,
নগণ্য আশ্রয়।
... ...
ওগো প্রকৃতি, দেখিয়ে চল আমার পথ,
চলেছি আমি
পূত অতীতের
সমাধি-ভূমির উপর দিয়ে
সদয় আশ্রয়ে······
যখন ফিরবো আমি
সন্ধ্যায়
আপন কুটীরে,
অস্তরবিরঞ্জিত,
তখন যেন বক্ষে পাই এমন পত্নী
কোলে তার শিশু। *

এই কালে ডার্মষ্টাটে তাঁর পরিচয় হয় মের্কের (১৭৭৪—১৭৯১) সঙ্গে। তিনি বলেছেন তাঁর জীবনের উপরে এঁর প্রভাব সব চাইতে বেশী। এ অতিরঞ্জন নয়। এই সময়ে মের্ক যেমন তাঁকে বুঝেছিলেন আর কেউই তেমন পারেন নি। গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি গ্যেটে জিজ্ঞাসুদের শিরোধার্য :

* E. A. Bowring এর Goethe's Poems গ্রন্থে পুরো কবিতাটির অনুবাদ রয়েছে। কৌতূহলী পাঠক রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও তাঁর যৌবনের এই জাতীয় অন্যান্য রচনার সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়তে পারেন।

তোমার চেষ্টা তোমার অবিচলিত লক্ষ্য হচ্ছে যা বাস্তব তাকে কাব্য-রূপ দেওয়া। অন্যেরা চেষ্টা করে তথাকথিত কবিত্বের সৌন্দর্য কল্পনার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে—যার অবশ্যম্ভাবী ফল নির্বোধ অর্থহীনতা।

এঁর পরিচয় গ্যেটে আত্মচরিতে দিয়েছেন এই ভাবে :

স্বভাবত তিনি ছিলেন ধীশক্তিসম্পন্ন, যথেষ্ট উপাদেয় জ্ঞানও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, বিশেষ করে' আধুনিক সাহিত্যে, আর মানুষ ও বিশ্বজগতের সর্বদেশের সর্বকালের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করেছিলেন। অভ্রান্তভাবে ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করবার প্রতিভা তাঁতে ছিল। পাকা ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি আদৃত হতেন, হিসাব করতে পারতেন মুখে মুখে। যেখানে তাঁর ভয়াবহ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিচয় দেবার প্রয়োজন বোধ করতেন না সেখানে তিনি অতি অমায়িক বন্ধুরূপে সমাদরে গৃহীত হতেন। দেখতে তিনি ছিলেন লম্বা ও পাৎলা; তাঁর চোখা নাক খুব চোখে পড়তো; তাঁর চোখ ছিল নীল অথবা ধূসর রঙের, চারদিকে তিনি চাইতেন তীক্ষ্ণভাবে, তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল যেন বাঘের দৃষ্টি। তাঁর প্রকৃতির ভিতরে এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতা ছিল। স্বভাবত তিনি ছিলেন সৎ মহৎ ও অকুটিল, কিন্তু জগতের প্রতি হয়ে পড়েছিলেন বিতৃষ্ণাপরায়ণ, আর তাঁর এই মনোভাবকে এতটা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে ধূর্তামি এমনকি নষ্টামির পরিচয় না দিয়ে তিনি যেন পারতেন না। এই মুহূর্তে তিনি হয়ত বিবেচক শান্ত সদয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই—শামুক যেমন তার শুঁড় বের করে তেম্‌নিভাবে—তাঁর হয়ত খেয়াল যাবে একটু খোঁচা একটু আঘাত এমন-কি কিছু ক্ষতি করতে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা না থাকলে বিপজ্জনক বস্তু নিয়েও যেমন অবাধে মানুষের কাজ চলে আমিও তেম্‌নি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে আমার প্রতি তাঁর মন্দ দিকটা কখনো উদ্যত হবে না, আর এই বিশ্বাসে তাঁর সাহচর্য লাভ করে' তাঁর সদ্‌গুণাবলী উপভোগ করতে আগ্রহান্বিত ছিলাম।

পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ইনি আত্মহত্যা করেন। মেফিসটোফিলিস চরিত্রের পরিকল্পনা যে মের্ককে দেখে গ্যেটে করেছিলেন এ বিষয়ে আলোচকরা প্রায় একমত।

মের্ক, গ্যেটে, ও আরো কয়েকজন তরুণকে নিয়ে এক আলোচনা-চক্র গড়ে' উঠেছিল। তাঁদের মুখপত্র সর্বত্র আদরে পঠিত হতো। সাহিত্য বিজ্ঞান সব বিষয়েই এতে আলোচনা চলতো।

ভেৎস্‌লার

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে গ্যেটে তাঁর আইন-ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ভেৎস্‌লার-এ যান—সেখানে ছিল Holy Roman Empire-এর উচ্চ বিচারালয়। জায়গাটি তাঁর পছন্দ হয় না। এখানে নিরানন্দ জীবন যাপন করতে হবে এই তাঁর আশঙ্কা হয়। কিন্তু শীগ্‌গিরই একদল কৌতুকপ্রিয় তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো, তাঁর জীবন অন্তত কিছুদিনের জন্য আর নিরানন্দ রইল না। এই দলের সম্পাদক ছিলেন গ্যোটের, ইংরেজি সাহিত্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল। আমাদের কবি ও ইনি দু'জনেই গোল্‌ড্‌স্মিথের Deserted Village-এর অনুবাদ করেন। কবি বলেছেন, গ্যোটেরের অনুবাদ বেশী ভাল হয়েছিল।

আত্মচরিতে গ্যেটে লিখেছেন—ভেৎস্‌লার-এ তেমন বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু তাঁর চরিতকাররা সে-কথা মেনে নিতে রাজি নন। এখানে এক গ্রাম্য নাচের মজলিসে শার্লোট বুফ-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এঁর সম্বন্ধে কবি বলেছেন—ইনি হচ্ছেন সেই জাতীয় নারী যারা পুরুষের অন্তরে বাসনার আগুন জ্বালায় না, শুধু এদের দেখে তৃপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কবির এই সময়ের চিঠিপত্র থেকে নজির তুলে চরিতকাররা বলেন—এবারও তিনি কুসুমসায়কের হাত থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পান নি।

শার্লোট ছিলেন কেস্‌ট্‌নর-এর বাগ্‌দত্তা; কেস্‌ট্‌নর ভেৎস্‌লার-এর একজন চাকুরে—ধীর স্থির চরিত্রবান্‌। শার্লোটের মা ছিলেন না, দশ-বারোটি ভাইবোনকে তিনি নিজে পরম যত্নে মানুষ করতেন। গ্যেটে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বড় ভাল বাসতেন, শার্লোটের ভাইবোনেরা তাঁর এত অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল যে তিনি ভেৎস্‌লার ত্যাগ করে' চলে গেলে তারা প্রায়ই তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতো। শার্লোট জানতেন গ্যেটে তাঁর প্রতি অনুরাগী, কিন্তু তিনি সেই দিনের ভাববিলাসিনী মেয়ে ছিলেন না আদৌ; গ্যেটেকে তিনি অনাদর করতেন না, বরং আদরই করতেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে অনুরাগের ইন্ধন যোগানো না হয় সেদিকেও তাঁর সাবধানতা ছিল। শার্লোটের এমন সংস্রব গ্যেটের জন্য হচ্ছিল দিন দিন বেশী পীড়াদায়ক। শেষে একদিন তিনি কাউকে না বলে' ভেৎস্‌লার পরিত্যাগ করে' যান। যাবার বেলায় কেস্‌ট্‌নরের জন্য এই চিঠিখানি রেখে যান:

> ···সে চলে গেছে, কেস্‌ট্‌নর; যখন এটি তোমার হাতে পড়বে তখন সে চলে গেছে দূরে···আমার মনে কোনো বিক্ষোভ ছিল না, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথাবার্তায় ভিতরটা আমার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে মাত্র তোমাকে বলতে পারি—বিদায়! যদি ওখানে আর এক মুহূর্ত বেশী

থাকতে হতো তবে নিজেকে চেপে রাখা আমার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। এখন আমি একলা, আর কাল যাচ্ছি। ওঃ মাথায় কী যন্ত্রণা !

কেস্‌ট্নর হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছিলেন। গ্যেটেকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন যথেষ্ট। তাঁর এমন হঠাৎ চলে যাওয়ায় তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন—অথচ প্রেমের রণে তাঁর এই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে যে পরাভূত করতে পারেন এ আশঙ্কাও মাঝে মাঝে তাঁর মনে জেগেছে। তরুণ গ্যেটে সম্বন্ধে তাঁর এক পত্রে অঙ্কিত এই চরিত্র-চিত্র গ্যেটে-চরিতকাররা সাদরে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন :

বসন্তকালে এখানে গ্যেটে নামে একজন এলেন, আইনব্যবসায়ী, বয়স তেইশ বৎসর, খুব ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, উদ্দেশ্য—উদ্দেশ্যটি অবশ্য পিতার—আইন-ব্যবসায়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, কিন্তু তাঁর নিজের উদ্দেশ্য হোমর পিন্দার ইত্যাদি পাঠ, অথবা যেসব ব্যাপারে তাঁর প্রতিভা ও চিন্তাধারা তাঁকে প্রবর্তিত করে সেই সবের অনুশীলন।

প্রথমেই এখানকার সাহিত্যিকরা তাকে তাঁদের একজন বলে' চারিদিকে খবর রটালেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টের "গেলেটে জাইটুং"-এর পরিচালকবর্গের অন্যতম ভাবুক, এসব খবরও তাঁরা দিলেন, ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে খুব ব্যস্ত হলেন। আমি এদলের লোক নই, সাধারণ সমাজে ঘোরাফেরাও আমার কম, তাই গ্যেটের আমি জেনেছি দেরীতে। এখানকার খ্যাতনামা সাহিত্যিক গ্যেটের একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমাকে গার্বেনহাইম গ্রামে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম ইনি এক গাছের নীচে ঘাসের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, পাশে দাঁড়িয়ে একজন এপিকিওর (ভোগ)-পন্থী, একজন স্টোইক (সংযম)-পন্থী ও একজন মধ্যপন্থী। এদের সঙ্গে পরমানন্দে তাঁর আলাপ চলেছিল। আমি যে এই অবস্থায় তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম এতে তিনি পরে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা হলো—তার কতকগুলো খুবই চিত্তাকর্ষক। এই সময়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার এই ধারণাটুকু হয়েছিল যে ইনি সাধারণ লোক নন। তাড়াতাড়ি অভিমত প্রকাশ করা অবশ্য আমার স্বভাব নয়। এঁকে দেখেই বুঝলাম এঁর প্রতিভা ও সতেজ কল্পনা-শক্তি আছে। কিন্তু এতেই যে এঁর সম্বন্ধে আমার খুব উঁচু ধারণা হলো তা নয়। এঁকে পরে আমি আরো ভাল করে' জেনেছি········· এঁর যথেষ্ট গুণপণা আছে—সত্যকার প্রতিভার ইনি অধিকারী ও চরিত্রবান্। এঁর কল্পনা-শক্তি খুব প্রবল, তাই এঁর ভাষা সাধারণত রূপক ও উপমা-বহুল। তিনি অনেক সময়ে বলেন সোজাসুজি মনের কথা ব্যক্ত করতে তিনি আদৌ পারেন না, তবে আরো বয়স হলে তাঁর চিন্তা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারবেন এমন আশা রাখেন। তিনি যা-কিছু ভালবাসেন সমস্ত প্রাণ ঢেলে, অথচ আত্মকর্তৃত্বও অনেক

৬

সময়ে বেশ দেখান। তাঁর চিন্তাধারা মহৎ, সংস্কার থেকে তিনি এত মুক্ত যে নিজে যা ভাল বলে' জানেন তাই তিনি করেন, তাতে অন্যে খুশী হবে কি না, সেইটি চলিত কি না, দস্তুর কি না, এসব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান না।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তাঁর খুব প্রিয়, তাদের সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ জমে। যথেষ্ট খেয়ালী তিনি। তাঁর ব্যবহারে ও চালচলনে এমন অনেক-কিছু আছে যাতে তিনি অপরের কাছে বিরক্তিকর হতে পারেন। কিন্তু তবু তিনি ছেলেপিলেদের মেয়েদের ও অন্যান্য বহু লোকের প্রিয়। নারীজাতির প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা। জীবনের নিয়ামক কোনো সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি এখনো স্থিরনিশ্চয় নন—সেরূপ সিদ্ধান্তের সন্ধানে তিনি অবশ্য আছেন। এই ব্যাপারে রুসোর সম্বন্ধে তাঁর খুব উঁচু ধারণা, কিন্তু তাঁর অন্ধ অনুবর্ত্তী তিনি নন। ধর্মে নিষ্ঠাবান্ বলতে যা বোঝায় তিনি তা নন, কিন্তু সেটি অহঙ্কার বা খেয়ালের বশে অথবা নিজে একটা কিছু হবার জন্যে নয়। কতকগুলো গুরু বিষয়ে তিনি খুব কম লোকের কাছে মুখ খোলেন, আর অন্যের মনের শান্তিতে ইচ্ছা করে' বাদ সাধেন না। তিনি সংশয়-বাদ ঘৃণা করেন। সত্য ও কতকগুলো বড় বিষয়ে সুনিশ্চয়তা লাভ তাঁর কাম্য, আর মনে করেন তিনি এরই মধ্যে সব-চাইতে গুরু বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কিন্তু যতদূর দেখেছি, এ সত্য নয়। তিনি গির্জায় অথবা Sacrament† অনুষ্ঠানে যান না, প্রার্থনা করতেও তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। তার কারণ তিনি বলেন, তিনি অত ভণ্ড নন। কখনো কখনো মনে হয় কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর মন বেশ শান্তিতে আছে, কখনো কখনো মনে হয় তার উল্টো। তিনি খৃষ্টধর্মকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু আমাদের ধর্মতত্ত্ববিদ্‌রা তার যে-রূপ আমাদের সামনে ধরেন সে-রূপের নয়। তিনি জীবনের একটি পরবর্ত্তী অবস্থা একটা উন্নততর অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্। তিনি সত্যের সন্ধানী, তবু সত্যের প্রদর্শনের চাইতে সত্যের অনুভূতিতে তাঁর আনন্দ বেশী। তিনি এরই মধ্যে অনেক কিছু করেছেন, অনেক গুণপণা তাঁর আছে, পড়াশুনাও ঢের করেছেন; কিন্তু তার চাইতেও চিন্তা করেছেন বেশী। সাহিত্য ও কলাবিদ্যা নিয়েই তিনি এ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন, অথবা, যাতে রুটির ব্যবস্থা হয় তা বাদ দিয়ে আর সব রকমের বিদ্যায় মন দিয়েছেন।······আমি তাঁর বর্ণনা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার জন্য সময় চাই যথেষ্ট, কেননা তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে। এক কথায় লোকটি খুব চোখে পড়বার মতো।

† খৃষ্টের 'দেহ' ও 'শোণিত' সেবন ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

দেববাণীর ব্যর্থতা

মের্কের সঙ্গে গোটের আগেই কথা ছিল এই সুন্দর ঋতুতে একবার কোবলেন্‌ৎস্ এর সুলেখিকা শ্রীমতী ফন লারোশ-এর ওখানে কয়েকদিন কাটানো যাবে। জিনিষপত্র ফ্রাঙ্কফোর্টের দিকে রওনা করে দিয়ে তিনি ভেৎস্লার ছেড়ে 'লান' নদীর তীর ধরে' সেইদিকে চললেন। নদীতীরের ও দূরে দূরের ছবির মতো প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁর বেদনাকাতর চিত্ত প্রকৃতির এই স্পর্শে সজীব হয়ে উঠ্‌লো। মুগ্ধ দৃষ্টিতে পরম আনন্দে তিনি পথ চলতে লাগলেন।

এই সময়ের একটি ঘটনা স্মরণীয়। এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ছবি আঁকার কথা তাঁর মনে খুব জাগছিল। তিনি এখনো মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন; শিল্পচর্চায় কালে খ্যাতি অর্জন করবেন এ স্বপ্নও তাঁর ছিল। তাঁর পকেটে একখানি দামী ছুরি ছিল। তাঁর এক প্রবল খেয়াল জাগ্‌লো, সেই ছুরিখানি ছুঁড়ে নদীতে ফেলবেন, যদি সেখানিকে জলে পড়তে দেখেন তাহলে বুঝবেন তাঁর শিল্পী হবার সাধ পূর্ণ হবে, আর যদি ছুরিখানি এমন ভাবে পড়ে যে তীরের উইলো ঝোপের দরুণ তা জলে পড়তে দেখা গেল না, তাহলে বুঝবেন শিল্পী হবার বাসনা তাঁর ত্যাগ করা ভাল। যেমন সংকল্প তেম্‌নি কাজ। তিনি লিখেছেন:—

> প্রাচীনেরা দেববাণীর ব্যর্থতা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ করে' গেছেন, আমার বেলায়ও তাই ঘট্‌লো। ছুরিখানি ঠিক কোন্‌খানে জলে পড়লো তা দেখা গেল না উইলোর ঝুঁকে-পড়া ডালপালার দরুণ, কিন্তু ছিট্‌কে-ওঠা জল পরিষ্কার দেখা গেল।

গ্যেটে বুঝে নিলেন তাঁর চিত্র চর্চা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। এই ধারণার জন্যই পরে তিনি চিত্র-চর্চায় তেমন মনোযোগ দেন নি একথা তিনি বলেছেন। তখনকার মতো তাঁর চিত্ত বড়ই বিষাদভারাক্রান্ত হলো।

শ্রীমতী ফন লারোশ-এর ওখানে ক'দিন তাঁর বেশ কাট্‌লো। আরো কয়েক-জন সাহিত্যিক সেখানে জুটেছিলেন। এই মহিলার বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। তাঁর রূপের ও গুণের ভূয়সী প্রশংসা কবি করেছেন। এই কয়েক দিনে এঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাক্‌সিমিলিয়ানা-র সঙ্গে কবির খুব ভাব জমে।

ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে এসে গ্যেটে আইন সাহিত্য ও চিত্রচর্চা নিয়ে ব্যস্ত হলেন। শার্লোট ও কেস্‌ট্নর এর কাছে উচ্ছ্বসিত ভাষায় চিঠি লেখা চললো। নিজেদের পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা বেরুতে লাগ্‌লো।

কয়েকটি খণ্ড-কাব্য

গ্যোৎস্ প্রকাশের পরে গ্যেটে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও বিপক্ষ সবাইকে লক্ষ্য করে' ব্যঙ্গকবিতা প্রহসন ইত্যাদি রচনায় মন দিলেন। রুসো, ঝড়-ঝাপটা, এসবও বাদ গেলনা। কিন্তু তারুণ্যের এই অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় যাতে আছে তেমন খণ্ড-রচনাও তাঁর হাতে উৎরায়। সেসবের মধ্যে তাঁর "মোহম্মদ" (Mahomet) ও "প্রমেথেউস" (Prometheus) প্রধান।

'মোহম্মদ' নাটকখানি লিখবার আগে তিনি কোরান ও মোহম্মদের জীবন-চরিত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। প্রতিভাবান্ যখন কোনো বড় কাজে হাত দেন তখন তাঁকে জনসাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তারের জন্যে তাদের স্তরে নেমে আসতে হয় ও এই ভাবে তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য পরিম্লান হয়, এইটি দেখাবার জন্যে তিনি এই নাটকখানি লেখার সংকল্প করেন। নাটকটির পরিকল্পনা এই :

> প্রারম্ভে উন্মুক্ত আকাশের নীচে মোহম্মদের একটি বন্দনাগীত। প্রথমে তিনি আকাশের অনন্ত নক্ষত্রকে দেবতাজ্ঞানে স্তুতি-নিবেদন করছেন; কিন্তু যখন বৃহস্পতির উদয় হলো তখন নক্ষত্ররাজ জ্ঞানে শুধু তারই বন্দনায় তিনি রত হলেন। এর পরে চন্দ্র ও সর্ব্বশেষে সূর্য তাঁর হৃদয়মন আকর্ষণ করলে। কিন্তু এই সবে কিছু কিছু আনন্দ পেলেও এক অতৃপ্তি-বোধ তাঁর হচ্ছিল,—আরো আরো ঊর্ধ্বগ্রামে মনকে উঠ্তে হবে. এই তাগিদ তিনি অনুভব করছিলেন। শেষে শাশ্বত অনন্ত সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের স্রষ্টা এক ঈশ্বরের ধারণায় তিনি উপনীত হলেন।—গ্যেটে বলেছেন :
>
> খুব এক আনন্দ নিয়ে আমি এই স্তব রচনা করেছিলাম। কিন্তু এটি হারিয়ে যায়।
>
> এম্‌নিতর এক নব প্রেমে বলীয়ান্ হয়ে মোহম্মদ তাঁর মনোভাব তাঁর বন্ধুবর্গের নিকট ব্যক্ত করেন, তাঁর পত্নী ও আলি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অঙ্কে মোহম্মদ তাঁর নূতন মত জ্ঞাতিবর্গের ভিতরে প্রচার করতে চেষ্টা পান; আলি তাঁর সাহায্যে ব্রতী হন। জ্ঞাতিদের কেউ এটি পছন্দ করে, কেউ অপছন্দ করে, এই পসন্দ অপসন্দের ভিতর দিয়ে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পেতে থাকে। শেষে সংঘর্ষ প্রবল হয়; মোহম্মদ দেশত্যাগ করেন। তৃতীয় অঙ্কে তিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করেন ও তাঁর ধর্ম্ম সর্বসাধারণের ধর্ম্মরূপে প্রচার করেন, কাবা থেকে সমস্ত দেবমূর্তি অপসারিত করান;

কিন্তু বলে এতে পুরোপুরি কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা নেই দেখে' ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁর চরিত্রের যত মানবসুলভ দুর্বলতা এইবার বৃদ্ধি পেতে থাকে ও তাঁর ভিতরকার দেবত্ব আচ্ছন্ন হয়। চতুর্থ অঙ্কে তাঁর বিজয়-অভিযান চলতে থাকে। তাঁর ধর্ম্মমত তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় স্বরূপ তিনি ব্যবহার করেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যা-কিছু দরকার সবই তিনি অবলম্বন করেন, নৃশংসতাও বাদ যায় না। জনৈক নারীর স্বামী তাঁর আদেশে নিহত হয়, সেই নারী তাঁকে বিষদান করে। পঞ্চম অঙ্কে, তিনি বুঝতে পারেন তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। তাঁর বিপুল ধৈর্য, তাঁর চরিত্রের সমস্ত মাহাত্ম্য, এইবার ফিরে আসে। তাঁর ধর্ম্মের ভিতরকার সমস্ত ত্রুটি তিনি পরিহার করেন, তাঁর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, ও শেষে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন।

গ্যেটে বলেছেন;

এই পরিকল্পনাটি দীর্ঘদিন আমি ভাবি, তার কারণ, আমার নিজের ভিতরে ধারণা পরিষ্কার করে' নিয়ে তবে আমি লেখায় হাত দিতাম। এতে আমার দেখাবার ছিল, চরিত্র ও বুদ্ধিবলের সহায়তায় প্রতিভা মানব-সমাজের উপরে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আর এই প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় তার লাভই বা কি হয়, ক্ষতিই বা কি হয়।

এই নাটকের জন্য অনেকগুলো গান তিনি রচনা করেন, কিন্তু একটি ভিন্ন সবই হারিয়ে যায়। যেটি আছে সেটির নাম মোহম্মদের গান—Mahomet's Gesang—সাফল্যের চরম শিখরে সমাসীন প্রভুর উদ্দেশ্যে আলির এই গান:

চেয়ে দেখ ওই পার্বত্য ঝরণা,
আনন্দিত ও নির্ম্মল
—তারার মতো ঝিকিমিকি;
মেঘের দেশে
তুঙ্গ শৃঙ্গে
নিকুঞ্জের কোলে
লালিত হয়েছে সে দেবতাদের হাতে।
উচ্ছল তারুণ্য তার—
নেচে নেচে নামছে সে
মেঘের দেশ থেকে
মর্ম্মর-সোপানের 'পরে।

তার হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়
আকাশের পানে।

পাহাড়ের পথে পথে
খোঁজে সে রঙীন নুড়ি,
আনন্দে পথ দেখায়
যত ঝরণা সাথীদেরে,
সঙ্গে নেয় সবাইকে।
নিয়ে উপত্যকার দেশে
তার যাত্রার পথে পথে ফোটে ফুল,
প্রান্তর জীবন পায় তার প্রশ্বাসে।
কিন্তু বাঁধবে তাকে কোন্ আঁধার-ছাওয়া উপত্যকা!
কোন্ ফুল! তাদের স্নেহাতুর আঁখি
তার মুখে ফোটায় আনন্দের হাসি।
নামলো সে মাঠের 'পরে
সাপের মতো আঁকা-বাঁকা তার গতি।

এগিয়ে আসে কুলুকুলু ঝরণা
তার সঙ্গী হতে।
এগিয়ে চললো সে
প্রান্তরের বুকে ঢেউ খেলিয়ে,
প্রান্তর হলো উজ্জ্বল।
প্রান্তরের যত নদী
পাহাড়ের যত কুলুকুলু ঝরণা
ডাকলো তাকে ভাই বলে:
"ভাই গো, তোমার সব ভাইকে
নিয়ে চল পিতার কাছে—
পিতা আমাদের মহাসমুদ্র
বাহু বিস্তার করে'
আছে আমাদের প্রতীক্ষায়,
প্রতীক্ষমান সন্তানদের আলিঙ্গন করতে,—
কতকাল ধরে' প্রসারিত রয়েছে সেই বাহু!

মরু-বালুকায় হারিয়েছি আমরা পথ,
বিশীর্ণ হচ্ছি সূর্যের শোষণে,
পাহাড় আমাদের বন্দী করে' রেখেছে হ্রদ ;
ভাই গো, প্রান্তরের যত ভাই
পাহাড়ের যত ভাই
সবাইকে নিয়ে যাও পিতার কাছে।"

আয় তোরা সবাই আয়—
ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে সে মহিমায়,
তার সব আপনার জন নিয়েছে তাকে মাথায় তুলে।
তার জয়যাত্রার পথে
নাম দিচ্ছে সে
নব নব দেশকে ; নব নব নগরী
উচ্ছ্রিত হচ্ছে তার চরণাঘাতে।
বাধাবন্ধহীন ছুটেছে সে সামনে
পেছনে ফেলে যাচ্ছে কত উজ্জ্বলিত পুরী,
কত উচ্চচূড় প্রাসাদ—
তারই শক্তির সৃষ্টি।

আটলাস-দৈত্য যেন বয়ে নিয়ে চলেছে
তার বিরাট গৃহ !
তার মাথার উপরে উড়ছে
লক্ষ লক্ষ পতাকা
তার মহিমার সাক্ষী।
চলেছে সে সবাইকে নিয়ে—
ভাই বোন প্রেয়সী সন্তান—
চলেছে পথ-চাওয়া পিতার সমীপে
বুকে তার উছলে উঠ্‌ছে আনন্দ। *

* খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মূল জার্মান থেকে এই কবিতার এক ইংরেজি অনুবাদ করেন, সেইটির সাহায্য আমি প্রথমে গ্রহণ করি। পরে এর প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদ পাই। এই সুযোগে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

লুইস বলেন :

> গ্যেটের সমস্ত অসার্থক পরিকল্পনার মধ্যে এইটির জন্য আমার সব চাইতে বেশী দুঃখ হয়। মহিমায়, গভীরতায়, মানবপ্রকৃতির রহস্যের সূক্ষ্ম চিত্রণের বিষয় হিসাবে, এই পরিকল্পনাটি ছিল তাঁর প্রতিভার বিশেষ অনুকূল।

এই কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতার মিল সহজেই চোখে পড়ে। তবে দুটিতে পার্থক্যও লক্ষ্য করার মতো : রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এঁকেছেন নির্ঝরের পাষাণ-প্রাকার থেকে মুক্তিলাভের ও প্রবাহিত হবার আনন্দ, আর গ্যেটে এঁকেছেন নির্ঝরের বিপুল পরিসর লাভের গৌরব।

কার্লাইলের হজরত মোহম্মদের মাহাত্ম্য উপলব্ধির মূলে বোধ হয় গ্যেটের এই 'মোহম্মদ' পরিকল্পনা আর 'মোহম্মদের গান'।

গ্যেটে এই বয়সেই যে সব মানসিক সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিলেন সে-সব থেকে উদ্ধার কোনো মানুষের বা কোনো অলৌকিক শক্তির সাহায্য পান নি, পেয়েছিলেন তাঁর অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্মের গুণে—তাঁর এই মনোভাব রূপ পেয়েছে তাঁর অসমাপ্ত "প্রমেথেউস" নাটকে। এর স্বগত-উক্তিটি পরমাশ্চর্য :

দেবরাজ, আবৃত কর তোমার স্বর্গলোক
মেঘের ধোঁয়া দিয়ে,
আর বালক যেমন বীরত্ব দেখায়
কুলগাছ* লণ্ডভণ্ড করে'
তেমনি আঘাত হেনে যাও
দেওদার আর পাহাড়ের মাথায় ;
আমার পৃথিবী কিন্তু তোমার অধিকারের বাইরে—
যে পৃথিবীর উপরে তৈরি হয়েছে আমার কুটীর,
তোমার দ্বারা নয় আমার দ্বারা।
সেই কুটীরের প্রসন্ন পাবক-শিখা
তোমার অন্তরে জাগায় ঈর্ষা।

হায় দেবসমাজ, ত্রিভুবনে কোথাও দেখিনি আমি
তোমাদের মতো কৃপার পাত্র ;
যত মহিমময় হও
তোমরা বেঁচে আছ
যজ্ঞ আর জপের প্রসাদে ;

---

* ইংরেজিতে আছে Thistles.

উপবাস হতো তোমাদের ভাগ্য
যদি বঞ্চনা করবার জন্য না জুটতো
আশাতাড়িত অপোগণ্ড আর ভিক্ষুকের দল।

যখন ছিলাম অসহায় শিশু,
জানতাম না কোথায় পাব আশ্রয়,
আঁখি আমার উত্থিত হয়েছে আকাশের পানে
সূর্যের পানে, যেন সেই উর্ধ্বদেশে কোনোখানে আছে
আমার কাতর প্রার্থনা শুনবার মতো কান,
—যেন আছে আমারই অন্তরের মতো অন্তর
ব্যথা যাতে বাজে পীড়িতের জন্য।

দেবতার দর্পের সামনে
কে আমাকে দিয়েছিল বল?
উদ্ধার করেছিল আমাকে মৃত্যু থেকে,
দাসত্ব থেকে?
সমস্তই কি তোমার কীর্তি নয়
হে আমার পূত প্রোজ্জ্বল হৃদয়?
অকুটিল তারুণ্যে
আজো তুমি গেয়ে চলেছ স্তব
উর্ধ্বের নিদ্রিত দেবতার প্রতি!

আমি শ্রদ্ধানত হব তোমার প্রতি; কেন?
ব্যথাতুর কি কোনোদিন পেয়েছে তার বুকে
তোমার হাতের স্পর্শ?
কোনোদিন কি মুছেছ তুমি
বেদনাদীর্ণের নয়নলোর?
আমার মনুষ্যত্ব কি গঠিত হয় নি
সর্বশক্তি কালের আঘাতে,
ভাগ্যের আঘাতে,
—যারা আমার প্রভু তোমারও প্রভু?

ভেবেছ তুমি
ঘৃণা করবো আমি জীবনকে
পালিয়ে যাব কাননে কান্তারে,

যেহেতু সব
স্বপ্নমঞ্জরি আমার
সার্থক হয়নি ফলভারে ?

এই দাঁড়িয়েছি আমি, তৈরি করে চলেছি মানুষকে
আমার মতো করে' ;
এই আমার মতো জাতি
দুঃখ পাবে, কাঁদবে,
আর জীবন উপভোগ করবে ;—
আর তোমাকে করবে উপেক্ষা
আমি যেমন করছি।

ব্রাণ্ডেস বলেন :

…অমরতা লাভের জন্য এমন একটি কবিতাই যথেষ্ট। গ্যোৎসের বিদ্রোহ এখানে হয়ে উঠেছে বিরাট……এর চাইতে বড় বিদ্রোহের কবিতা আর লেখা হয়নি…প্রত্যেকটি চরণ যেন আগুনের অক্ষরের ধারা— মানবতার নিশীথ গগনে। এর সঙ্গে তুলিত হতে পারে এমন খুব কম কবিতাই জগতে লেখা হয়েছে।

কৌতুহলী পাঠক এস্কীলুস-এর Prometheus Bound-এর সঙ্গে এই কবিতাটি মিলিয়ে পড়তে পারেন। দুইয়েরই বিদ্রোহ অসাধারণ; শেলীর Prometheus Unbound-এর বিদ্রোহও উচ্চাঙ্গের ; তবে এ-সবের তুলনায় যথেষ্ট ভব্য।

এই কবিতা নিয়ে সাহিত্যরথী লেসিঙ্ ও তাঁর বিপক্ষদলের মধ্যে একটি বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। এই কবিতার ভিতরকার কথা যা তাঁরও মনোভাব তাই লেসিঙ্ এই অভিমত প্রকাশ করলে তাঁর বিপক্ষদল তাঁকে নাস্তিক ও প্রকৃতিপূজক (অর্থাৎ অখৃষ্টান) বলে' প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হন। লেসিঙ্‌এর বন্ধু মোজেস মেন্‌ডেল্‌স্‌জোন তাঁর পক্ষ সমর্থন করে' লিখতে গিয়ে এমন চিত্ত-বিক্ষোভ অনুভব করেন যে তাতেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়। জার্মানীর বিপ্লবপন্থী তরুণদের সংহিতা-রূপে এটি ব্যবহৃত হতে পারে আশঙ্কা করে' বৃদ্ধবয়সে গ্যেটে এর প্রচার রহিত করেছিলেন।

তাঁর এই যুগের আর একটি কবিতা গানিমেডে (Ganymede)। তাতে সহজ ভক্তিমাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। সাকী গানিমেডে দেবরাজের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাচ্ছেন :

প্রভাতের আলোক-চাঞ্চল্যে
তুমি দীপ্তি পাও আমার চারিদিকে

ওগো বসন্ত, ওগো প্রিয়তম !
অসীম প্রেমবিহ্বলতায়
স্পন্দিত হয় আমার চিত্ত
তোমার চিরজাগ্রত প্রেমের
দিব্য পরশনে ।
অমৃতময় সৌন্দর্য !
তোমাকে যদি ধারণ করতে পারতাম
এই বাহুর বন্ধনে ।

হায় আছি তোমার বুকে,
তবু মরি দুঃখে,
তোমারই পুষ্প তোমারই তৃণ
স্পর্শ করে আমার বুক ।
শান্ত কর তুমি
আমার বুকের জ্বালা
ওগো অনুপম প্রভাত সমীর !
মধুকণ্ঠ বুলবুল
ডাকে আমাকে নিবিড় বনানী থেকে ।
যাচ্ছি ! ওগো আমি যাচ্ছি !

কোথায় ? হায় ! কোথায় ?
উপরের দিকে !
মেঘ ভাসে আকাশে
আসে নেমে, শাদা মেঘ
আসে নেমে প্রেমের মিনতিতে ।
আমার কাছে ! আমার কাছে !
তোমার কোলে লও তুলে
উর্ধ্বে
—আলিঙ্গিত ও আলিঙ্গ্যমান—
উর্ধ্বে তোমার বুকে,
অনন্তপ্রেমময় পিতা !

প্রমেথেউসের অবন্ধন আর গানিমেডের প্রেমবন্ধন একই সঙ্গে গ্যেটে-চিত্তের পরিচয়-চিহ্ন।—ব্রাণ্ডেস বলেন, এই সময়ে স্পিনোজা-দর্শনের সঙ্গে গ্যেটের পরিচয় হয়; স্পিনোজার যে বাণী: ভগবান ও তাঁর সৃষ্টি অভিন্ন যেমন দেহ ও আত্মা অভিন্ন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই বিশ্বভগবানের প্রকাশ—এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে প্রমেথেউস ও গানিমেডে দুই কবিতায়ই। প্রমেথেউস অস্বীকার করেছে সেই ঈশ্বরকে মানুষের ধারণায় যিনি সর্বশক্তিমান কিন্তু দায়িত্বহীন, মানুষ তাঁর সামনে চিরকাল কাঁপছে যেমন অত্যাচারী প্রভুর সামনে কাঁপে দাস; সেই অত্যাচারীর প্রভুত্ব অস্বীকার করে' প্রমেথেউস নিজেকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে তার নিজের সৃষ্টিধর্মের উপরে। গানিমেডে কবিতায় সেই ঈশ্বরকে দেখা হয়েছে চিরবসন্ত রূপে, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম রূপে—মানুষের সৃষ্টিধর্মের সঙ্গে যার অঙ্গাঙ্গী যোগ।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে গ্যেটে ভেৎস্লারে ফিরে যান—পিতা তাঁকে পাঠান আইন-ব্যবসায় শুরু করতে। শার্লোটকে তিনি ভুলতে পারেন নি। এর পর বৎসর ভের্টর রচনা আরম্ভ হয়। ভের্টরের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে গ্যেটের ভেৎস্লার-বাসের সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে। গ্যেটের মতো ভের্টরও বসন্তকালে এক মফঃস্বল শহরে বাস করতে যায়; শহরটি তার পছন্দ হয় না; কিন্তু শহরের বাইরেই গ্রাম, সেখানে গাছে গাছে ফুল ফুটে অপূর্ব শোভা বিস্তার করেছে, সেই শোভা ও সৌগন্ধ্যের রাজ্যে মন তার ভ্রমরের মতো মত্ত হয়ে ওঠে। ওসিয়ান ও হোমর পাঠ করে', ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ও অশিক্ষিত সরল লোকদের সঙ্গে গল্প করে' আর ছবি এঁকে তার অধিকাংশ সময় কাটে। এমন সময় গ্যেটের মতোই এক গ্রাম্য নাচের মজলিসে শার্লোটের (ভের্টরের নায়িকা) সঙ্গে তার দেখা হয়, দেখা হবামাত্রই সে মুগ্ধ হয়। সেই দিনই সে জানতে পারে (গ্যেটে প্রথম দর্শনের কিছুকাল পরে জানতে পেরেছিলেন) যে সে আল্‌বার্টের বাগ্‌দত্তা। (ভের্টরের প্রথম ভাগে কেস্‌টনরের চরিত্রই আলবার্টে ফুটেছে।) অল্প কিছুকাল পরেই ভের্টর বুঝতে পারলে তার এই প্রেমের সম্বন্ধ অসহ্য, আর গ্যেটের মতোই সে নিজের মনের উপরে জবরদস্তি করে' এই স্থান ত্যাগ করে। চলে যাবার পূর্বে গ্যেটের মতোই সে আলবার্ট ও শার্লোটের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ জীবনে কি করতে হবে।

ভের্টরের পরিণতির কথা অবশ্য গ্যেটে প্রথম থেকেই ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিককার ভের্টর আশ্চর্য প্রাণপূর্ণ; প্রকৃতির সঙ্গে তার যোগ নিবিড়, প্রকৃতির বর্ণনা দেখার চেষ্টা তার নয় সে করে প্রকৃতিকে অনুভব:



২৩ বৎসর বয়সে

……যখন আমার চারপাশের সুন্দর উপত্যকা থেকে ওঠে কুয়াশা, অদূরে বনানীর সূচিভেদ্য অন্ধকারের মাথার উপরে কিরণ দেয় মধ্যাহ্ন সূর্য, সেই ঘন বনের অন্তস্তলে প্রবেশ-পথ পায় মাত্র দু'একটি রশ্মি; যখন কলনাদিনী নির্ঝরিণীর কূলে দীর্ঘ ঘাসের মধ্যে গ্রহণ করি আমার শয্যা, নীচে সমতল-ক্ষেত্র পর্যন্ত দেখা যায় বিচিত্র শ্রেণীর ছোট ঘাস, বুকের পাশে অনুভব করি ঘাসের ডগা থেকে লক্ষ লক্ষ কীটাণু পর্যন্ত বিচিত্র প্রাণকণিকার ভিড়, অনুভব করি সর্বশক্তিমানের প্রকাশ নিজের রূপেই যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অনুভব করি অনন্তপ্রেমময়কে যিনি আমাদের ধারণ করে' আছেন, তুলে ধরেছেন অনন্ত আলোকের মাঝে; যখন…সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্টি আমার হারিয়ে যায় আর চারপাশের জগৎ আর আমার মনের স্বর্গ ধারণ করে প্রিয়া-মূর্তি—তখন সাধ যায়—যদি প্রকাশ করে' বলতে পারতাম, যদি সহজভাবে কাগজের উপরে ফুটে উঠতো যা নিবিড়ভাবে অনুভব করছি, যার দ্বারা পূর্ণ আমার হৃদয় মন—তা'হলে সৃষ্টি হতো আমার অন্তরাত্মার দর্পণ, আমার অন্তরাত্মা যেমন দর্পণ অনন্তস্বরূপের, আমার বন্ধুর! কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা ডেকে আনছি ধ্বংস; যা-কিছু চোখ ভরে' দেখছি তার মহিমার সামনে নিজেকে দিচ্ছি বিলিয়ে।

এই প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে মৃত্যু-বীজ লুকিয়ে আছে অতিরিক্ত ভাবালুতায়।

ভের্টরের পরিণতি-চিন্তায় কবি সাহায্য পেয়েছিলেন একটি বিশেষ ঘটনা থেকেও, সেই ঘটনাটি হচ্ছে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষে, অর্থাৎ তাঁর ভেৎস্লার ত্যাগ করে' আসার মাসদেড়েক পরে, যেরুসালেমের (Jerusalem) আত্মহত্যা। এই যেরুসালেম ছিলেন সেই দিনের একজন প্রখরবুদ্ধি ও হৃদয়বান্ যুবক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু লেসিঙ্ তাঁর রচনাবলী 'দার্শনিক নিবন্ধাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। গ্যেটে লাইপ্‌ৎসিগে থাকতেই যেরুসালেমকে জানতেন; তিনি যখন ভেৎস্লারে তখন যেরুসালেম ছিলেন সেখানকার একজন রাজদূতের সেক্রেটারী। চাকরিতে তিনি আরাম পাচ্ছিলেন না, এর উপর এক বন্ধুপত্নীর প্রতি তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল হয়। অন্তরে এম্‌নিভাবে নিপীড়িত হয়ে লোকজনের সংসর্গ ত্যাগ করে' তিনি জ্যোৎস্নারাত্রে একা একা পথে পথে ঘুরতেন। এম্‌নিভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক রাত্রে তিনি এক জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন ও সারারাত্রি ঘোরেন। তাঁর মনের কথা কোনো বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করতেন না, কেবল সেই দিনের হাহুতাশপূর্ণ নভেল পড়ে' কিছু শান্তি লাভ করতে চেষ্টা করতেন। যে-বন্ধুপত্নীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন তাঁকে যে তিনি তাঁর মনের ভাব জানান নি তা নয়। কিন্তু সেখানে কোনো সান্ত্বনা না পেয়ে অধিকন্তু প্রত্যাখ্যান ও

বিরক্তি পেয়ে এক বন্ধুর (কেস্‌ট্‌নর-এর) কাছ থেকে পিস্তল জোগাড় করে' আত্মহত্যা করেন।

কিন্তু ভের্টরের প্রথম অংশ লিখে তিনি ফেলে রাখেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর নিজের জীবনে একটি ঘটনা ঘটে, সেইটি তাঁকে বইখানি সম্পূর্ণ করবার তাগিদ দেয়। ঘটনাটি এই : শ্রীমতী ফন লারোশের কন্যা মাক্‌সিমিলিয়ানা-র সঙ্গে গ্যেটের কিছু ভাব হয় আমরা দেখেছি ; ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ব্রেন্‌তানো নামক এক বিপত্নীক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিবাহিতা হয়ে তিনি ফ্রাঙ্কফোর্টে আসেন। সত্বরই কবির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। মাক্‌সিমিলিয়ানাকে কয়েকটি সপত্নীপুত্রের লালনভার গ্রহণ করতে হয়েছিল ; তাঁর চাইতে বয়সে অনেক বড় স্বামীর সঙ্গে তাঁর মনের মিলও তেমন হচ্ছিল না ; এই অবস্থায় তাঁর পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে' তিনি মনের ফাঁপর মেটাতেন। কিন্তু ব্রেন্‌তানো কেস্‌ট্‌নরের মতো উদারহৃদয় ছিলেন না, তাই আমাদের কবির সঙ্গে এঁর মনোমালিন্য হতে দেরী হলো না। এই সময়ে গ্যেটে শ্রীমতী ফন লারোশকে এই চিঠিখানি লেখেন :

> ওদের গৃহ ত্যাগ করে' আসার আগে আমার মনে কি অবস্থা গেছে তা যদি জানতেন না, তা'হলে ওখানে আবার যেতে আমাকে বলতেন না।

এই মানসিক উদ্বেগের সময়ে চার সপ্তাহে তিনি ভের্টর লিখে শেষ করেন। বইখানির দ্বিতীয় অংশে ভের্টরকে দেখতে পাওয়া যায় এক নূতন পরিবেষ্টনে। তার রুচির বিরুদ্ধে সে এক ছোট জার্মান রাজসভায় রাজদূতের সেক্রেটারীর কাজ নিয়েছে। কোনো কাজে তার বিন্দুমাত্র আসক্তি বা পারদর্শিতা নেই, কেবল ভাববিহ্বলতায় তার সময় কাটে। এই ভাববিহ্বলতাই যে তার প্রধান ব্যাধি সে-বিষয়ে সে নিজেও মাঝে মাঝে সচেতন হয়। সে বলছে :

> আমার অর্ধেক শক্তি নিয়ে অন্যেরা সুখে ও গৌরবে জীবন অতিবাহিত করছে, আমার কি কেবল নৈরাশ্যেই কাটবে? হায় ভগবান, আমার অর্ধেক শক্তি রেখে কেন আমাকে দিলে না আত্মবিশ্বাস ও সন্তোষ!

এখানে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, সে চাকরি ছেড়ে দিলে। কিছুদিন এক রাজকুমারের সঙ্গে তার কাটলো, শেষে তাঁর সঙ্গও আর ভাল লাগলো না। তার পূর্বপ্রেমের পরিবেষ্টনে আবার সে ফিরে এল। কিন্তু এখন আলবার্ট ও শার্লোটের বিবাহ' হয়েছে—আলবার্টকে স্বামিত্বের সমস্ত সুখের অধিকারী দেখে' ভের্টর তার হৃদয়-বেদনায় কেবলই মুহ্যমান হয়ে চললো। এই অবস্থায় ওসিয়ান তার অবলম্বন হলো। এমনিভাবে ব্যর্থতায় ও হৃদয়ের জ্বালায় দগ্ধ হতে হতে শেষে তার মনে পড়লো জীবনে কোনো ব্যাপারেই সে ত' কিছুমাত্র সার্থকতা লাভ করতে পারে নি—তার এই

ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের অবসান হওয়াই ভাল। আত্মহত্যা সম্পর্কে তার বিখ্যাত উক্তি এই :

> মানুষের ক্ষমতা পরিমিত : পরিমিত সুখ অথবা দুঃখ সে সহ্য করতে পারে, তার বেশী হ'লে হয় তার অসহ্য। নৈতিক সবলতা অথবা দুর্বলতার কথা নয়, কথা হচ্ছে দুঃখ কতটা সওয়া যায় ; আমি মনে করি কেউ আত্মহত্যা করলো বলে' তাকে কাপুরুষ বলা তেম্নি অদ্ভুত যেমন অদ্ভুত কেউ জ্বরে মরলে তাকে কাপুরুষ বলা।

এই অবস্থায়ও তার কথা মাঝে মাঝে একান্তকবিত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক জায়গায় সে বলছে :

> আমার এই জীবন যদি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায় তবে সেইটিই হবে বেশী ভাল, তাহলে ঝড় হয়ে আমি আকাশ ছিন্নভিন্ন করবো, সমুদ্রের জলে তরঙ্গ তুলবো।

অবশেষে আলবার্টের কাছ থেকে পিস্তল জোগাড় করে' সে আত্মহত্যা করে। তার শেষ উক্তি এই :

> প্রকৃতি, তোমার সন্তান, তোমার বন্ধু, তোমার প্রেমিক, তোমার নৈকট্য লাভ করছে—অনন্ত পরিণতির নিকটবর্তী হচ্ছে।

ভের্টর প্রকাশিত হবা মাত্র সাহিত্য-জগতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সমস্ত শ্রেণীর লোকের চিত্ত এর দিকে আকৃষ্ট হলো। নেপোলিয়ন জীবনে বহুবার এই বইখানি পড়েছিলেন। সুদূর চীন-সাম্রাজ্যে শার্লোট ও ভের্টরের প্রতিমূর্তি চিনামাটির বাসনে অঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু এর একটি বিশেষ ফল ফলতে আরম্ভ করলো—ভের্টরের বেশবিন্যাস পদ্ধতি সবার অনুকরণীয় হলো, আত্মহত্যাও যুবকযুবতীদের মধ্যে সংক্রামক ভাবে দেখা দিল। ফলে জার্মানীর কয়েক জায়গায়, মিলান শহরে ও ডেনমার্কে এর প্রচার আইনের দ্বারা রহিত করা হলো।

ব্রাণ্ডেস বলেন :

> ভের্টরের প্রেমোন্মাদ ও ব্যর্থতার কাহিনী ব্যক্তি-বিশেষের দুর্ভাগ্যের কাহিনী মাত্র নয়। ব্যক্তি-বিশেষের কথা এতে এমন ভাবে বলা হয়েছিল যে এক বিশেষ যুগের আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্দাহ এতে রূপলাভ করেছিল।

লুইস বলেন :

> এই বইখানি আজকাল আর পাঠকদের তেমন প্রিয় নয়, এর ইংরেজি

---

† 'ভাইমার' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুবাদটি সুন্দর হয়নি, কিন্তু মূলে এটি পরম উপভোগ্য। এতে অসাধারণ লিপিচাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে, সমগ্র জার্মান সাহিত্যে এমন সরস প্রকৃতি-বর্ণনা, এমন পূর্ণ জীবন-বোধ, এমন অনায়াস রচনাভঙ্গি কদাচিৎ চোখে পড়ে।

গ্যেটে বলেছেন:

ভের্টর এমন একটি সৃষ্টি যাকে আমি লালন করেছিলাম ডাহুকীর মতো আপন হৃদয়-রক্ত দিয়ে। আমার গভীর অভিজ্ঞতার ও চিন্তার এমন অনেক কিছু ওতে আছে যা দিয়ে এমন দশখণ্ডে-সমাপ্ত গ্রন্থ রচিত হতে পারতো। প্রকাশের পরে আজ পর্যন্ত মাত্র একবার আমি ও বই পড়েছি, আর পড়তে সাহস করিনি। ওতে ক্রমাগত চলেছে আতসবাজি। ও বই দেখলে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি, যে মানসিক অবস্থা থেকে ওর উদ্‌ভব হয়েছিল তার পুনরাক্রমণ ভয়ের চক্ষে দেখি।

কিন্তু গ্যেটে-চরিত্র ও ভের্টর চরিত্র যে এক নয় সে-সম্বন্ধে সমালোচকরা একমত। ক্রোচে এটিকে বলেছেন এক মানসিক ব্যাধির সুলিখিত কাহিনী—সেই ব্যাধির প্রতি কবি নিক্ষেপ করেছেন করুণার দৃষ্টি। ক্রোচের মতে ভের্টর এক অজটিল উৎকৃষ্ট কাব্য কেননা একই সঙ্গে এতে প্রকাশ পেয়েছে অনুভূতির তীব্রতা ও বোধের তীক্ষ্ণতা—উদ্দাম হৃদয়াবেগ ও সে-সম্বন্ধে অনাবিল চেতনা।

ভের্টরের দুঃখ যে এক উচ্চাঙ্গের প্রেম-কাহিনী নয়, বরং এক মানসিক ব্যাধির সুলিখিত কাহিনী তা মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রেম-তন্ময়তাও মাঝে মাঝে এতে যে-ভাষা লাভ করেছে, দীপ্তির তীব্রতায় তা পরমাশ্চর্য। সেই দিনের অনেকে—দিগ্‌বিজয়ী নেপোলিয়নও—একে এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী হিসাবেই গণ্য করেছিলেন।

সমালোচকদের হাতে ভের্টর

ভের্টর পত্রোপন্যাসখানি দেশ-বিদেশের পাঠকদের কাছে যে অসাধারণ সমাদর লাভ করেছিল তার বড় কারণ ছিল সেই যুগের নরনারীর মানসিক অবস্থা—এ সম্বন্ধে প্রায় সবাই একমত। কিন্তু তাচ্ছিল্য ও উপহাসও যে এর লাভ হয়নি তা নয়। মনীষা ও সবলতার প্রতীক লেসিঙ্‌ মত প্রকাশ করেছিলেন: একজন গ্রীক বা রোমক যুবকের পক্ষে এই কারণে ও এইভাবে আত্মহত্যা অসম্ভব ছিল, এমন মৌলিকতা ভাব-বিলাসী খৃষ্টান সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভবপর।— লুইস এ মন্তব্যে আপত্তি করেছেন। তাঁর যুক্তি, এমন আত্মহত্যার রীতি গ্রীক ও রোমক জগতেও অপ্রচলিত ছিল না। তবু লেসিঙ্‌এর মন্তব্যটি অর্থপূর্ণ। সেই বিষম ভাবালুতার যুগে স্থিতধী ব্যক্তিও যে ছিলেন, এ তার এক বড় প্রমাণ।

ভের্টরের একটি কৌতুকাবহ সমালোচনাও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বার্লিনের পুস্তকবিক্রেতা ও গ্রন্থকার ক্রিস্টোফার ফ্রীডরিখ নিকোলাই সেই দিনে জার্মানীতে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকীর্ণ যুক্তিবাদের তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া সমর্থক। সমালোচকরা বলেন, তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু মতের অনুদারতা ও অনুভূতির স্থূলতার জন্য ধর্মের মরমী সাধনা কিংবা কাব্যানন্দ তেমন উপভোগ করতে পারতেন না। 'তরুণ ভের্টরের দুঃখে'র জবাবে তিনি লেখেন 'তরুণ ভের্টরের আনন্দ'; তাতে ভের্টর আত্মহত্যার চেষ্টা করে পিস্তলে বাচ্চামুর্গীর রক্ত ভরে' ও নায়িকা শার্লোটকে বিবাহ করে' অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটিয়ে দেয়।

এই বিদ্রূপ গোটে উপভোগ করেছিলেন, বিশেষ করে' নিকোলাই-এর বইখানির প্রচ্ছদপটে আঁকা ছবিটি। কিন্তু এক ব্যঙ্গকবিতা লিখে এর জবাবও তিনি দেন। লুইস বলেছেন, কবিতাটিতে রসিকতা তেমন জমেনি, খুব অমার্জিতও হয়েছে। এক আত্মম্ভরী ধর্মধ্বজীর বিরুদ্ধ-সমালোচনার উত্তরে কবি লেখেন:

আত্মম্ভরী সেই জন সে আমারে বলে ভয়ঙ্কর।
সাঁতারে যোগ্যতা নেই জল-নিন্দা তার রুচিকর॥
যাজক-শাসিত সেই বার্লিন-সমাজে কহি ডাকি'।
মোর কথা যে না বোঝে শেখা তার আরো কিছু বাকি॥

ক্লাভিগো

ভের্টরের অল্পকাল পরেই ক্লাভিগো নাটক রচিত হয়। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে গোটে আত্মচরিতে বলেছেন:—তাঁর সহোদরা কর্ণেলিয়ার যত্নে তাঁদের যে একটি তরুণ-তরুণী-সমাজ গড়ে উঠেছিল কর্ণেলিয়ার বিবাহের পরেও তা ভাঙ্‌লো না। এঁরা সবাই পরস্পরের সাহচর্য খুব কামনা করতেন এবং সপ্তাহে একবার বনভোজনে কিংবা প্রীতি-সম্মেলনে মিলিত হতেন। এঁদের দলের এক খেয়ালী কিন্তু অভিজ্ঞতাশালী তরুণ একবার প্রস্তাব করলেন,—প্রেমিক ও প্রেমিকা পরস্পরের প্রতি কেমন আচরণ করবেন তা তাঁরা সবাই জানেন; কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী সমাজে পরস্পরের সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন তা তাঁরা জানেন না বল্লেই চলে। সেই জন্য প্রতি সপ্তাহে চিঠি খেলে ঠিক করা হবে সেই সপ্তাহের জন্য কে কার 'স্বামী' বা 'স্ত্রী' হবেন, এই সব 'দম্পতি' পরস্পরের সান্নিধ্য সহজভাবে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবেন, পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা খুব কম বলবেন, আদর-আপ্যায়ন ত নয়ই, এই সংযম ও ভব্যতা যেমন তাঁরা আয়ত্ত করবেন তেম্‌নি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবেন সন্দেহ ও মনোমালিন্য। এই ভাবে প্রেমিক-প্রেমিকার পদ্ধতি অনুসরণ না করে' যে 'স্বামী' তাঁর 'স্ত্রী'র অনুরাগ-

ভাজন হ'তে পারবেন তাঁকেই সফলকাম বলা হবে। এইরূপ বর-বধূ খেলায় এক তরুণী পরপর তিনবার গ্যেটের বধূরূপে নির্ধারিত হন। তখন সাব্যস্ত হয় যে তাঁদের দুইজনকে নিয়ে আর চিঠি খেলা হবে না, ভাগ্য তাঁদের বর-বধূ বলে' স্বীকার করেছেন। এই সব সম্মেলনে কেউ কিছু পাঠ করে' আর সবাইকে শোনাতেন। এক সন্ধ্যায় গ্যেটে ফরাসী নাট্যকার বোমার্শে-র (Beaumarchais) সদ্যপ্রকাশিত জীবন-স্মৃতি সবাইকে পড়ে শোনান। কথায় কথায় তাঁর 'বধূ' বল্লেন: আমি যদি তোমার বধূ না হয়ে অধিস্বামিনী (Liegelady) হতাম তাহলে তোমাকে আদেশ করতাম এই আখ্যায়িকা নিয়ে নাটক রচনা করতে, এ নাটকেরই যোগ্য। গ্যেটে উত্তর করলেন: প্রিয়ে, তুমি দেখবে অধিস্বামিনী ও বধূ এক। আসছে সপ্তাহে এই বারে এই বিষয়েই একটি নাটক আমি পড়ে শোনাব।—আগেই গ্যেটের মনে হয়েছিল আখ্যায়িকাটিকে সহজেই নাটক-রূপ দেওয়া যাবে। কিন্তু এমন তাগিদ না পেলে তাঁর অন্যান্য বহু পরিকল্পনার মতো এটিও হয়ত অলিখিতই থেকে যেতো।

ক্লাভিগো পঞ্চাঙ্ক নাটক। এর প্রথম চার অঙ্ক যেন বোমার্শের কাহিনী নাটকের মতো করে' সাজানো। শেষ অঙ্কটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লেখা।—প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ক্লাভিগো তার বন্ধু কার্লোস-এর সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে আলোচনায় রত। ক্লাভিগো উদীয়মান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, অবিকশিত প্রতিভার তাড়নায় চঞ্চল; বোমার্শের ভগিনী মারিয়া তার বাগ্‌দত্তা। কিন্তু মারিয়া রুগ্‌ণা, দীপ্তিহীন, তাকে বিয়ে করা ক্লাভিগোর মতো উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ-সম্পন্ন যুবকের পক্ষে অন্যায়, এই তার বন্ধু কার্লোসের মত। সে বলছে:

> বিয়ে করা! জীবন যখন প্রথম কিছু-হয়ে-ওঠার পথে দাঁড়িয়েছে তখন বিয়ে করা! সাংসারিকতার গতানুগতিকতায় নিজেকে সঁপে দেওয়া! জীবনকে বন্দী করা যখন দেখাশোনার অর্ধেকও হয়নি! যখন বিজয়-গৌরব অর্ধেকও লাভ হয়নি!

প্রতিভা সাধারণ দায়িত্ববোধের অতীত, এও কার্লোসের মত। প্রখরবুদ্ধি কার্লোসের হাতে চঞ্চলমতি ক্লাভিগো যেন নরম কাদা। সে ঠিক করলে মারিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করবে। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে বোমার্শের পরিজন ক্লাভিগোর কৃতঘ্নতা ও ঘৃণিত আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করছে; ক্ষয়রোগগ্রস্তা মারিয়া কিন্তু তার প্রেমাস্পদকে ভুলতে পারছে না। শেষের দিকে বোমার্শের প্রবেশ ও অকারণে যদি ক্লাভিগো এমন ঘৃণিত আচরণ করে তবে তার প্রতিফল দানের সংকল্প গ্রহণ। দ্বিতীয় অঙ্কে একটি মাত্র দৃশ্য, তাতে বোমার্শে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ক্লাভিগোর কাছ থেকে তার ঘৃণিত আচরণের এক স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নিচ্ছে, সেটি লিখে দিয়ে দোলায়িতচিত্ত ক্লাভিগো তার প্রেমপাত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা প্রকাশ করছে; সে মারিয়ার

সঙ্গে পুনর্মিলনের আগ্রহ জানালে, বোমার্শে তাতে স্বীকৃত হলো। তৃতীয় অঙ্কে মারিয়া ও ক্লাভিগো-র পুনর্মিলন ঘটেছে; তাদের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে; বোমার্শে ক্লাভিগোর সেই স্বীকার-উক্তি নষ্ট করে ফেললে। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কার্লোস ক্লাভিগোকে ভাল করে' বুঝিয়ে দিচ্ছে এমন অবাঞ্ছিত পরিণয়ের শোচনীয় পরিণামের কথা, ক্লাভিগোকে সে কৌশলে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে একথাও বলছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ক্লাভিগোর নূতন বিশ্বাসঘাতকতায় বোমার্শের পরিজন মুহ্যমান হয়েছে, বোমার্শে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করছে, মারিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। পঞ্চম অঙ্কে মারিয়ার শব সমাধিক্ষেত্রে নীত হয়েছে, তখন পথ ভুলে ক্লাভিগো সেখানে উপস্থিত—সে তার বন্ধু কার্লোসের সন্ধানে বেরিয়েছিল। বোমার্শের হাতে ক্লাভিগো নিহত হলো। এক গভীর শোক ও অনুশোচনায় নাটকের পরিসমাপ্তি হলো।—মূল কাহিনীতে বোমার্শে ক্লাভিগোর বিশ্বাসঘাতকতায় ও ষড়যন্ত্রে কুপিত হয়ে রাজমন্ত্রী ও রাজার সাহায্যে তার পদচ্যুতি ঘটায়। লুইস বলেন, এই ক্লাভিগো বা ক্লাভিজো কালে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়েছিলেন; গ্যেটের নাটকের সাহায্যে তাঁর কলঙ্ক জার্মানীর রঙ্গমঞ্চে মূর্তি ধরে' ফিরছে এ হয়ত তিনি জানতেন, কিন্তু গ্যেটে জানতেন না।

ক্লাভিগো পড়ে' মের্ক গ্যেটেকে লিখলেন: এমন বাজে লেখা আর লিখো না, এসব লিখবার জন্য ঢের লোক আছে।—নাটকখানি সম্বন্ধে সমালোচকদের মোট বক্তব্য এই। এর কোনো চরিত্রই তেমন উৎকর্ষ লাভ করেনি, যদিও মাঝে মাঝে কাব্য-সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। তা'ছাড়া পরিণতিটি যেন জুড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘটনা-প্রবাহে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠেনি।—তবে আজ পর্যন্ত এটি না কি জনপ্রিয়। আত্মচরিতে গ্যেটে বলেছেন, মের্কের কথা না শুনে তিনি যদি ক্লাভিগোর মতো আরো কতকগুলো নাটক রচনা করতেন তবে ভালই করতেন, তাঁর যুক্তি—জনসাধারণ যা ভাল বোঝে তা যে সব সময়ে লঙ্ঘন করতে হবে তা নয়, বরং অনেক কাজ সেই চিন্তাধারার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা সঙ্গত।

ক্লাভিগোতে কিন্তু গ্যেটের মনোবিকাশের পরিচয় রয়েছে।- গ্যোৎস্ নাটকের কয়েকটি চরিত্রের ছায়া এর উপরে পড়েছে। তবু এতেই যেন তরুণ গ্যেটে তাঁর নিজের চলচ্চিত্ততা আর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি রূপায়িত করে' দেখেছেন। একাধারে তিনি ক্লাভিগো ও কার্লোস। এই শেষোক্ত চরিত্র সম্পর্কে লুইস বলেন: নাটকে যেসব অমানুষ চরিত্র অঙ্কিত হয় তাদের কর্মের মূলে সাধারণত থাকে প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, অথবা এই ধরণের কোনো মনোভাব। কিন্তু কার্লোস-চরিত্রে ফুটেছে কাণ্ডজ্ঞান, চিন্তার পরিচ্ছন্নতার ছবি—সমস্ত রকমের ভাবাবেশের সে বিরোধী। ফাউস্টের মেফিস্টোফিলিসের পরিকল্পনার সূচনা যেন এখানে।

গ্যোৎস্‌-এ গ্রীক বা ফরাসী আদর্শের স্থান কাল ও ঘটনার একত্বের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা দেখানো হয়নি, কিন্তু ক্লাভিগো নাটকে সেসব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

মহাজন-সমাগম

এই তরুণ প্রতিভা সন্দর্শনে আগমন করেন তখনকার দিনের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁদের বর্ণনায় গ্যেটের পরমাশ্চর্য তারুণ্য অমর হয়ে আছে।

প্রথমে ফ্রাঙ্কফোর্টে আসেন লাফাটর (Lavater), তৎকালীন ইয়োরোপের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দুইখানি বই লিখে নবযৌবনেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন—খৃষ্টান মরমিয়া বলে' তাঁর সমাদর হয়। যখন গ্যেটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তখন তিনি মুখাবয়ব-বিদ্যা (Physiognomy) সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে মুখাবয়ববিদ্যা-বিশারদ রূপেই তিনি প্রসিদ্ধ হন। এই বিদ্যায় গ্যেটেও পারদর্শী ছিলেন,—তাঁর লোক-চরিত্র-জ্ঞান ও সজাগ দৃষ্টি এর অনুকূল ছিল। লাফাটর তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

এর এক বৎসর পূর্বে তাঁর সঙ্গে গ্যেটের পত্র-ব্যবহার আরম্ভ হয়, গ্যেটের রচনা পড়ে' তিনি চমৎকৃত হন। একবার গ্যেটের ছবি বলে' তাঁর এক বন্ধুর ছবি লাফাটরকে পাঠানো হলে তিনি বলতে পেরেছিলেন তা গ্যেটের ছবি নয়। কিন্তু গ্যেটেকে দেখে তিনি তেমন খুশী হন নি। তাতে গ্যেটে বলেছিলেন—তিনি যা তা যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত তখন লাফাটরেরও সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ না করে' উপায় কি। প্রথম দিনের আলাপ-পরিচয়ের শেষে লাফাটর মন্তব্য করেন: (গ্যেটে) আগাগোড়া চৈতন্য ও সত্য (All Spirit and truth).

লাফাটরের সঙ্গে গ্যেটের ধর্মবিষয়ে বহু আলাপ হয়। এক জায়গায় দুজনের একটি বড় মিল দেখা দিয়েছিল—দুজনেই ছিলেন আচার-নিয়মের দাসত্বের বিরোধী ও সহজ-অনুভূতির পক্ষপাতী। কুমারী ফন ক্লেটেনবের্গের সঙ্গে লাফাটরের ধর্মালাপ গ্যেটে শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন। প্রত্যয় ও জ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে মন্তব্য করেছেন: প্রত্যয়ে বা ভক্তিতে দেখবার দরকার নেই কাকে ভক্তি করা হচ্ছে, সেটি এক অপূর্ব নির্ভরতা, নিরাপত্তা-বোধ, এক সর্বশক্তিমান জ্ঞানাতীত শক্তিতে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসই শক্তি; কিন্তু জ্ঞানে যাচাই করতে চেষ্টা করা হয় কি বা কাকে বিশ্বাস করা হচ্ছে।—লাফাটর যখন ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে এর্ন্‌স্‌-এ যান গ্যেটে তাঁর সঙ্গী হন। পথে তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে আর স্পিনোজা সম্বন্ধে তাঁদের বেশীর ভাগ আলাপ হয়। ফ্রাঙ্কফোর্টের মতো এর্ন্‌স্‌-এও ভক্তের ভিড় জমলে গ্যেটে বাড়ী ফিরে আসেন।

লাফাটরের সঙ্গে সম্বন্ধে গ্যেটের স্বাতন্ত্র্য সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। লাফাটর গ্যেটের প্রতিভার প্রতি যতই শ্রদ্ধান্বিত হোন তাঁর স্বভাবের প্রেরণায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন গ্যেটেকে তাঁর ভাবের ভাবুক করতে, তাঁর ব্যাখ্যাত খৃষ্টীয় মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করাতে; তাঁর এক পত্রে আছে:

> গ্যেটে আমাকে দাদা বলে ডাকেন। আমি তাঁকে কি বলব—অপূর্ব? মানুষের মধ্যে তিনি অতুলনীয়, অত্যুচ্চ। কিন্তু ভাই, যীশুকে গ্রহণ করতে তোমার কী আপত্তি?

কিন্তু লাফাটরের প্রতি গ্যেটে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর মৌলিকতার জন্যে, মতের জন্যে তেমন নয়। এই সম্পর্কে তাঁর এই চিঠিখানি বিখ্যাত—লাফাটরের বন্ধু ফেনিঙ্গরকে (Phenninger) লেখা:

> ভ্রাতঃ, আপনি বিশ্বাস করুন এমন দিন আসবে যেদিন আমরা একে অন্যকে বুঝতে পারবো। আপনি আমার সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ করেন যেন প্রত্যয় আমাতে নেই, আমি শুধু বুঝে দেখতে চাই, সব আমার সামনে প্রমাণ করা হোক এই আমার ভাব—অনুভূতি যেন আমাতে বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু আসলে এসবের যা বিপরীত তাইই সত্য। "বুঝে দেখা," "প্রমাণ নেওয়া," এসব ব্যাপারে আমি কি আপনাদের চাইতে বেশী সমর্পণ-ধর্মী নই? অথবা আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যে আপনাদের ভাষায় কথা বলা আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা মাত্র। আমার বরং উচিত, বিশুদ্ধ ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বের সাহায্যে আমার অন্তরতম সত্তা আপনাদের সামনে অনাবৃত করে' এই কথা প্রমাণ করা যে আমিও মানুষ, আর সেই জন্য অন্যান্য মানুষের মতো অনুভূতি আমারও পক্ষে স্বাভাবিক, আমাদের মধ্যে যত বিরোধ সেসব কেবল শব্দের ব্যবহার নিয়ে; আমি যে ভাবে যা অনুভব করে' এসেছি, সেই ভাবে ভিন্ন অন্য ভাবে সেসব প্রকাশ করতে আমার যে অক্ষমতা, সেসব অনুভূতি আমি যে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করি, তা থেকে অনন্ত কলহের সৃষ্টি হয়েছে—এর সমাধান নেই। কিন্তু আপনি সব সময়ে আমার কাছে প্রমাণ দাবি করেন। কেন? আমি আছি এর কি কোনো প্রমাণের দরকার আছে? আমি অনুভব করি এর কি কোনো প্রমাণ চাই? আমি অমূল্য জ্ঞান করি, ভালবাসি, চাই, সেইসব প্রমাণ যার দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝি যে, যা আমাকে বল দান করেছে, সান্ত্বনা দান করেছে, তা শতসহস্র ব্যক্তি—অথবা একজনও—অনুভব করেছেন। এজন্য আমার কাছে মানুষের কথাই যেন ঈশ্বরের কথা—সে-কথা ধর্মযাজক অথবা বারবনিতা

যে-ই বিধি-বিধানের সাহায্যে প্রকাশ করুক অথবা কথায় কথায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিক। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে আমি আলিঙ্গন করি আমার সব ভাইকে—মোজেসকে, পয়গম্বরকে, তত্ত্বগ্রাহককে, বাণীপ্রচারককে, স্পিনোজাকে অথবা ম্যাকিয়াভেলিকে। কিন্তু প্রত্যেকের কাছে আমার নিবেদন: বন্ধু, আমার যে অবস্থা তোমারও তাই; বিশেষ বিশেষ ব্যাপার তুমি পরিষ্কার ভাবে বোঝো, তাতে শক্তিও প্রকাশ পায়, কিন্তু সমগ্রের ধারণা আমার পক্ষে যেমন সম্ভবপর নয় তোমার পক্ষেও তেমনি সম্ভবপর নয়।

লাফাটরের পরেই আসেন বাজেডভ্ (Basedow)—বিখ্যাত শিক্ষা-সংস্কারক ও তখনকার দিনের একজন গোঁড়া যুক্তিবাদী। লাফাটর ও বাজেডভ্ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। লাফাটর সুদর্শন, মার্জিতরুচি, ভক্ত, বাজেডভ্ রুক্ষদর্শন, ভব্যতালেশশূন্য, নিরঙ্কুশযুক্তিবাদী—খৃষ্টান ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সদাই প্রস্তুত। অতিরিক্ত মদ্য ও ধূমপানের জন্য তাঁর বাসস্থল সব সময়ে অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় হয়ে থাকতো। ক সপ্তাহ এঁর সঙ্গে গ্যেটের কাটে। এঁর অনেক কথা তাঁর ভাল লাগেনি। তবে শিক্ষাকে যে ইনি জীবন্ত করতে চাচ্ছিলেন সেটি তাঁর ভাল লেগেছিল। বাজেডভ্ ছিলেন দরিদ্রের সন্তান ও জন্মবিদ্রোহী। মধ্যজীবনে তিনি রুসোর শিক্ষা-পদ্ধতিকে জীবনের ব্রত করে' তোলেন ও এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে' লোকপ্রসিদ্ধ হন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তিনি অর্থসংগ্রহে জার্মানীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করছিলেন।

বাজেডভ্ ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে এর্ন্‌স্-এ যান। গ্যেটে তাঁর সঙ্গ নেন। সেখানে লাফাটরকে পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হয়। তাঁদের তিনজনের অদ্ভুতভাবে কিছুকাল কাটে,—লাফাটর করতেন ভক্তিধর্ম প্রচার, বাজেডভ বলতেন আমূল সংস্কারের কথা, গ্যেটে রত থাকতেন কৌতুকে ও নৃত্যে। একদিন এক ভদ্রমহিলার গৃহে তাঁরা গমন করলে বহু লোক তাঁদের দেখতে আসে। লাফাটর তাদের আপ্যায়িত করেন মুখাবয়ব-বিদ্যায় দক্ষতা দেখিয়ে, গ্যেটে তাঁদের শোনান গল্প, কিন্তু যখন বাজেডভের বাক্যস্রোত নির্বারিত হলো তখন অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে প্রমাদ গণলে। প্রথমে তিনি বলতে আরম্ভ করেছিলেন উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলনের কথা যার জন্য সকলেরই মুক্তহস্ত হওয়া সমীচীন; কিন্তু হঠাৎ ভুলে বসলেন ত্রিত্ববাদ প্রসঙ্গ। সমস্ত শ্রোতা অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো—কিন্তু সেদিকে বাজেডভের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য কিছু অর্থ-সাহায্য তিনি হয়ত পেতেন, কিন্তু তা আর সম্ভবপর হলো না।—বাসায় ফিরবার কালে গ্যেটে এমন একটি কাণ্ড করলেন যাতে তাঁদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। বাজেডভ্ তৃষ্ণাবোধ করছিলেন। এক 'বিয়ারে'র দোকান দেখে তিনি গাড়োয়ানকে

গাড়ী থামাতে বললেন। কিন্তু গ্যেটে আরো চেঁচিয়ে বললেন—চালাও। গাড়ী বাস্তবিকই যখন থামলো না তখন বাজেডভ্ গ্যেটের উপরে একেবারে মারমূর্তি হয়ে উঠলেন; কিন্তু গ্যেটে শান্তকণ্ঠে বললেন:

> ধর্মাত্মা, এর জন্য আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত। ভাগ্যে আপনি বিয়ার মদের বিজ্ঞাপনটি দেখেন নি—তাতে এক ত্রিভুজের মধ্যে আর এক ত্রিভুজ ঢুকেছে। এক ত্রিভুজ দেখেই আপনার মাথা গরম হয়ে যায়, দুই ত্রিভুজের উপরে যদি আপনার চোখ পড়তো তবে আপনার জন্য দড়িকাছির যোগাড় করতে হতো।

আত্মচরিতে গ্যেটে লিখেছেন, এর্ন্স্-এ রাত্রিতে খানিকটা সময় তিনি বাজেডভ্-এর কামরায় কাটাতেন। বাজেডভ ঘুমাতেন না, কৌচে বসে' অনর্গলভাবে বলে' যেতেন আর তাঁর সেক্রেটারি লিখতেন। মাঝে মাঝে তাঁর তন্দ্রা আস্তো, সেই তন্দ্রার ঝোঁক কেটে গেলে আবার তিনি বলতে থাকতেন। নাচের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর ধূমের-গন্ধে-ভরা কামরায় ঢুকে গ্যেটে তাঁর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতেন, যখন তিনি আবার নাচের মজলিসে ফিরে যেতেন তখন সহজভাবে বাজেডভ্ তাঁর কাজে মন দিতেন।

এর্ন্স্ থেকে তিনজন কোব্লেন্ৎস্-এ যান। পথে ও কোব্লেন্ৎসে নেমে গ্যেটে ওবাজেডভ হাসিঠাট্টায় এমন উদ্দামতার পরিচয় দেন যে সবাই তাঁদের পাগল মনে করে। এখানে এক হোটেলে তাঁদের নৈশ-ভোজন সমাধা হয়—সেই ভোজন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। ভোজনকালে লাফাটর এক গ্রাম্য যাজককে শোনাচ্ছিলেন প্রত্যাদেশ-তত্ত্ব, আর বাজেডভ্ এক একগুঁয়ে নিত্যশিক্ষককে কেবলই বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে খৃষ্টীয় জলশুদ্ধি (Baptism) একালে অনাবশ্যক। একটি কবিতায় গ্যেটে এর স্মৃতি রক্ষা করেছেন—তার শেষ দু'টি চরণ এই:

> ডাইনে বার্তাবহ বামে বার্তাবহ,
> মধ্যে বসে' বিশ্ব-শিশু—

এই বোধ হয় প্রথম তিনি নিজেকে বিশ্ব-শিশু বা বিশ্ব-সন্তান (Welt-kind) বললেন।

এই যাত্রায় গ্যেটে ডুসেলডর্ফ-এ যান, সেখানে তাঁর বন্ধু যুঙ্ষ্টিলিঙ্-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, খ্যাতনামা চিন্তাশীল ফ্রিৎস্ য়াকোবির (Jacobi) সঙ্গেও তাঁর মিলন ঘটে। এখানে এক ধর্মভীরুদের সভায় গ্যেটে আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দেন। খুব এক উদ্দামতার নেশা সম্প্রতি তাঁর লেগেছিল। সেই ধর্মভীরুদের সভায় টেবিলের চারপাশে তিনি নেচে নেচে ফিরছিলেন। মাঝে মাঝে এমন তিনি করতেন। অনেকেরই মনে তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির আশঙ্কা জেগেছিল। যখন মজলিসি আলাপ

খুব জমেছে তখন এক ভক্ত হঠাৎ গ্যেটেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ভের্টয়ের রচয়িতা কি না। গ্যেটে বল্লেন—হাঁ। তখন ভক্ত বললেন :

> আপনার সেই জঘন্য বইখানির প্রতি যদি আমি ঘৃণা প্রকাশ না করি তবে আমার বিবেকের কাছে দোষী হব। ঈশ্বরের ইচ্ছা হোক আপনার বিকৃত হৃদয় সংশোধিত করতে।

সভা স্তব্ধ হয়ে রইল। গ্যেটে শান্ত কণ্ঠে বল্লেন :

> আপনার দিক থেকে এই যে সিদ্ধান্ত হবে তা আমি বেশ বুঝি, আর এম্‌নিভাবে আমাকে যে ভর্ৎসনা করলেন সেজন্য আপনার অকৃত্রিমতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি; আমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন।

য়াকোবি ও তাঁর ভাইয়ের সংসর্গে গ্যেটের কয়েক দিন আনন্দে কাটে। লাফাটর ও বাজেডভের চাইতে অন্তরের মিল তাঁদের সঙ্গে তাঁর বেশী হয়েছিল যদিও কিছুদিন পূর্বে তাঁদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক অসদ্ভাব ছিল। সাহিত্য ধর্ম দর্শন এই সব বিষয়ে বহু আলাপ তাঁদের হয়, তার সুখস্মৃতি তাঁর আত্মচরিতে রয়েছে। এর অল্প কিছুকাল পরে য়াকোবি ভীলাণ্ডকে এই পত্রখানি লেখেন :

> আমি যত ভাবি ততই তীব্রভাবে উপলব্ধি করি যিনি গ্যেটেকে দেখেননি কিংবা তাঁর কথা শোনেননি তাঁকে বিধাতার এই অপূর্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি বুঝবার মতো ধারণা দেওয়া কি অসম্ভব ব্যাপার। হাইন্‌জে বলেছেন, মাথার চাঁদি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত গ্যেটে আগাগোড়া প্রতিভা; আমি আরো বলি, গ্যেটে যেন দানোয়-পাওয়া—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু করা যেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এক ঘণ্টার জন্য যিনি তাঁর সংস্পর্শে আসবেন তিনি বুঝবেন তিমি যা ভাবেন বা যা করেন তা ভিন্ন আর কিছুই তাঁর জন্য মামানসই ভাবা যায় না। আমার বলবার মতলব এ নয় যে ভালোর দিকে শোভনতার দিকে তাঁর বিকাশের অবকাশ নেই, আমি বরং বলতে চাই যে তাঁর বেলায় সেই বিকাশ হবে যেন ফুলের বিকাশ, বীজের পক্বতা-লাভ, বৃক্ষের আকাশে মাথা তুলে পত্র-পল্লব-ভূষিত হওয়া।

স্পিনোজার আলোচনায় গ্যেটে ও য়াকোবির অন্তরঙ্গতা ঘনীভূত হয়। স্পিনোজার সংযম ও অনাশক্তি গ্যেটের উদ্দাম তারুণ্যের জন্য হয়েছিল এক অপূর্ব প্রতিষেধক। কিন্তু উত্তরকালে এঁকে নিয়েই এই দুই বন্ধুর মনোমালিন্য ঘটে। য়াকোবি শেষে এই ধারণায় উপনীত হন যে স্পিনোজা নাস্তিক, মানুষ ভুল করে' তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, কিন্তু গ্যেটে তাঁকে আজীবন জ্ঞান করেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ব্রাণ্ডেস মন্তব্য করেছেন য়াকোবি

কোনোদিনই গ্যেটেকে বুঝতে পারেন নি, বার বার ভুল বুঝেছেন, কি করে' যে দীর্ঘকাল তাঁদের বন্ধুত্ব চলেছিল সেইটিই আশ্চর্য। য়াকোবির প্রকৃতি যে অগভীর ছিল লুইসও সেকথা বলেছেন। দীর্ঘ দিন পরে লাফাটরের সম্পর্কও গ্যেটে ত্যাগ করেছিলেন। লাফাটর যে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য ছলনার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হতেন না, সে বিষয়ে তিনি কালে কালে নিঃসন্দেহ হন।

এর কয়েক মাস পরে ফ্রাঙ্কফোর্টে আসেন সেকালের মহাসম্মানিত কবি ক্লপষ্টক্ (Klopstock)। তাঁর "মেসায়াস" (পরিত্রাতা) কাব্য গ্যেটের পিতার অপ্রিয় ছিল কেননা প্রচলিত সমিল ছন্দে তা লেখা নয়; কিন্তু সেই দিনের অন্যান্য যুবকের মতো গ্যেটেও এই কবিকে জ্ঞান করতেন এক অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা—জার্মান-ভারতীকে যিনি ছন্দের অনাবশ্যক নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। পূর্বেই এই জার্মান কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সশ্রদ্ধ পত্রালাপ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করে' গ্যেটে যে বিশেষ পরিতোষ লাভ করেছিলেন তা মনে হয় না। কাব্য বা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা না করে ক্লপষ্টক্ তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন স্কেটিং ও ঘোড়ায় চড়া সম্বন্ধে—এই দুয়েতেই গ্যেটেরও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।—ক্লপষ্টককে তিনি মান-হাইম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন ও ফিরবার পথে একটি কবিতা রচনা করেন। হিউমব্রাউন বলেন, ক্লপষ্টকের ভাষা ও ছন্দের অনুসরণে এটি লেখা—ঝড়-ঝাপটার ভাবে পূর্ণ; জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী হোক ক্ষতি নেই কিন্তু আমৃত্যু তা যেন থাকে সুস্বাদু, এই কথা কবিতাটিতে বিশেষ আবেগের সঙ্গে বলা হয়েছে।

এমন মহাজন-সমাগমে গ্যেটে যে আনন্দিত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই:

> নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই যখন দেখি অপরের অন্তরে আমাদের ঠাঁই হয়েছে।

লিলি

মহাজন-সমাগমের পরে ফ্রাঙ্কফোর্টে গ্যেটের জীবনের প্রধান ঘটনা আনা এলিজাবেথ শ্যোনেমান নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় ও পরে বিবাহ-প্রস্তাব। আত্মচরিতে এঁর নাম তিনি দিয়েছেন লিলি।

লিলির পিতা ছিলেন একজন বড় ব্যাঙ্ক-মালিক—বৈভবে ও মর্যাদায় গ্যেটেদের চাইতে উচ্চতর। কিছুদিন পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন; লিলির মাতা পারিবারিক গৌরব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। এ সময়ে ফাঙ্কফোর্টের উচ্চতর সমাজে খ্যাতিমান গ্যেটের খুব মেলামেশা চলছিল। জনৈক বন্ধুর আগ্রহে একদিন

তিনি শ্লোনেমান-ভবনে উপনীত হন। লিলি তখন অভ্যাগতদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব কবিকে মুগ্ধ করে।

সপ্তদশবর্ষীয়া লিলি স্বাভাবিক ও অর্জিত রূপবৈভবের দ্বারা গ্যেটের চিত্তের উপরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। গ্যেটের এই সময়ের কয়েকটি কবিতা লিলির দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেসবের মধ্যে এই ক'টি চরণ প্রসিদ্ধ:

তার মায়াফাঁদে বন্দী হয়ে আছি;
রব তারি দাস যতকাল বাঁচি।
আপনারে মোর চেনা হলো ভার—
দাও মুক্তি দাও প্রেয়সী আমার।

তাঁর এই সময়ের একটি দীর্ঘ কবিতা কৌতুকাবহ—নাম 'লিলির চিড়িয়াখানা'। লিলি ছিলেন তাঁর তরুণ-তরুণী-সমাজে 'বল'-নাচের নেত্রী এই কবিতায় লিলি হয়েছেন পরীরাণী, তাঁর চিড়িয়াখানায় নানা পাখী ও পশুর ভিড় জমেছে, তাদের মধ্যে চলেছে পরীরাণীর আদর-যত্ন পাবার প্রতিযোগিতা—সে-প্রতিযোগিতা কখনো কখনো তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের দলে এক বুনো ভালুক এসে জুটেছে—পরীরাণীর আদর-যত্ন তারও কাম্য; কিন্তু এই পোষাপ্রাণীর দলে সে আরাম পাচ্ছে না। অন্যান্য প্রাণীর প্রতি পরীরাণীর আদর দেখে একবার সে ঈর্ষায় ছুটে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু পরীরাণীর কণ্ঠস্বরের মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে আবার সে ফিরে আসছে। কবি বলেছেন এই ভালুক তিনি নিজে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁদের পরিচয় হয় আর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে তাঁদের বাগ্‌দান ঘটে। কিন্তু তাঁদের উভয় পক্ষের অভিভাবকরাই এ বিবাহে অসম্মত ছিলেন। গ্যেটের পিতা এমন সৌখীন রুচির ধনী কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছিলেন ন, লিলির অভিভাবকরাও চাচ্ছিলেন না তাঁদের মতো ঘরে ভিন্ন লিলির বিবাহ হয়। এর উপর লিলির পিতৃপক্ষ ছিলেন হাইচার্চ-পন্থী আর গ্যেটেরা ছিলেন লুথার-পন্থী।—লিলি শুধু মুগ্ধ করেন নি, মুগ্ধ হয়েওছিলেন। তাঁদের বিবাহে এই বাধায় তাঁরা উভয়ে গভীর দুঃখ পান। লিলি গ্যেটের সঙ্গে আমেরিকায় চলে যেতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু চিরপরিচিত পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে' অচেনা দেশে যাওয়া গ্যেটের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি।

গ্যেটে বলেছেন, তাঁর প্রকৃত প্রেমপাত্রী লিলিই হতে পেরেছিলেন, আর কেউ নয়। লুইস কবির এই উক্তিকে যথার্থ বলে মেনে নেন নি। অন্যান্য চরিতকার বলেছেন, লিলি সর্ববিষয়ে গ্যেটের পত্নী হবার যোগ্যা ছিলেন, তাঁকে জীবনসঙ্গিনী রূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়ত সত্যই কবির অন্তরে জেগেছিল।

লিলির উদ্দেশ্যে যেসব কবিতা গ্যেটে লিখেছিলেন সেসবে যেমন ফুটেছে লিলির প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ তেম্‌নি ফুটেছে লিলির চারপাশের আড়ম্বর ও লিলির বন্ধুবান্ধবদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা। তাঁর এই সময়ের এই চিঠিখানি তাঁর চরিত-গ্রন্থে সাদরে উল্লিখিত হয়েছে—এটি গুস্‌ট্‌খেন ছদ্মনাম্নী এক অপরিচিতা বান্ধবীকে লেখা :

> মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করুন এক গ্যেটের ছবি,—গায়ে তার কারুখচিত ফ্রককোট, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জমকালো সাজ-সজ্জা; চারদিকে ঝকঝক করছে ঝাড়বাতি, বিচিত্র নর-নারীর ভিড়, আর সে বন্দী হয়ে আছে এক তাসের টেবিলে দুটি উজ্জ্বল চোখের মায়ায়; হরদম চলছে স্ফূর্তি—গান আর নাচ—আর চলছে অফুরন্ত প্রণয়নিবেদন এক স্বর্ণকুন্তলার কানে,—তাহলে আপনি ধারণা করতে পারবেন আজ-কালকার স্ফূর্তিবাজ গ্যেটে সম্বন্ধে।…কিন্তু আর এক গ্যেটেও আছে… গায়ে তার মোটা ধূসর ওভারকোট, গলায় সিল্কের বাদামী মাফ্‌লার, পায়ে মজবুত বুট, ফেব্রুয়ারীর কোমল বাতাসে সে পাচ্ছে বসন্তের ঘ্রাণ, তার প্রিয় বিপুলা ধরণীর নবজীবনে উদ্‌বোধিত হতে আর দেরী নেই। মনে তার চিরদিন চলছে নব নব প্রয়াস ও সফলতা-লাভ; আর সাধনা তার নব-যৌবনের সহজ হৃদয়াবেগ ক্ষুদ্র কবিতায় রূপদান করা, জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা নাটকে রূপদান করা,—আর বন্ধু বান্ধবদের ও পরিবেষ্টনকে কাগজে চিত্রিত করা। দক্ষিণ বা বাম কোনো দিক থেকে তার জানবার প্রয়োজন নেই তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কে কি ভাবছে, কেননা সে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলতে পারছে কাজের ভিতর দিয়ে; আদর্শের উপরে সে আগে থাকতে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, বরং তার অন্তঃপ্রকৃতিকে বিকশিত হতে দেয় কতকটা কঠিন আগ্রহে ও কতকটা লীলাময় কৌতুকে।…এই গ্যেটের পরম আনন্দ তার যুগের শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে জীবনাতিপাতে।

এই বৎসরই গ্রীষ্মকালে ষ্টোলবের্গ-বংশের দুই কুমারের সঙ্গে গ্যেটে সুইট্‌জারল্যাণ্ড ভ্রমণে যান। এই কুমারদ্বয় ছিলেন কবি ক্লপ্‌ষ্টকের ভক্ত আর প্রকৃতিমার্গী, অর্থাৎ লোকাচারের বিরোধী। খুব এক উদ্দামতায় এঁদের কয়েক দিন কাটে।—এই ভ্রমণ কালে লাফাটরের সঙ্গে ও তাঁর ভাগিনী কর্ণেলিয়ার সঙ্গে গ্যেটের দেখা হয়, কর্ণেলিয়া লিলির সঙ্গে তাঁর বিবাহে আপত্তি জানান। উত্তরকালে এই ঘটনা স্মরণ করে' গ্যেটে বলেছিলেন তাঁর ভগিনী ছিলেন সেই শ্রেণীর নারী যাঁরা স্বভাবত সন্ন্যাসিনী। এই ভ্রমণকালে গ্যেটের আরো দেখা হয় ভাইমারের তরুণ যুবরাজ কার্ল আউগুস্‌ট্‌-এর সঙ্গে। এর পূর্বে যুবরাজ ফ্রাঙ্কফোর্টে একবার গিয়েছিলেন ও সেখানে গ্যেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। গ্যেটেকে তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন তাঁর রাজধানী ভাইমারে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের অতুলনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে গ্যেটের মনে ভাসছিল লিলির মুখ। তাঁর স্মরণে লেখা এই চার ছত্র অমর হয়ে আছে :

না যদি তোমারে বাসিতাম ভালো হে মোর লিলি,
মধুর লাগিত এমন স্বভাব-শোভা ;
কিন্তু না যদি বাসিতাম ভালো তোমারে লিলি,
এত সুখ কভু দিত কি স্বভাব-শোভা ?

ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে কবি দেখলেন তাঁর ও লিলির মধ্যেকার দূরত্ব আরো বেড়ে গেছে—লিলির বন্ধু-বান্ধবরা কবির অনুপস্থিতির সুযোগ পুরোপুরিই নিয়েছিলেন। কিন্তু পরস্পরকে ভোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হলো না দীর্ঘদিন। এক রাত্রে লিলির জানালার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কবি শুনলেন লিলি তাঁরই রচিত গান পিয়ানোয় গাচ্ছেন।

এইকালে গ্যেটের দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—"এর্‌ভিন্ উণ্ড এল্‌মিরা" গীতিনাট্য আর "স্টেলা" নাটক। গীতিনাট্যের বর্ণনার বিষয় নায়িকার চতুরালি যাতে নায়ক হতাশ্বাস হয়ে পড়ে—হয়ত লিলির ছায়া এই নাটকে পড়েছে ; আর নাটকখানির বর্ণনার বিষয় এক নায়কের দুই প্রেমময়ী নায়িকা। এ-সবের, বিশেষ করে' নাটকখানির, সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই বলেই সমালোচকদের ধারণা।—এই কালে তাঁর 'ফাউস্‌ট' রচনা অনেকদূর অগ্রসর হয়, আর "এগ্‌মণ্ট" নাটকখানির সূচনা হয়।

উত্তরকালে লিলির একটি উক্তি গ্যেটের মনুষ্যত্বের উপরে প্রচুর আলোক পাত করেছিল। গ্যেটের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের ষোল বৎসর পরে ভাইমারের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লিলি তখন মর্যাদাময়ী গৃহিণী। এই মহিলার কাছ থেকে তিনি জানতে চেষ্টা করেন গ্যেটের জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হচ্ছে। এঁকেই তিনি বলেছিলেন :

> তাঁকে (গ্যেটেকে) আমি জ্ঞান করি আমার নৈতিক জীবনের স্রষ্টা রূপে। তাঁর প্রতি আমার অনুরাগ আমার ধর্ম ও কর্তব্য-জ্ঞান ছাপিয়ে উঠেছিল ; একমাত্র তাঁর মহত্বে রক্ষা পেয়েছিল আমার আত্মিক জীবন। আমি তাঁরই সৃষ্টি—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রতিমূর্তির দিকে পরম ভক্তিভরে চাইব।

কর্ম-ব্রত

ভাইমার-যাত্রা

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বরে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে গ্যেটে ভাইমারে উপনীত হন। তাঁর পিতা তাঁর এই রাজদরবারে গমন প্রীতির চক্ষে দেখেন নি। প্রাশিয়া রাজ স্বনামধন্য ফ্রেডেরিকের দরবারে সাহিত্য-গুরু ভল্টেয়ারের লাঞ্ছনার কথা তাঁর মনে সজীব ছিল। গ্যেটেও যে রাজদরবারে যোগদানের বাসনা নিয়ে ভাইমার যাত্রা করেন তা নয়। উত্তর কালে একেরমানকে তিনি বলেছিলেন, লিলির বিচ্ছেদ তাঁর ভাইমার আগমনের হেতু।

কিন্তু অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল এই ভাইমারে তিনি যাপন করেন। 'ক্ষুদ্র ইল্‌ম্ তীরাশ্রিত নগণ্য ভাইমার তাঁর প্রতিভার বিকাশ-ক্ষেত্র হয়ে পেয়েছে আথেন্‌সের গৌরব।'

ভাইমারে প্রথম দুই মাস কবির যেভাবে কাটে সবাই তাকে বলেছেন উদ্দাম। কবি ক্লপ্‌ষ্টক স্কেটিংএর মহিমা গান করেন, আর তা ভব্য-সমাজে প্রচলিত করান তারুণ্যের অপূর্ব বিগ্রহ এই কবি। অনতিবিলম্বে রাজপরিবারের মহিলারাও স্কেটিংএর ভক্ত হয়ে পড়েন। স্কেটিং চালনার যে ধুম চলে গ্যেটে নিজে তাকে বলেছেন পাগলামি। নাচ-গান পাশাখেলা শিকার এসবও হয়ে ওঠে অন্তহীন। আর এসব পাগলামিতে যুবরাজকে কবি পান দোসর রূপে। সঙ্কোচ সম্ভ্রমের সমস্ত ব্যবধান তাঁদের মধ্যে থেকে অপসারিত হয়। তাঁরা পরস্পরকে সম্বোধন করতে শুরু করেন 'তুমি' বলে'। ভীলান্ডের এই সময়ের এক চিঠিতে আছে:

> কার্ল আউগুস্‌টের কোনো কাজই আর গ্যেটেকে ছাড়া হয় না। রাজ-দরবারে অথবা যুবরাজের সঙ্গে সংস্রবে এই ভাবে গ্যেটের সময় নষ্ট হচ্ছে। ব্যাপারটা আফ্‌সোসের। অথবা এমন মহিমময় দেবোপম পুরুষের জন্য কিছুই আফসোসের নয়।

গ্যেটের ও যুবরাজের এই সব উদ্দামতার কাহিনী দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে—হয়ত অতিরঞ্জিত হয়ে। এই সময়ে যুবরাজের বয়স ছিল মাত্র উনিশ বৎসর। তাঁর বিবাহ হয়েছিল অল্প কিছুদিন পূর্বে। যুবরাজ ও তাঁর পত্নী লুইসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে কবি ক্লপ্‌ষ্টক গ্যেটেকে এই চিঠিখানি লেখেন:

> আমার বন্ধুত্বের এ এক পরিচয় পরমপ্রিয় গ্যেটে; অবশ্য এমন পরিচয় দান কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর। কিন্তু অন্য উপায়ও ত দেখি না। ভাববেন

না, কি আপনার করণীয় সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি, অথবা কোনো কোনো বিষয়ে আপনি ভিন্ন মত পোষণ করেন বলে' আপনার সম্পর্কে অনুদারতার পরিচয় দিচ্ছি। কিন্তু আপনার ও আমার মতামতের কথা থাকুক, বর্তমানে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তার অবশ্যম্ভাবী ফল কি হবে বলুন ত! যুবরাজ বর্তমানে যে-পরিমাণে মদ্য পান করে চলেছেন যদি সেই ভাবেই চলেন তবে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের পরিবর্তে অচিরেই ধ্বংস সাধন করবেন। অনেক শক্ত ধাতের যুবকও —যুবরাজের ধাত তত শক্ত নয়—এইভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। জার্মানরা এ পর্যন্ত এই ধারণা পোষণ করে' এসেছে—সঙ্গত-ভাবেই—যে তাদের শাসনকর্তাদের জন্য সাহিত্যিক সংসর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। যুবরাজের বেলায় তার ব্যতিক্রম তারা সানন্দে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আপনি যদি আপনার বর্তমান পন্থাই অনুসরণ করে' চলেন তবে অন্যান্য শাসনকর্তা কত বড় একটা অজুহাত পাবেন? আর আমি যা অবশ্যম্ভাবী বলে' আশঙ্কা করছি তাই যদি ঘটে! যুবরাজপত্নী হয়ত নিজের বেদনা চেপে রাখবেন—তাঁর বুদ্ধি পুরুষের মতো সবল—কিন্তু সেই বেদনা যে পরম দুঃখের ব্যাপার হবে! সেই দুঃখ কি চেপে রাখা যাবে! লুইসার দুঃখ—এই কথাটা ভাবুন গ্যেটে!…ষ্টোলবের্গ সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। যুবরাজের বন্ধুত্বের আকর্ষণে সে ভাইমারে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে তার যোগ্যভাবেই কাটানো চাই। কিন্তু কি ভাবে? যুবরাজের ভাবে কি? নিশ্চয়ই নয়; যদি সে না বদলায় তবে যুবরাজের সঙ্গ সে ত্যাগ করবে। তারপর কি করবে? কোপেনহেগেনেও নয় ভাইমারেও না। ষ্টোলবের্গকে লিখতে হবে। কিন্তু কি লিখব তাকে? এই চিঠিখানি আপনি যুবরাজকে দেখাবেন কি না সে আপনার ইচ্ছা। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। বরং তার উল্টো, কেননা আমার ধারণা যুবরাজ এমন দশায় উপনীত হন নি যে বন্ধুর অকপট কথায় কান দেবেন না।

দুই সপ্তাহ পরে গ্যেটে এর এই উত্তর দেন:

ভবিষ্যতে এমন সব পত্র থেকে আমাদের অব্যাহতি দেবেন শ্রদ্ধেয় ক্লপষ্টক। এসবে লাভ কিছুই হয় না, বরং অন্তরের অপ্রসন্নতা বেড়ে যায়। আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন যে আমার কিছুমাত্র বলবার নেই। আমাকে হয় গুরুজনের সামনে ছেলেমানুষের মতো জড়সড় হতে হবে, নইলে কারণ দর্শাতে হবে, নইলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আত্মসমর্থন করতে

হবে, অথবা এক সঙ্গে এই তিন কাজই করতে হবে, সেইটি হবে যা সাধারণত ঘটে তার কাছাকাছি—কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? কাজেই ওবিষয়ে আমাদের মধ্যে আর একটি কথাও নয়। বিশ্বাস করুন, এই সব তিরস্কার উত্তরযোগ্য বিবেচনা করলে আমার মনে এতটুকু শান্তি অবশিষ্ট থাকতো না। মুহূর্তের জন্য যুবরাজের অন্তর ব্যথিত হয়েছিল এই কথা ভেবে যে, কবি ক্লপ্‌স্‌টকের তরফ থেকে কথাগুলো এসেছে। তিনি আপনাকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। আপনি জানেন আমারও মনোভাব তাই। বিদায়। ষ্টোলবের্গ নিশ্চয়ই আসবেন। আমাদের অবস্থায় কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। আর, ভগবৎপ্রসাদাৎ, তিনি আমাদের যে ভাবে দেখে গেছেন তার চাইতে আরো ভাল হওয়ার সম্ভাবনাই আমাদের বেশী।

এতে ক্লপ্‌স্‌টক ক্রুদ্ধ হন ও লেখেন :

আমার বন্ধুত্বের নিদর্শনকে আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝেছেন। যা অপরের ব্যাপার তাতে অনাহূতভাবে হস্তক্ষেপ করতে যাইনি সেই বন্ধুত্বের অনুরোধেই। কিন্তু আপনি এমন সব পত্র এবং এমন সব তিরস্কারই যখন একপর্যায়ভুক্ত ভেবেছেন—আপনার কথার তাই অর্থ—তখন আপনাকে আমার বন্ধুত্বের অযোগ্য জ্ঞান না করে' আর উপায় নেই। ষ্টোলবের্গ আর সেখানে যাবে না যদি সে আমার কথা শোনে, অর্থাৎ তার বিবেকের কথা শোনে।

তরুণ ও প্রবীণ কবির মধ্যে এই 'মনান্তর' আর ঘোচে নি।

গ্যেটের তারুণ্যের এক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সাহিত্যিক গ্লাইম এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন :

গ্যেটের ভের্টর লেখার কিছুকাল পরে আমি ভাইমারে আসি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমার সঙ্গে ছিল একখানি নবপ্রকাশিত কবিতাসংগ্রহ। তা থেকে বন্ধুদের পড়ে পড়ে শোনাতাম। এক সন্ধ্যায় এমনিভাবে যখন কাব্যপাঠ চলেছে তখন এক তরুণ যুবক—পায়ে বুট গায়ে সবুজ রঙের খাটো বুকখোলা শিকারের জামা †—এসে শ্রোতার দলে বসে গেলেন। তাঁর দুটি কালো ইতালীয় চোখ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করবার প্রয়োজন বোধ করিনি ; পরে অবশ্য রীতিমতই করতে হয়েছিল।

কাব্যপাঠে কিঞ্চিৎ বিরতি হলো। সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা-বৃন্দ কোনো কোনো কবিতার দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তখন

† এইটি ভের্টরের পদ্ধতির বেশবিন্যাস।

এই তরুণ শিকারী—এঁকে আমি তাই মনে করেছিলাম—আমার কাছে খুব বিনীতভাবে বইখানি চাইলেন আমাকে কিঞ্চিৎ অবসর দেবার জন্যে। এমন বিনীত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। আমি তৎক্ষণাৎ বইখানি তাঁর হাতে দিলাম। কিন্তু সব দেবতা সাক্ষী—কী শুনবার সৌভাগ্যই না আমার হয়েছিল! প্রথমে ধীরেসুস্থেই চললো। নিপুণভাবে বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কবিতা তিনি আবৃত্তি করে' চললেন।···

কিন্তু সহসা যেন তাঁকে দানোয় পেয়ে বস্‌লো—আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন উদ্দাম শিকারের দেবতাকে সামনে দেখছিলাম। এমন সমস্ত কবিতা তিনি আবৃত্তি করে চললেন যা কস্মিনকালেও সেই কবিতাসংগ্রহে ছিল না। একের পর আর বিভিন্ন ছন্দ, কখনো সেসবের অদ্ভুত মিশ্রণ—যেন বন্যাবেগে উৎসারিত হয়ে চললো! সেই সন্ধ্যায় কি উদ্দাম আর অদ্ভুত কল্পনার সমাবেশই না তিনি করেছিলেন, আর সেসবের মধ্যে কত চমৎকার চিন্তা আর বাণীই না বিক্ষিপ্ত হয়েছিল! সেই সব চিন্তা ও বাণী যেসব কবির উপরে তিনি আরোপ করছিলেন বাস্তবিকই সেসব তাঁদের হলে তাঁরা সম্ভবপর হলে তাঁরা নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন।

যখন এই ফাঁকি ধরা পড়লো তখন চারদিকে হাসি-উল্লাসের তরঙ্গ বইতে লাগ্‌লো। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেককেই তিনি কিছু-না-কিছু বলে' নিরুত্তর করে' দিলেন। তরুণ সাহিত্যিকদের মুরুব্বিস্থানীয় আমারো জব্দ হবার পালা এলো। আমার সেই মুরুব্বিগিরির প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, যদিও এই খোঁচা দিতে ছাড়লেন না যে আমার আশ্রিত তরুণদের আমি জ্ঞান করি আমার নিজের সম্পত্তি। মুখে মুখে রচিত এক ছন্দময় কাহিনীতে তিনি আমাকে তুলনা করলেন এক প্রবীণা কুক্কুটীর সঙ্গে, পরম যত্ন ও ধৈর্য সহকারে যিনি বহু ডিমে তা দেন, কিন্তু সময় সময় ডিমের সঙ্গে সঙ্গে চকের ডেলায়ও তিনি তা দেন—তা থেকে আর বাচ্চা ফোটে না।

আমার সামনে ভীলাণ্ড বসেছিলেন। আমি বলে উঠ্‌লাম—এ হয় গ্যেটে নয় শয়তান স্বয়ং! তিনি বল্লেন—দুই-ই।

উদ্যান-বাটিকা

গ্যেটে একেরমানকে বলেছিলেন:

এই ভাইমারে আমি পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়েছি। কোথায়ই বা যাইনি! কিন্তু ভাইমারে ফিরে এলে বারবারই মন খুশী হয়েছে।

অথ্যাত ভাইমার যে মোহিনী গুণে কবিকে মুগ্ধ করেছিল সেটি হচ্ছে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—কবির চিরদিনের প্রিয় সামগ্রী। ভাইমারের নিকটবর্তী উপত্যকা ও অরণ্য আর ভাইমারের দীর্ঘ প্রান্তর ও উদ্যান কবির মনকে আকর্ষণ করেছিল। ভাইমারের বিখ্যাত উদ্যানের এক পাশে যে তাঁর আবাসস্থল নির্দিষ্ট হয়েছিল এতে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন।

কবির এই উদ্যান-বাটিকা লাভের ইতিহাস এই। কবি ভাইমারেই থাকবেন না চলে যাবেন সে বিষয় কয়েক মাস মনস্থির করতে পারেন নি। ভাইমারে থেকে যাবার জন্যই একদিন ডিউক তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করলেন। ভাইমারে অবস্থানের বহু অসুবিধার কথা কবি বললেন, তার মধ্যে একটি এই যে এখানে এমন নিরিবিলি জায়গা নেই যেখানে বাস করে' তিনি তাঁর বাগান করবার সখ মেটাতে পারেন; সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্যান-বাটিকার নাম করে তিনি বল্লেন—এইটির মত একটি জায়গা পেলে তিনি আনন্দিত হতেন। এই উদ্যান-বাটিকার মালিক ছিলেন বেরটুশ—ভাইমারের একজন গণ্যমান্য ধনী। অনতিবিলম্বে ডিউক তাঁর কাছে গিয়ে বল্লেন—বাগানটি তাঁর চাই। বেরটুশ হতভম্ব হয়ে পড়লেন। ডিউক বল্লেন, "আপত্তি করলে চলবে না, এটি না পেলে আমি গ্যেটেকে রাখতে পারব না।" যা উচিত মূল্য তার কিছু বেশী দিয়ে এটি নিয়ে কবিকে বাস করতে দিলেন। পাঁচ বৎসর পরে এক দলিল করে' তিনি কবিকে এটি দান করেন।

এই উদ্যান-বাটিকাটির অবস্থিতিই ছিল মনোরম—সামনে ছোট নদী ইল্‌ম্‌, পশ্চাতে ঘন গাছপালা শহরের কর্ম্মমুখরতা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করেছিল; কিন্তু এই উদ্যানের যে গৃহে কবি বাস করতেন তা ছিল নিতান্তই সাধারণ। এই গৃহে দীর্ঘ সাত বৎসর কবি পরমানন্দে অতিবাহিত করেন। এই গৃহে অনেক সময়ে ডিউক নিজেও কবির সঙ্গে কাটাতেন, কোনো দিন এখানেই এক সোফায় রাত্রি যাপন করতেন। কবি তাঁর রাজ-অতিথির জন্য যে ভোজের আয়োজন করতেন তাও ছিল চমৎকার—কিঞ্চিৎ বিয়ার সুপ (Beer Soup) ও ঠাণ্ডা মাংসে তাঁদের এক নৈশ ভোজন সমাধা হয়। কবির জীবন-যাত্রা চিরদিন ছিল অনাড়ম্বর।

এই উদ্যান-বাটিকায় তাঁর মালি বাটি-র সাহায্যে ঋতুতে ঋতুতে নানা ফলফুলের আয়োজন তিনি করতেন ও প্রায়ই সেসব তাঁর পরমপ্রীতিপাত্রী শ্রীমতী শার্লোট ফন ষ্টাইন্‌-কে উপহার পাঠাতেন। এই কালে কৃষির প্রতি কবির চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, এবং এর ভিতর দিয়ে তাঁর অদূর ভবিষ্যতের ঐকান্তিক বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত হয়। তাঁর মালি বাটি-কে তিনি তাঁর সাহিত্যে অমর করেছেন। তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

শিল্পে সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের যেমন অস্পষ্ট ধারণা তেমন কোনো অস্পষ্টতা

> বাটি তে নেই। সে যখন কিছু করতে চায় তখন নিমেষমাত্রেই বুঝে ফেলে সেজন্যে কি কি তার চাই। কৃষি অতি চমৎকার বস্তু। আমরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছি না কেবল গণ্ডগোল করছি সে-সম্বন্ধে এর উত্তর অভ্রান্ত।

লুইস বলেন, খোলা জায়গা আর স্নান জার্মান জাতির প্রিয় নয় কিন্তু গ্যেটের প্রকৃতি ছিল এই দুই ব্যাপারে তাঁর জাতির প্রকৃতির উল্টা। তাঁর এই উদ্যান-বাটিকা এক সময়ে ভেঙে কিছু বড় করতে হয়েছিল, সে সময়ে অন্য কোনোখানে না গিয়ে এই ভাঙা বাড়ীর ছাদের উপরেই তিনি রাত্রি যাপন করতেন। বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের লীলা চলেছে, তিনি ছাদের একটি শুকনো কোণ বেছে নিয়ে সেখানে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে মহা আরামে ঘুমুচ্ছেন—সকালে উঠে দেখছেন কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেছে। তাঁর এক চিঠিতে আছে :

> কাল রাত্রে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে ছাদে ঘুমুচ্ছিলাম। তিনবার ঘুম ভেঙে যায়—বারোটায় দুটোয় আর চারটায়। প্রত্যেক বারেই আকাশে নতুন নতুন সমারোহ চোখে পড়েছিল।

আর সামনের ইল্‌ম্‌-এ মনের আনন্দে তিনি স্নান করতেন—শীত গ্রীষ্ম বারোমাস। একদিন ঘোর সন্ধ্যায় এমন স্নানের সময় উৎকট শব্দ আর লাফালাফি করে' এক চাষীকে ভূতের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন।—জলের মোহিনী সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতা আছে, নাম 'জেলে'—তাতে তল্‌তল্‌ ছল্‌ছল্‌ জলের মোহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে জেলে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' কবিতার কিঞ্চিৎ মিল দেখা যায়।

ভাইমারের গুণী-সমাজ

শহর হিসাবে নগণ্য হলেও সেদিনে ভাইমারে একটি চমৎকার গুণী-সমাজ গড়ে উঠেছিল। ডিউক-মাতা আমেলিয়ার অন্তরে ভারি একটা প্রসন্নতা ছিল, তাঁর চার-পাশে সেই প্রসন্নতা বিরাজ করতো; ভীলাণ্ডকে তিনি তাঁর পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন; গ্যেটের "এর্‌ভিন উণ্ড এল্‌মিরা" গীতিনাট্যে তিনি সুরসংযোজনা করেন। রাজবধূ লুইসার উন্নত প্রকৃতির প্রতি সবাই শ্রদ্ধান্বিত ছিল। উত্তর কালে তাঁর শত্রু নেপোলিয়নের মুখেও তাঁর প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছিল। এ ভিন্ন ডিউক-মাতার সহচরী ঈষৎকুব্জা গ্যোখ্‌হাউজন তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাজদরবারের গায়িকা কোরোনা শ্যোটর যেমন সে যুগের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ছিলেন তেম্‌নি ললিত কলায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গ্যেটের 'ইফিগেনিয়া' নাটকের নাম ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। সঙ্গীত ও নাট্যকলা ভিন্ন চিত্রাঙ্কনেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। ডিউক

কার্ল আউগুস্ট তাঁকে বলেছিলেন—মর্মর-মূর্তি, মর্মরের মতোই কঠিন। তাঁর সম্বন্ধে গ্যেটে লেখেন :

ফুলের মতো ফুটে উঠেছে সে জগতে ;
সৌন্দর্যের সে পূর্ণ মূর্তি ;
পরিপূর্ণতা কি তা বোঝা যায় তাকে দেখলে ;
সৌন্দর্য-লক্ষ্মীরা প্রত্যেকে তাকে দিয়েছেন তাঁদের দান।
আর প্রকৃতি তার অন্তরে সঞ্চারিত করেছে কলা-বোধ।

অন্যত্র

তার সামনে বিস্ময়পূরিত চিত্তে অনুভব কর
শিল্পীর মনে ভার স্বপ্নের কি রূপ !

অন্যত্র

তোমাকে গড়েছেন মদন, ওগো গায়িকা, তোমাকে লালনও করেছেন তিনি,
সেই শিশুদেবতা আনন্দচ্ছলে তোমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন তাঁর তীর দিয়ে।
তাই ওগো বুলবুল, কণ্ঠ তোমার ভরপুর মধুরতম বিষে,
তোমার কণ্ঠের ছলনাহীন সঙ্গীত আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে প্রেম।

আর এঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য শার্লোট ফন ষ্টাইন-এর নাম। তাঁর কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার প্রয়োজন হবে। গ্যেটের জীবনে ও সাহিত্যে তিনি অবিস্মরণীয়া। তিনি ছিলেন ভাইমারের অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষের পত্নী ও ডিউকমাতা আমেলিয়ার সহচরী। অসাধারণ সুন্দরী তিনি ছিলেন না—হীনদর্শনাও ছিলেন না। তাঁর মার্জিত রুচি, মিষ্ট আলাপ, সরল সংযত ব্যবহার, চিত্রাঙ্কনে ও সঙ্গীতে যোগ্যতা আর অনুপম নৃত্য সেই দিনে তাঁকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছিল। দরবারি আদব-কায়দা তাঁর কাছে থেকে কবি শিক্ষা করেন।—এঁদের ভিন্ন ডিউক-মাতার কারবরদার গল্পরসিক আইনৃজীডল আর মেজর ফন ক্নেবল্‌-এর নামও উল্লেখযোগ্য। আর, কিছু দিন পরে ভাইমার দরবার-সংশ্লিষ্ট যাজকের পদে আসেন স্বনামধন্য হের্ডর—অবশ্য গ্যেটের আগ্রহে।

কিন্তু এই রাজ দরবারের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ডিউক স্বয়ং। কার্যোদ্যমের সঙ্গে তাঁতে ছিল গুণের সমাদর আর দৃঢ়চিত্ততা। গ্যেটেকে রাজমন্ত্রীর পদে নিয়োগ ব্যাপারে তিনি এই মন্তব্য করেন :

ডক্টর গ্যেটেকে আমি যে লাভ করতে পেরেছি এজন্য সুধী ব্যক্তিরা আমাকে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা সুবিদিত।

> এইরূপ একজন ব্যক্তিকে যথাযোগ্য স্থানে নিয়োগ না করলে তাঁর অসাধারণ শক্তির অপব্যবহার করা হবে।...ডক্টর গ্যেটে কোনো নিম্নপদ থেকে আরম্ভ না করে প্রথমেই যে রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন এতে বাইরের জগৎ অপ্রসন্ন হতে পারে কিন্তু আমার দৃষ্টি সেদিকে নয়। আমি চাই—প্রত্যেক কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই তাই চান—নীরবে বাইরের জগতের প্রসন্নতার দিকে দৃষ্টি না রেখে এমন ভাবে কাজ করে যেতে যাতে ভগবানের ও আমার অন্তরাত্মার প্রীতি।

এরূপ গুণগ্রাহী প্রভুর অধীনে কবি যে কর্মভার গ্রহণ করতে পেরেছিলেন সেটি তাঁর সৌভাগ্যই বলতে হবে। তাই রাজদরবারের সঙ্গে দীর্ঘ সংস্রবে তাঁর প্রতিভা অপব্যয়িত হয় নি। রাজ-দরবারের কাজে তাঁর যে সময় ব্যয়িত হয়েছিল তার পরিবর্তে তিনি লাভ করেছিলেন জীবিকা; আর, আমরা পরে পরে দেখবো, ডিউকের আন্তরিক শ্রদ্ধা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার অগ্রগতির সহায় হয়েছিল।

রাজমন্ত্রী

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গ্যেটে ভাইমার-দরবারে এক নিম্ন মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন, তাঁর বার্ষিক বেতন নির্ধারিত হয় ১২০০ টালার-এ অর্থাৎ আনুমানিক ২০০ পাউণ্ডে। এ সম্বন্ধে ডিউক গ্যেটের পিতাকে লেখেন: যখন ইচ্ছা পদত্যাগ করবার অধিকার কবির রইল, এটি একটি বাহ্য নিদর্শন মাত্র, কবির প্রতি তাঁর স্নেহের পরিমাপ এ থেকে নয়; আরো লেখেন:

> এখানে গ্যেটের একটি মাত্র পদ, সেটি এই যে তিনি আমার বন্ধু, আর সবই তার নীচে।

কাজের প্রতি আগ্রহ কবির ভিতরে চিরদিনই প্রবল ছিল। রাজমন্ত্রীর কাজ তিনি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল এক অভূতপূর্ব সাফল্য তিনি জীবনে অর্জন করতে পারবেন। কবি কৃষি ও খনির ভার পান। এর পরে অর্থ-সচিব ও সমর-সচিবের পদও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাজ্যের আয় যাতে বৃদ্ধি পায় এই উদ্দেশ্যে ইলমেনাউ-এর খনিজ সম্পদ উদ্ধারের দিকে তিনি বিশেষ মন দেন। কৃষকদের আর্থিক উন্নতিও তাঁর গভীর চিন্তার বিষয় হয়। যে সমস্ত লোকহিতকর কর্মের প্রবর্তনা তাঁর দ্বারা হয়েছিল সে-সবের মধ্যে একটি ফায়ার-ব্রিগেড গঠন সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর এই সময়ের একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন:

> হে প্রতিদিনের উত্তম, দান কর
> বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ আনন্দ—জীবনের সুপরিণতি।
> শূন্যগর্ভ স্বপ্ন? নয় কখনো নয়!

রিক্ত শাখা—সে ত সাময়িক :
চাই পত্র-পুষ্প-ফল—
আমার সৃষ্টিধর্মের সার্থকতা ।

এই সব কাজ কবি এতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতো কাজই তাঁর স্বধর্ম, কবি-প্রতিভা তাঁর জন্য আকস্মিক।

শুধু রাজ্যের উন্নতির কাজে নয়, ভাইমারের রঙ্গমঞ্চের উন্নতিতেও তিনি বিশেষ মন দেন। তাঁর নিজের ও অপরের লেখা বহু নাটক প্রহসন রূপক নিয়মিতভাবে ভাইমারে অভিনীত হতে থাকে। প্রথম যুগে ডিউক, ডিউক-ভ্রাতা, গ্যেটে স্বয়ং এবং ভাইমার-দরবার-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এই সব নাটকে অভিনয় করতেন—এসবের দর্শকও ছিলেন দরবার-সম্পর্কিত লোকেরা।—কবির নূতন রচনার অধিকাংশেরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিত্তবিনোদন। সেজন্যে অনেকে দুঃখ করেছেন যে গোটের ভাইমার-বাসের প্রথম কয়েক বৎসর বৃথা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে লুইসের উক্তি সারগর্ভ :

> শুধু গ্রন্থের সংখ্যা বাড়িয়ে চলা গ্যেটের ধাতে ছিল না আদৌ। তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের আর লেখার।…কবিতা ছিল তাঁর সমগ্র জীবন-ব্যাপার থেকে উত্থিত সুরগ্রাম…এক প্রেরণার ব্যাপার—উদাত্ত ও গম্ভীর, মধুর ও উন্মাদনাময়, তীক্ষ্ণ ও ললিত সব আঘাতেই তাঁর জীবন-বীণা ঝঙ্কৃত হতো।…যাঁদের সৃষ্টি-শক্তি প্রচুর বহু তুচ্ছ সৃষ্টি না করে' তাঁদের উপায় নেই, যেমন গাছে সুপরিণত ফুলের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বহু বিফল কুঁড়ি।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার-এর রচনায় রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা তাঁর জন্য বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। আর তাঁর এই তথাকথিত ব্যর্থ যুগে তাঁর অমর নাটক 'ইফিগেনিয়া'র জন্ম।

সন্ধিকাল

সাধারণত গ্যেটের সাহিত্যিক জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ইতালি-যাত্রার পূর্বের জীবন আর ইতালি-যাত্রার পরের জীবন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাঁর জীবনের সন্ধিকাল তাঁর ভাইমার-বাসের প্রথম চার-পাঁচ বৎসর। ইতালি-বাসের পরে তাঁর জীবন যে সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করেছিল তার সূচনা তাঁর উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ ইফিগেনিয়া রচনা-কালে। ইফিগেনিয়া নাটক অবশ্য তার বর্তমান রূপ পায় ইতালিতে, কিন্তু লুইস-প্রমুখ আলোচকরা বলেছেন সে-রূপ দেখার জন্য

তাঁকে বেগ পেতে হয়নি।—এই মতের সপক্ষের যুক্তিগুলো একটু গুছিয়ে বলা যেতে পারে এই ভাবে:

প্রথমত, এই কালেই তাঁর মনোভাবে ও ব্যবহারে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিন তাঁতে ছিল অপরিসীম উচ্ছ্বাস, অতি সহজেই অপরকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু তাঁর ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বেই তিনি অনেকখানি নির্জনতা-প্রিয় হয়ে ওঠেন—এই নির্জন-বাসে চলতো তাঁর সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সাধনা। তাঁর এমন পরিবর্তনের একটি বিশেষ কারণের কথা ব্রাণ্ডেস উল্লেখ করেছেন। ভাইমারে তিনি রাজমন্ত্রী হয়েছেন দেখে তাঁর 'ঝড়-ঝাপটা'র বন্ধুদল একে একে ভাইমারে এসে হাজির হলেন, উদ্দেশ্য, পুরাতন বন্ধুর সহায়তায় তাঁদের ভাগ্যও যদি সুপ্রসন্ন হয়। কিন্তু তাঁদের অদ্ভুত দায়িত্বহীন ব্যবহারে গ্যেটে বিব্রত হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য, তাঁদের যথাসম্ভব সসম্মান ভাইমার-ত্যাগের ব্যবস্থা কবি ও ডিউক করেছিলেন। কিন্তু এর পরে বন্ধুকে আলিঙ্গন করবার জন্য তাঁর সদাপ্রসারিত বাহু যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে তা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, ইলমেনাউ-এর খনির উৎকর্ষের ভার যে তিনি নিয়েছিলেন এই কাজ ভাল ভাবে করার জন্য তিনি রসায়ন অধ্যয়নে মন দেন। কৃষির উন্নতির কথা ভাবতে গিয়ে উদ্ভিদ-তত্ত্ব ভূতত্ত্ব এসব অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। এই বিজ্ঞান-চর্চার ফলে কিছু কিছু নূতন আবিষ্কার তিনি করেন বহু পরে, কিন্তু তাঁর এই নূতন বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁর জীবন ও প্রতিভায় যে একটা নূতন পর্যায়ের নির্দেশ করছে তা যথার্থ। *

তৃতীয়ত, এই কালেই শার্লোট ফন ষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির যোগ স্থাপিত হয়। বিজ্ঞান সাধনা যেমন তাঁর বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে দেয় তেমনি

---

† এই কালে কবির পর্যবেক্ষণ-শক্তি কত উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার পরিচয় রয়েছে নিম্নবর্ণিত গল্পটিতে,—গল্পের বক্তা গ্যেটের জনৈক পুরাতন ভৃত্য, শ্রোতা একেরমান:

একদিন রাত দুপুরে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রভু আমাকে ডাকলেন। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি তাঁর লোহার খাট সরিয়ে নিয়েছেন জানালার পাশে আর চেয়ে রয়েছেন আকাশের পানে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আকাশে কিছু লক্ষ্য করছ? আমি বল্লাম: না। তিনি আমাকে প্রহরীর কাছে পাঠালেন সে কিছু লক্ষ্য করেছে কিনা জানতে। আমি তার কাছে শুনে এসে বল্লাম সেও কিছু দেখেনি। প্রভু তখনো তেমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন; বল্লেন, শোনো, এ খুব একটা সময়, কোনোখানে এখন ভূমিকম্প হচ্ছে অথবা এখনই হবে। তিনি......আমাকে তাঁর বিছানায় বসিয়ে দেখিয়ে দিলেন কি কি লক্ষণ দেখে তিনি একথা বুঝলেন।

সেদিন আকাশ ছিল মেঘলা, বাতাস ছিলনা আদৌ, সব থমথম, আর গরমও পড়েছিল খুব। কয়েক দিন পরে জানা গেল সেই রাত্রে মেসিনা-র (Messina) এক অংশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

শার্লোটের প্রীতি সংযম ও সুরুচি তাঁর অনুভূতি ও কল্পনাকে মহত্তর লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে। শার্লোটের উদ্দেশে লেখা তাঁর একটি কবিতা এই :

বল মোরে কি চলেছে ভাগ্যের মন্ত্রণা ?
বল মোরে কেন দোঁহে মিলেছি এমন ?
পূর্বজন্মে ছিলে কিগো সহোদরা মোর ?
কিংবা জায়া পরমকাঙ্ক্ষিতা ?
জান তুমি সব মোর, জান তুমি
প্রতি তন্ত্রী মম ; পড়ে ফেল মুহূর্তকে
মোর যত কথা—কেহ কভু পারেনি এমন,
না পারিবে কেহ তোমা পরে।
তুমি পার প্রশমিতে মোর রক্ত-দাহ
তুমি পার দেখাইতে মহত্তর পথ
মোর মুগ্ধ মতি হতে। শরণ লভিনু যবে
তোমার পবিত্র বাহু-ডোরে—
শান্তি নামি এল মোর বুকে।

উচ্ছ্বাসকে যদি জ্ঞান করা যায় গ্যেটের প্রথম জীবনের পরিচয়-চিহ্ন, আর প্রশান্তিকে যদি জ্ঞান করা যায় তাঁর পরিণত বয়সের পরিচয়-চিহ্ন তবে সেই প্রশান্তির সূচনা তাঁর ইফিগেনিয়া রচনা-কালে। ইতালিতে এই প্রশান্তির স্থায়িত্ব-লাভ।

নব চেতনা

কবি তাঁর ত্রিংশৎ জন্মদিনের (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) ডায়ারিতে লেখেন :

সব গোছানো হলো : কাগজপত্রগুলো পড়লাম, টুক্‌রাটাক্‌রা কাগজ পুড়িয়ে ফেলা হলো। নতুন কাল নতুন চিন্তা। কেমন ভাবে এতদিন কেটেছে ভাবলাম, খেয়ালের বাড়াবাড়ি, আবেগ, উন্মাদনা, তীব্র কামনা—এসব প্রবল হয়েছে সর্বত্র ; আমি খুশী হয়েছি সেইসব নিয়ে যা রহস্যময় আর কাল্পনিক ; বিজ্ঞানকে ধরেছি শিথিল হস্তে, তাই তার সঙ্গে যোগ ঘটেনি, যা কিছু লিখেছি তাতে রয়েছে এক ভব্য আত্মতৃপ্তি ; অপার্থিব ও পার্থিব ব্যাপারে দৃষ্টিতে আমার কত সংকীর্ণতা ; কত দিন কেটে গেছে ভাববিলাসে আর অসার হৃদয়াবেগে ; কত কম ফল পেয়েছি সেসব থেকে ; জীবনের অর্ধেক কেটে গেল কিন্তু জীবন-পথে একটুও এগোনো হয় নি, আজ যেন নিজেকে দেখছি জাহাজডুবি থেকে উদ্ধার

পাওয়া মানুষের মতো—তরঙ্গের সঙ্গে যোঝাযুঝির পালা তার শেষ হয়েছে, এখন সে নিজেকে মেলে ধরেছে করুণাময় সূর্যের কিরণে. ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে আরম্ভ করে' এ পর্যন্ত যে সময়টা আমার গেছে তার দিকে চাইতে ভয় হয়। ভগবান আরো সাহায্য করুন, আরো আলো দিন যেন আমিই আমার প্রতিবন্ধক না হই, যেন প্রতিদিনের কাজ বুঝে করতে পারি ও জ্ঞান নির্মল হয়; যেন আমার দশা তাদের মতো না হয় যাদের দিন কাটে মাথা-ব্যথায় আর রাত কাটে মদ খাওয়ায় যা থেকে জন্মে এই মাথাব্যথা।

লাফাটরকে লেখা তাঁর একালের (সেপ্টেম্বর : ১৭৮০) একখানি পত্র এই :

আমার প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন আমার জন্য হয়ে চলেছে সহজসাধ্য ও কঠোর—আমার জাগরণ ও স্বপ্ন পরিপূরিত হচ্ছে তার দ্বারা। এই কাজ প্রতিদিন আমার প্রিয়তর হচ্ছে; আমার এই স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠদের সমতুল্য হব এই আমার কামনা। আমার জীবনের এই যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এরই উপরে গঠিত হবে আমার জীবন-পিরামিড, উর্ধ্ব আকাশে উঠবে তার মাথা—এই চিন্তায় তলিয়ে যাচ্ছে আমার আর সব চিন্তা—এ থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। বেশী দেরীও আর করা যাবে না; বয়স যথেষ্ট হয়েছে, হয়ত আয়োজনের মাঝখানেই মৃত্যু এসে হাজির হবে—আমার বাবিলন-টাওয়ার পড়ে রইবে অসম্পূর্ণ। তাহলেও লোকে দেখবে পরিকল্পনা যা করা হয়েছিল তা বিরাট, আর যদি বাঁচি তবে ভগবৎপ্রসাদাৎ আমার শক্তিসামর্থ্য পূর্ণতা লাভ করবে। শার্লোট ফন্ ষ্টাইন তাঁর ভালবাসার দ্বারা আমার জীবনকে যে অভিষিক্ত করছেন এটি হয়েছে আমার জন্য যেন এক দৈব কবচ। ধীরে ধীরে তিনি দখল করেছেন আমার মাতার, ভগিনীর ও পূর্ব-প্রেমপাত্রীদের আসন, আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে তা স্বভাবের বন্ধনের মতো দৃঢ় ও অকৃত্রিম।

ডিউকেও তিনি এই কালে লেখেন :

লোকে কি বলবে সে কথা না ভেবে আমি আশ্রয় নিচ্ছি আমার পুরাতন কবিত্ব-দুর্গে আর খেটে যাচ্ছি আমার 'ইফিগেনিয়া' নিয়ে। এই থেকে বুঝতে পারছি আমার ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহার করে' এসেছি। এখনো সময় আছে ও প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে মিতব্যয়ী হবার যদি ভাল-কিছু লিখবার ইচ্ছা আমার থাকে।

এ সবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'ঝড়-ঝাপটা'র ভাবের তিরোধান আর এক নব

চেতনার আরম্ভ। কবির এই নব চেতনার প্রতীক 'ইফিগেনিয়া' গদ্যে লেখা হয়েছিল; তখন সংস্কার দাঁড়িয়েছিল যে গদ্য স্বাভাবিক আর পদ্য অস্বাভাবিক। তবে বিষয়-বস্তুর গুণে গোটের এই গদ্যও ছিল কবিত্বধর্মী তাই সহজেই কবিতায় রূপান্তরিত হতে পেরেছিল!

ইফিগেনিয়া

গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেস ইফিগেনিয়ার কাহিনী অবলম্বনে দুইখানি নাটক রচনা করেন। ইফিগেনিয়া গ্রীকরাজ আগামেমনন-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। ট্রয় বিজয়ের জন্য গ্রীক-বাহিনী যখন যাত্রা শুরু করে তখন দিয়ানা দেবীর কোপে তাদের যান অচল হয়ে পড়ে। দৈববাণীতে জানা যায় আগামেমননের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইফিগেনিয়াকে বলি দিলে তবে দেবী প্রসন্না হবেন। আগামেমননের আদেশে ইফিগেনিয়াকে কৌশলে তার মাতার নিকট থেকে নিয়ে এসে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করা হয় কিন্তু তার উপরে খড়্গাঘাতের সময়ে দিয়ানা (Diana) দেবী তাকে মেঘের আবরণে তুলে নেন, ও খড়্গাঘাতের পরে দেখা যায় এক সুদর্শন হরিণী দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। এইটি এউরিপিদেসের প্রথম নাটকের বিষয়। দিয়ানা দেবী মেঘের আবরণে ইফিগেনিয়াকে তুলে নিয়ে বর্বর সিথিয়া-দেশে তাঁর মন্দিরের পূজারিণী রূপে নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে ইফিগেনিয়া পরে কৌশলে মুক্তিলাভ করে। এইটি এউরিপিদেসের দ্বিতীয় নাটকের বিষয়, এবং গ্যেটে এইটি অবলম্বন করেই তাঁর নাটক রচনা করেন। কিন্তু এউরিপিদেসের একান্ত অনুবর্তী তিনি হন নি, বরং এউরিপিদেসের পরিকল্পনা থেকে তাঁর পরিকল্পনা বেশ স্বতন্ত্র; আর তাঁর নাটকের মূল্য ও মর্যাদাও তাই থেকে। এউরিপিদেসের ইফিগেনিয়া তার বিদেশ-বাসের জন্য দুঃখিতচিত্ত। এই দেশে নিয়ম ছিল কোনো বিদেশী এখানে উপস্থিত হলে তাকে দিয়ানা দেবীর মন্দিরে বলি দেওয়া হ'তো। একদিন দুই গ্রীক যুবক সমুদ্রতীরে ধৃত হয়ে বলিরূপে মন্দিরে প্রেরিত হলো। কথায় কথায় ইফিগেনিয়া জানতে পারে এই দুই যুবকের একজন তার ভাই ওরেস্তেস অপরজন তার ভাইয়ের বন্ধু পিলাদেস, এরা দেবতার আদেশে এই দ্বীপে এসেছে দিয়ানার বিগ্রহ অপহরণ করতে। এদের কাছ থেকে ইফিগেনিয়া তার মাতার হস্তে পিতার নিধন আর ওরেস্তেসের হাতে তার মাতার নিধনের কথা জানতে পারে। এই মাতৃহত্যার দৈবশাস্তি থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে দিয়ানা দেবীর বিগ্রহ এই দ্বীপ থেকে গ্রীসে নিয়ে যাওয়া। ইফিগেনিয়া এদের সাহায্য করতে স্বীকৃত হয় ও দিয়ানার বিগ্রহ সমেত এদেশ থেকে কৌশলে পলায়ন করে মিনার্ভা দেবীর আনুকূল্যে। কিন্তু

গ্যেটের ইফিগেনিয়া অতিশয় পবিত্রচিত্তা। তার ভাইয়ের ও ভাইয়ের বন্ধুর বিপদের কথা জানতে পেরে প্রথমে ছলনার আশ্রয় নিয়ে এদের সাহায্য করতে সে সংকল্প করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছলনা তার জন্য দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সে অকপটে সব কথ এদেশের রাজার কাছে ব্যক্ত করে ও তার ভাই, তার ভাইয়ের বন্ধু ও তার নিজের মুক্তি প্রার্থনা করে। তার অকপটতায় ও সৌহার্দ্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা এদের মুক্তি দেয়।

এই নাটক গ্যেটের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্যতম। এর একটু বিস্তৃত পরিচয় এই :

নাটকটি পঞ্চাঙ্ক, কিন্তু তেমন বড় নয়। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানে ইফিগেনিয়ার স্বগতোক্তি—সরল গম্ভীর ছন্দে উদ্‌গীত হয়েছে জন্মভূমি ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদজনিত তার দুঃখ, এই দুঃখের বা শান্ত বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে সমস্ত নাটকখানির উপরে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মন্দিররক্ষী আর্কাস ইফিগেনিয়াকে সংবাদ দিচ্ছে যে রাজা থোয়াস আসছে। ইফিগেনিয়া যে তাদের এত আদর যত্ন সত্ত্বেও বিষণ্ণ মনে দিন কাটায় এজন্য সে দুঃখ করছে ; ইফিগেনিয়াকে সে বোঝাচ্ছে যে রাজার প্রতি সদয় ব্যবহার করা তার উচিত, নইলে রাজা ক্রুদ্ধ হতে পারে। রাজা এখন নিঃসন্তান ; সে যে ইফিগেনিয়াকে বিবাহ করতে চায় ও ইফিগেনিয়া তাতে অসম্মত সে কথাও প্রকাশ পায়। তৃতীয় দৃশ্যে ইফিগেনিয়া ও থোয়াসের কথোপকথন। ইফিগেনিয়া রাজার সমৃদ্ধি কামনা করে ; রাজা তার নিঃসন্তান নিরানন্দ জীবনের কথা বলে ও ইফিগেনিয়ার পাণি প্রার্থনা করে ; ইফিগেনিয়া যে আজো তার পরিচয় দেয় নি এজন্য রাজা অভিযোগ করে। ধীরে ধীরে ইফিগেনিয়া তার পূর্বপুরুষদের কথা বলে। দেবতাদের এক সময়ের প্রিয় ট্যানটেলাস-এর বংশে তার জন্ম। দেবতাদের কোপে ট্যানটেলাস ও তার বংশধরগণ যে উন্মত্ত হৃদয়াবেগ ও তার ফলস্বরূপ জিঘাংসা স্বৈরতা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তার ভয়াবহ কাহিনী শুনতে শুনতে থোয়াস বলে—এমন নৃশংস কুলে ইফিগেনিয়ার জন্ম কেমন করে' সম্ভবপর হলো ! ইফিগেনিয়ার পিতা গ্রীক-রাজ আগামেমনন ট্রয়-যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্কালে কেমন করে' দিয়ানা দেবীর আদেশে তাকে বলি দেবার আয়োজন করেন, ও দেবী স্বয়ং কেমন করে' তাকে মেঘের আবরণে তুলে নিয়ে সিথিয়া-দেশে আনেন সবই ইফিগেনিয়া বিবৃত করে আর বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এই ব'লে যে দেবী তাকে যে পদে নিযুক্ত করেছেন তাতেই তার রত থাকা উচিত, তা ছাড়া দেবীর ইচ্ছায় পিতার কাছে ফিরে যেতেও সে পারে ; তার স্বদেশ গমনের ব্যবস্থা করতে রাজা থোয়াসকে সে অনুরোধ করে। থোয়াস ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীকৃত হয় কিন্তু জানায় যে ইফিগেনিয়ার মায়ায় অভিভূত হয়ে—যে মায়ায় সে কখন অনুভব করেছে কন্যার মমতা কখনো বধূর নির্ভরতা—সে যে এতদিন নরবলি বন্ধ রেখেছিল তার অবসান হলো, দুইজন আগন্তুক শীগ্‌গিরই বলিরূপে প্রেরিত হচ্ছে। ইফিগেনিয়া বলে :

নররক্ত দেবতারা চান না তাঁরা চান সেবা—তার নিজের উদ্ধারে রয়েছে তার প্রমাণ, কিন্তু থোয়াস সে কথায় কর্ণপাত করে না।†

দ্বিতীয় অঙ্কের দুইটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে ওরেস্‌তেস ও পিলাদেস তাদের বর্তমান বন্দী-দশা সম্বন্ধে আলোচনা করছে। ওরেস্‌তেস তার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করে' বিষণ্ণ ও এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। যে স্মৃতি তার অন্তরে এই দুঃখের সঞ্চার করেছে তা এই: সে আগামেমননের একমাত্র পুত্র, আগামেমনন যে কৌশলে তাঁর কন্যা ইফিগেনিয়াকে তার মাতার কাছ থেকে নিয়ে এসে বধ করেন—তার মাতার এই ধারণাই হয়েছিল—এজন্য তার মাতা ক্লিতেম্‌নেস্ত্রা তার পিতাকে ক্ষমা করতে পারেন না; দীর্ঘ দিন পরে আগামেমনন ট্রয় থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে এগেস্‌থেস নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় তাঁর পত্নী তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন ও এগেস্‌থেসকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে' রাজ্য ভোগ করতে থাকেন। এ সময়ে ওরেসতেস বালক, তার দ্বিতীয়া ভগিনী এলেক্‌ত্রা তাকে এক জ্ঞাতির বাড়ীতে লুকিয়ে মানুষ করে, আর ওরেস্‌তেস বড় হলে তাকে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করে। ওরেস্‌তেস তার মাতাকে বধ করে কিন্তু বধ করেই এরিনিয়েস (Erinyes) বা 'ফিউরি'দের (নিকট-আত্মীয়ের প্রেতাত্মার) নিষ্ঠুর তাড়না ভোগ করতে আরম্ভ করে; আপোলো-দেবের স্থানে জানা যায় যে যদি ভগিনীকে সে বর্বর সিথিয়া-দেশ থেকে আনতে পারে তবে তার শাস্তি ভোগের অবসান হবে। আপোলের ভগিনী দিয়ানা দেবীর বিগ্রহ নিয়ে যেতেই তার ও তার বন্ধুর এই দ্বীপে আগমন।—ওরেস্‌তেস মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'লেও পিলাদেস আদৌ নয়। সে ভাবছে তারা কেমন করে' এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে, তাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। ওরেস্‌তেসকে সে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করছে। কথায় কথায় তাদের তরুণ জীবনের আশা-উদ্দীপনা-ভরা দিনগুলোর ছবি তাদের মনে ভেসে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ওরেস্‌তেস বলছে:

কীর্তি সুমহান!

ছিল একদিন রঙীন কল্পনা যবে দিত উজলিয়া
আমাদের কিশোর অন্তর। ফিরিতাম পর্বতে কান্তারে
মৃগয়ার অন্বেষণে, উপজিত মনে, কেমনে অচিরে

† দেবতাদের সম্বন্ধে এমন ধারণা গ্রীকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। এউরিপিদেসের "হেরাক্লেস" নাটকের এই উক্তিটি বিখ্যাত:

বলো না স্বর্গে আছে স্বৈরাচারীর দল,
অথবা বন্ধনকারী ও বন্দী দেব-সমাজ। বহু পূর্বে
আমার মন জেনেছে এসব মিথ্যা বলে'—বদলাবে না সে ধারণা।
ঈশ্বর যদি ঈশ্বর হন তবে সব অভাব থেকে মুক্ত তিনি, এসব কথকদের
কষ্টকল্পিত কাহিনী।

—(Ency Brit দ্রষ্টব্য।)

শস্ত্রপাণি, পিতৃপিতামহ-সম শান্তির তস্করে
কিংবা রক্ষ ভয়ঙ্কর পশি তার গেহে। দিবা অবসানে
বসিতাম দোঁহে, ভর করি দোঁহা অঙ্গ, সমুদ্র-সৈকতে।
তরঙ্গ আসিত নাচি স্পর্শিতে চরণ। এই বসুন্ধরা
বিপুল রাজিত চোখে। সহসা ধরিত অসি দৃঢ়হস্ত,
কীর্তি হেরিতাম—নক্ষত্রনিকর যেন নিশীথ-গগনে!

কিন্তু পিলাদেস বহু চেষ্টা করেও ওরেস্‌তেসের বিষণ্ণতা দূর করতে পারে না। দ্বিতীয় দৃশ্যে ইফিগেনিয়া পিলাদেসের কাছে জানতে পারে ট্রয়যুদ্ধের শেষে তার পিতার প্রত্যাবর্তন ও তাঁর মাতার হস্তে তাঁর নৃশংস নিধন। ইফিগেনিয়া বিহ্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে ইফিগেনিয়া ও ওরেস্‌তেসের কথোপকথন। ওরেস্‌তেসের মুখে সে জানতে পারে তাদের পরিবারের অবশিষ্ট কাহিনী অর্থাৎ ওরেস্‌তেসের মাতৃহত্যা ও প্রেতাত্মার নিদারুণ তাড়না ভোগ। ওরেস্‌তেস নিজের পরিচয় আর ইফিগেনিয়ার কাছে গোপন রাখে না। ইফিগেনিয়াও নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু ওরেস্‌তেসের যে ধারণা যে ধ্বংসই তার ভাগ্য তা থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে না। দ্বিতীয় দৃশ্যে ওরেস্‌তেসকে দেখা যায় অপ্রকৃতিস্থ। সে তার চোখের সামনে দেখেছে তার পূর্বপুরুষদের প্রীতিপূর্ণ সম্মেলন যদিও জীবনে তাঁদের. কেউ কেউ একে অন্যকে হত্যা করেছিলেন। সেই সম্মেলনে যোগদানের জন্য ওরেস্‌তেস ব্যাকুল। তৃতীয় দৃশ্যে ওরেস্‌তেস ইফিগেনিয়া ও পিলাদেসের মিলন। ইফিগেনিয়া দিয়ানা দেবীর কাছে প্রার্থনা করছে তার ভাইয়ের আপৎ-শান্তির জন্য। তার প্রার্থনায় (অথবা ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে ?) ওরেস্‌তেস তার পূর্ব সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে ও অনুভব করছে ট্যানটেলাসের বংশের উপরে যে অভিশাপ ছিল তার মোচন হয়েছে—প্রসন্ন জীবন এখন তার সামনে। পিলাদেস ভাবছে অনুকূল বাতাসে কত শীগ্‌গির সিথিয়া ত্যাগ করা যাবে।

চতুর্থ অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে ইফিগেনিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে ওরেস্‌তেস ও পিলাদেসের নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তনের জন্য। এই কাজে তাকে সাহায্য করতে হবে ছলনার আশ্রয় নিয়ে, তাতে তার মনে অস্বস্তি জেগেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ইফিগেনিয়া ও মন্দিররক্ষী আর্কাসের কথোপকথন। রাজা ও জনগণ বলির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে এই সংবাদ সে এনেছে। ইফিগেনিয়া তাকে জানাচ্ছে যে অশুচি বিদেশীর স্পর্শে বিগ্রহ অশুচি হয়েছে, সেইজন্যে সমুদ্রজলে বিগ্রহ ধৌত করতে হবে, আর সেই ধৌতি-ক্রিয়া মন্দিরের কুমারী পূজারিণীরা ভিন্ন আর কেউ দর্শন করতে পারবে না। রাজাকে এ সংবাদ দিতে যাবার পূর্বে আর্কাস পুনরায় ইফিগেনিয়াকে অনুরোধ জানাচ্ছে তার মত পরিবর্তনের জন্য, অর্থাৎ রাজা থোয়াসকে বিবাহ করতে

সম্মত হতে। সে বলছে : ইফিগেনিয়ার যত্নে এই বর্বর সিথিয়া-দেশ নরবলির কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েছে, বিদেশীর মুখের পানে সহজ প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইতে শিখেছে, এই সৌভাগ্য থেকে তাকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। কিন্তু ইফিগেনিয়ার বিতৃষ্ণা পরিবর্তিত হ'ল না। আর্কাস এই বলে' বিদায় নিচ্ছে যে ইফিগেনিয়ার প্রতি ব্যবহারে রাজা থোয়াস এ পর্যন্ত যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা যেন ইফিগেনিয়ার চিত্তে পরিম্লান না হয়! তৃতীয় দৃশ্যে ইফিগেনিয়ার স্বগতোক্তি। আর্কাসের শেষ কথা তার অন্তর স্পর্শ করেছে। সে বলছে :

> ভাইয়ের মুক্তি-চিন্তা আমার হৃদয়-মন অধিকার করেছিল, সেই ভাইয়ের বন্ধুর পরামর্শ আমি কানে তুলে নিয়েছিলাম; পরিত্যক্ত সিথিয়া-দেশের পানে চেয়েছিলাম নাবিক যেমন তাকিয়ে দেখে পরিত্যক্ত দ্বীপ। কিন্তু বিশ্বাসী আর্কাসের বাণী আমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে, দেখছি যাদের ত্যাগ করে' যাচ্ছি তারাও মানুষ। প্রতারণা এবার দ্বিগুণ ঘৃণিত হ'য়ে উঠ্‌লো। হে আমার হৃদয়, শান্ত হও! এখন কি তোমার দোলায়িত হবার কাল এসেছে! যেখানে তোমার আশ্রয় সেই দৃঢ়ভূমি ত্যাগ করে' বরণ করবে তুমি তরঙ্গের বিক্ষোভ! নিজেকে আর চিনবে না, জগৎকেও না?

চতুর্থ দৃশ্যে ইফিগেনিয়া ও পিলাদেসের তর্ক। ইফিগেনিয়ার অন্তরে নৈতিক সংগ্রাম প্রবল হয়ে উঠেছে। পিলাদেস তাকে নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছে, ছলনার আশ্রয় না নিয়ে তাদের উপায় নেই, না নিলে যে অনর্থ ঘটবে তা ইফিগেনিয়ার চিরদুঃখের কারণ হবে। এই দৃশ্যে পিলাদেসের এই উক্তি বিখ্যাত :

> কি নিজেকে কি অপরকে কড়া ভাবে বিচার করতে আমরা পারি না—এই-ই জীবনের শিক্ষা, তোমারও এই শিক্ষা হবে। মানবজাতি এমন ভাবে গঠিত, এত বিচিত্র বন্ধনে বদ্ধ, যে, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও স্ববিরোধিতাহীন হওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজেদের কাজের বিচার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়; এগিয়ে যাওয়া আর সেই এগিয়ে যাবার পথ পরিষ্কার রাখা, এই-ই প্রত্যেকের সব চেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, কেননা যা ক'রে ফেলা হয়েছে যথাযথ ভাবে তার বিচার করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে, আর সে বর্তমানে যা করছে তা বিচার করার অবসর তার কোথায়।

এই দৃশ্যে ইফিগেনিয়ার কয়েকটি উক্তিও সুগভীর। পিলাদেসের নিপুণ যুক্তির উত্তরে সে বলছে :

> তর্ক করবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি শুধু অনুভব করতে পারি।

অন্যত্র বলছে :

> হায়, আমার মধ্যে যদি পুরুষের অন্তর থাকতো ! পুরুষের অন্তরে যখন কোনো সংকল্প প্রবল হয় তখন আর কোনো বাণী তাতে প্রবেশপথ পায় না ।

পঞ্চম দৃশ্যে ইফিগেনিয়া তার বর্তমান দুঃখময় দশার কথা ভাবছে । দেবতাদের কাছে সে প্রার্থনা করছে যেন দেবতাদের আজ্ঞাধীন সে থাকে, দেববিদ্রোহ যেন তাতে না জাগে । এই সূত্রে তার মনে পড়ছে একটি ছেলেবেলার গান—তার ধাত্রী গাইত—তার প্রথম কলি এই :

> অমরদের ভয় কোরো
> হে মানুষের সন্তান !
> চিরন্তন শাসন-ক্ষমতা
> বিধৃত তাঁদের হস্তে ;
> তাঁদের বিরাট রাজ্যে
> একচ্ছত্র তাঁদের প্রতাপ ।

পঞ্চম অঙ্কের ছয়টি দৃশ্য । প্রথম দৃশ্যে আর্কাস রাজাকে প্রতারণার ইঙ্গিত দিচ্ছে । রাজা কড়া পাহারার আদেশ দিচ্ছে ও ইফিগেনিয়াকে ডেকে পাঠাচ্ছে । দ্বিতীয় দৃশ্যে থোয়াসের স্বগতোক্তি । ইফিগেনিয়ার প্রতি তার সদয় ব্যবহারের এই পরিণতি দেখে সে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ । তৃতীয় দৃশ্যে ইফিগেনিয়া ও রাজা থোয়াসের বোঝাপড়া হচ্ছে । রাজা সুপ্রাচীন রীতির অজুহাত তুলে আগন্তুকদের বলি দাবি করছে ; ইফিগেনিয়া উত্তর দিচ্ছে : প্রাচীনতর রীতি এই যে প্রত্যেক বিদেশীই পবিত্র ন্যাস । রাজা বলছে, এই বিদেশীরা হয়ত ইফিগেনিয়ার আপনার জন, সেজন্যে তার অন্তরে এমন অন্যায় সহানুভূতি জেগেছে ; ইফিগেনিয়া বলছে, তাকেও একদিন উদ্যত ছুরিকা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল, আর দেবতার কৃপায় সে রক্ষা পেয়েছিল, সেই সমভাগ্য তাকে বুঝিয়েছে এদের ভাগ্যের ভীষণতা ও করুণার প্রয়োজনীয়তা । অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ইফিগেনিয়া তার হৃদয় অনাবৃত করে’ চলেছে ; নারীর সম্বল অস্ত্র নয়, নারীর সম্বল প্রার্থনা ও বাণী কিন্তু সেই বাণী মহত্তের সমাদরের যোগ্য—তার এই সব কথায় থোয়াসের চিত্ত অনেকখানি দ্রব হলো । শেষে ইফিগেনিয়া ব্যক্ত করলে, এই বিদেশীদের একজন তার ভাই অপর জন তার ভাইয়ের বন্ধু : এদের উদ্ধারের ও দিয়ানা দেবীর বিগ্রহ অপসারণের যে সব চক্রান্ত হয়েছে সবই সে অকপটে প্রকাশ করলে ও বললে,—হত্যাই যদি রাজার অভিপ্রেত হয় তবে তাকে (ইফিগেনিয়াকে) আগে হত্যা করা হোক কেননা তার ভাই ও ভাইয়ের বন্ধুকে সে-ই সত্যের অনুরোধে

সমূহ বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ইফিগেনিয়ার অকপটতায় ও অনুনয়ে রাজার মন আরো দ্রব হলো। থোয়াস বলছে :

আগুন যেমন ফোঁস ফোঁস করতে করতে অগ্রসর হয় তার শত্রু জলকে জয় করতে, তোমার বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ তেম্‌নিভাবে সংগ্রাম করছে।

চতুর্থ দৃশ্যে ওরেসতেস ইফিগেনিয়া ও থোয়াসের সমুদ্রতীরে মিলন। ওরেসতেস ও থোয়াস দু'জনেরই হাত তরবারির উপরে। ইফিগেনিয়া ওরেস্‌তেসকে বলছে শান্ত হয়ে শুনতে। পঞ্চম দৃশ্যে পিলাদেস ও আর্কাসের প্রবেশ। যুদ্ধে যে গ্রীকদের হার হয়েছে তা জানা গেল। রাজা আদেশ দিচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও দুই পক্ষের শান্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালাতে। ষষ্ঠ দৃশ্যে থোয়াস জানতে চাচ্ছে ওরেসতেস বাস্তবিকই আগামেমননের পুত্র কিনা। ওরেসতেস তার দীর্ঘ তরবারি দেখিয়ে বলছে এটি তার পূর্বপুরুষের, এর বলে সে অজেয়, বিপক্ষের যে কেউ তার কথার সত্যতা পরীক্ষা করে' দেখতে পারে। রাজা নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হলো। ইফিগেনিয়া এই রক্তপাত থেকে তাদের নিবৃত্ত করছে, তার উক্তির একটি অংশ এই—

ক্ষণিক যুদ্ধে মানুষ হয় অমর,
হয় মৃত্যুর কবলিত, অমর হয় তার যশ।
কিন্তু গণনা করে না কেউ ঝরে যত অশ্রু
ব্যথিত নিরানন্দ নারীর চোখে।

ওরেসতেস যে বাস্তবিকই আগামেমননের পুত্র তার কতকগুলো অভ্রান্ত দৈহিক লক্ষণ সে সবাইকে দেখিয়ে দিলে। রাজা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে কিন্তু বল্লে, সুসভ্য গ্রীকরা চিরদিন অসভ্যদের ধনসম্পদ ও কন্যা অপহরণ করে আসছে, অসভ্যদের দেববিগ্রহও যে তারা নিয়ে যাবে এ অসহ্য। সে বেঁকে দাঁড়ালো। তখন ওরেসতেস বল্লে : দেবতার আদেশ তারা এতদিন ভুল বুঝেছে; আপোলো-দেবের আদেশ— সিথিয়া-রাজ্যে ভগিনী বাস করছে অনিচ্ছুক হয়ে তাকে গ্রীসে ফিরিয়ে আনলে হবে শাপ মোচন—এখানে বাস্তবিকই আপোলো-দেবের ভগিনী দিয়ানা দেবীর কথা বলা হয় নি বলা হয়েছে আমার ভগিনী ইফিগেনিয়ার কথা যার স্পর্শে আমি শাপমুক্ত হয়ে মনের আনন্দ ফিরে পেয়েছি, যার পবিত্র প্রভাবে আমাদের বংশ তার আদিম শাপ থেকে মুক্ত হবে। সে তার বক্তব্য শেষ করছে এই বলে :

কূটবুদ্ধি ও বল—নরের গর্বের সামগ্রী—
এই নারীর পূর্ণ সত্যের সম্মুখে দীপ্তিহীন।
শিশুর মতো এমন পবিত্র নির্ভরতা
মহত্তের কাছে কামনা করে যোগ্য প্রতিদান।

রাজা এদের মুক্তি দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু ইফিগেনিয়া বলে—এমন অপ্রসন্ন সম্মতি নয়, সে চায় প্রসন্ন সম্মতি ও আশীর্বাদ। যে প্রীতি ও স্নেহ এতদিন সে ভোগ করেছে এই বিদায়ের ক্ষণে তা অটুট থাকুক যাতে পিতৃপ্রতিম রাজা থোয়াসের স্মৃতি তার জন্য হবে চির-অম্লান :

তাতে আমাদের পালে মধুরতর হাওয়া লাগ্‌বে
আর আমাদের আঁখি হতে ঝরবে
প্রসন্ন বিদায়-ব্যথার অশ্রু ; কল্যাণ হোক তোমার।
মিলুক আমাদের দুইজনের হাত
প্রাচীন বন্ধুত্বের স্মরণে।

রাজা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন : কল্যাণ হোক তোমার।

সমালোচকরা এই নাটকের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। এর প্রত্যেকটি চরিত্র ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, আর সমস্ত নাটকখানিতে ভাবের যে অখণ্ডতা প্রকাশ পেয়েছে তা অপূর্ব। লুইস বলেন : উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই এর সামনে সম্ভবপর নয়, এটি ঠিক নাটক নয় নাট্যকাব্য, এতে প্রকট হয়েছে নৈতিক সংগ্রাম, গ্রীক ভাস্কর্যের যে প্রশান্তি তাতে মণ্ডিত এর সর্ব অঙ্গ। ক্রোচে বলেন :

> ইফিগেনিয়াকে বলা যেতে পারে "শাশ্বতী নারী" যার প্রকাশ তাস্‌সোর রাজকুমারীতে ঘটেছে আর শেষে ঘটেছে ফাউস্‌টের অন্তিমে ; এই "শাশ্বতী নারী" নারীসুলভ দুর্বলতা বা মনোহারিতা নয়, এটি পূর্ণ নৈতিক শক্তি মানুষের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির উপরে যার প্রভাব অবিসংবাদিত। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়ে বলা যায় ইনি হচ্ছেন "মেরী মাতা," মানুষের পরিত্রাণের অংশভাগিনী, মানুষের অবশ্যপ্রয়োজনীয় প্রবল ইচ্ছাশক্তিই সেই পরিত্রাণের পক্ষে অনন্যনিরপেক্ষ অথবা অভ্রান্ত পথ-নির্দেশক নয়। কিন্তু এসব তত্ত্বের কথা যতই আমাদের মনে পড়ুক গোটের ইফিগেনিয়া একটি বিশেষ ভাব বা বিশেষ প্রতীক নয়, গ্যেটের ইফিগেনিয়া একজন ব্যক্তি,—সে হচ্ছে সেই মধুর-স্বভাব মানুষদের অন্যতম যারা অধিকারী হয়েছে অপরিসীম আত্মিক শক্তির, সেই শক্তি তাদের লাভ হয়েছে অংশতঃ এই কারণে যে মৃত্যুকে স্পর্শ করে' তারা অন্তরে স্থায়ীভাবে লাভ করেছে মৃত্যুহীনকে ; জগতের পক্ষে তারা মৃত—বস্তুবাদী ও চপল জগতের পক্ষে···কিন্তু আশাহীন ও উৎসাহহীন জগতে আনন্দ আর প্রাণ ফিরিয়ে আনবার শক্তি তাদের এই আনন্দহীনতার ও প্রাণহীনতারই আছে।

একালের কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন : গোটে তাঁর ইফিগেনিয়ায় আশাপরায়ণতাকে কিছু বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন। ক্রোচের এই অভিমত তাঁদের

অনুধাবনের যোগ্য। কাব্য-জগৎ স্বতন্ত্র হয়েও বাস্তবজগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই বাস্তবজগতে আশাপরায়ণতা অর্থহীন নয়, কেননা, মানুষের চিরন্তন সৃষ্টিধর্মের সঙ্গে তার নিত্যযোগ। বিশ্বের চিৎ-সম্পদের ভাণ্ডারে গ্যেটের এক শ্রেষ্ঠ দান তাঁর এই আশাপরায়ণতা—সৌখীন নয় আদৌ, সত্যাশ্রয়ী পূর্ণভাবে। ইফিগেনিয়ার প্রত্যেকটি চরিত্র যে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, ভাবের পুতুল তারা হয় নি, এতেই এই ধরণের সমালোচনা অসাহিত্যিক-পর্যায়-ভুক্ত হয়েছে।

পুরাতন স্মৃতি

কবি তাঁর ত্রিংশৎ জন্মদিনে 'গেহাইমরাট' অর্থাৎ 'প্রধান ব্যবস্থাপক' উপাধিতে ভূষিত হন। কবি এটিকে বলেছেন অদ্ভুত, অর্থাৎ ভাগ্যের অদ্ভুত দান। তিনি প্রফুল্ল মনেই এই দান গ্রহণ করেন। তাঁর বেতন বর্ধিত হয় আঠারোশ' 'টালার' এ।

এই বৎসর তিনি তাঁর পরমবন্ধু ডিউক-এর সঙ্গে পুনরায় সুইটজারল্যাণ্ড ভ্রমণে যান। অত্যন্ত অল্প জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে পরিচয় গোপন করে' তাঁরা বেরিয়ে পড়েন। দুজনে প্রথমে যান ফ্রাঙ্কফোর্টে। গ্যেটে-জননী তাঁর পদস্থ পুত্র আর রাজ-অতিথিকে পেয়ে পরম আপ্যায়িতা হন। তাঁর ভাণ্ডারের বহু উৎকৃষ্ট সুরা এই দুই তরুণ দেবতার আনন্দ বর্ধন করে। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে তাঁরা স্ট্রাস্‌বুর্গে যান। অদূরেই জেজেনহাইম—গ্যেটে একলা ফ্রেডেরিকাকে দেখতে যান। কেমন দেখলেন সে-কথা ব্যক্ত হয়েছে শার্লোট ফন ষ্টাইনকে লেখা এই পত্রে :

> ২৫ তারিখে (সেপ্টেম্বর, ১৭৭৯) ঘোড়ায় চড়ে গেলাম জেজেনহাইমে। দেখলাম সেই আট বৎসর পূর্বে পরিবারটি যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। পরিবারের দ্বিতীয়া কন্যা সেই দিনে আমার প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন কিন্তু আমি তাঁর ভালবাসার যোগ্য প্রতিদান দিই নি, বরং তাঁর মতো ভালবাসা যাঁদের কাছ থেকে পাইনি তাঁদেরই দিয়েছি আমার হৃদয় মন। তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল আমাকে, তাতে তাঁর প্রাণসংশয় ঘটেছিল ; কিন্তু সহজভাবে তিনি বলে' চল্লেন তাঁর সেই পুরাতন ব্যাধির কি কি উপসর্গ এখনো দূর হয়নি। এবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবার ক্ষণ থেকে শেষ পর্যন্ত এমন হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার তিনি করলেন যে আমার মনের বোঝা হালকা হয়ে গেল। বলা দরকার আমার প্রেমের নিভানো আগুন আবার জ্বালাতে কিছুমাত্র চেষ্টাও তিনি করেন নি। সেকালের সেই কুঞ্জবনে আমাকে নিয়ে গেলেন, দুজনে বসলাম ! চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রি, আমি সবারই কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার কথা এখানে এঁরা আজো ভোলেন নি। আমার পুরোনো গান এখনো এঁদের মনে আছে।

একটি গাড়ীতে রং করেছিলাম—সেটিও দেখলাম। সেই সুখের দিনের বহু খেলাধুলার কথা আমাদের মনে পড়লো। সব আমার মনে পরিষ্কার জেগে উঠলো, যেন মাত্র ছ'মাস আগে এখান থেকে চলে গেছি। বর্ষীয়ানেরা আপনার জনের মতো অকপট ব্যবহার করলেন, বল্লেন, দেখাচ্ছে আমাকে আরো কম বয়সের। রাত্রি যাপন করে' সকালে বেরিয়ে পড়লাম—পেছনে রেখে এলাম বন্ধুদের প্রসন্ন মুখ। জগতের এই কোণটি সম্বন্ধে এখন মনে স্থান দিতে পারি—এঁদের ও আমার মধ্যে সম্প্রীতি ভিন্ন আর কিছু নেই।

বলা বাহুল্য ফ্রীডেরিকা আজো অবিবাহিতা ছিলেন। গ্যেটে জানতে পারলেন তাঁর ঝড়-ঝাপটা দলের বন্ধু লেন্‌ৎস্‌ ফ্রীডেরিকাকে বিবাহ করতে খুব ইচ্ছুক হয়েছিলেন কিন্তু ফ্রীডেরিকা স্বীকৃত হন নি।†

২১ তারিখে ফিরে এসে গ্যেটে দেখতে গেলেন লিলিকে। লিলি এখন পদস্থ স্বামীর ঘরণী, সম্প্রতি সন্তানের জননী হয়েছেন। কবিকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁকে সুখী দেখে কবি আনন্দিত হলেন।

বিবাহের অল্প কিছুকাল পরেই কর্ণেলিয়ার মৃত্যু হয়েছিল। অদূরেই ছিল তাঁর সমাধি—কবি দেখতে যান। তারপর কবি ও ডিউক প্রবেশ করেন সুইট্‌জারল্যাণ্ডে, সেখানে লাফাটরকে পেয়ে খুশী হন। ফিরবার পথে সমর-বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণী সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে শিলারকেও তিনি দেখেন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিখ্যাত ঝরণা দেখে তাঁর "জলদেবতার গান" কবিতা রচনা করেন, তাতে মানব-আত্মাকে তুলিত করা হয়েছে ঝরণার সঙ্গে—কোন্ আকাশে তার উৎপত্তি, আর পাহাড়ের গা বেয়ে কত জটিল কুটিল পথ অতিক্রম করে' সমতল ক্ষেত্রে আকাশের আরশি হয়ে কখনো তরঙ্গ তুলে' তার যাত্রা।

এই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ভ্রমণের কালে লেখা গ্যেটের কতকগুলো পত্রের উচ্চপ্রশংসা ব্রাণ্ডেস করেছেন: ভোর্টেরের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার সঙ্গে তুলনায় এইসব পত্রের প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা উৎকর্ষ লাভ করেছে, এই তাঁর মত।

কার্ল আউগুস্‌ট্‌

বিপুল আগ্রহে কবি কর্মজীবন আরম্ভ করেন, আমরা দেখেছি। প্রথম কয়েক বৎসর এ আগ্রহ মন্দীভূত হয়নি। কাজের পথে যত বাধা সে-সব স্বীকার করেই তিনি অগ্রসর হন। জনপ্রিয়তাও তিনি অর্জন করেন।

---

† ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে (গ্যেটের আত্মচরিত প্রথমখণ্ড প্রকাশের পরে) ফ্রীডেরিকা লোকান্তরিতা হন। তাঁর সমাধিগাত্রে লেখা হয়:

এর উপরে পড়েছিল কবিত্বের রশ্মি।
এর অমরতা তাতে হয়েছে উজ্জ্বল॥

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরমবন্ধু ডিউককে নিয়েই তিনি বিপদে পড়লেন। তাঁর বিখ্যাত "ইল্‌মেনাউ" কবিতায় নিদ্রিত ডিউককে লক্ষ্য করে' তিনি লেখেন :

বাসা ভেঙে কে প্রজাপতিকে দেবে মুক্তি ? সময় আসে
যখন আপনি সে হয় মুক্ত আর উড়ে গিয়ে বসে গোলাপের বুকে।
'তার' শক্তির অভ্রান্ত গতিপথও সে খুঁজে পাবে কালে।
দেখা যাচ্ছে, সত্যের জন্যে তার গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে
মিশে রয়েছে ভুলের দিকে তার দুর্দমনীয় প্রবণতা।
দুঃসাহস তাকে হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় বহুদূরে—
কোনো পাহাড় তার জন্য নয় উত্তুঙ্গ কোনো পথ নয় দুরারোহ ;
সদাই সম্মুখীন সে ভয়ঙ্কর বিপদের
সদাই লাভ হচ্ছে তার দুঃখের আলিঙ্গন।
তার দুর্দমনীয় আবেগ
চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে ইতস্ততঃ।
অন্ধ কর্মোদ্যমের পরে
বিশ্রাম খোঁজে সে যেন নৈরাশ্যে।
নিরানন্দ সে—যদিও অব্যাহতশক্তি ;
অপ্রসন্ন—যদিও উদ্দাম আনন্দের দিনে ;
দেহে মনে আহত হয়ে
ঘুমাচ্ছে সে পাথরের শয্যায় বিস্মরণ কামনায়।

ডিউকের প্রকৃতির এই এক রোখা ভাব—একগুঁয়েমি বলা সঙ্গত হবে না কেননা এটি তাঁকে পরে সাহায্য করেছিল কুশলী শাসক হতে—কবির যথেষ্ট দুঃখের কারণ হয়ে উঠ্‌লো। ডিউক প্রায়ই বন্য বরাহ শিকারে বেরুতেন ; তাতে চাষীদের ফসলের ক্ষতি হতো ; গ্যেটে বারবার এটি ডিউকের গোচরে আনেন ; ডিউক নিজের ভুল স্বীকার করতেন, নিজেকে সংশোধন করতেও চাইতেন ; কিন্তু কাজে হয়ে উঠ্‌তোনা। নিজের খরচ কমানোও ডিউকের পক্ষে দুঃসাধ্য হলো। ডিউক সম্বন্ধে গ্যেটের আরো কয়েকটি উক্তি এই :

> যা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত তার জন্য তাঁর উৎসাহ প্রচুর, যদিও যা অসঙ্গত তাতেই তাঁর আনন্দ বেশী। তাঁর বিবেচনা, অন্তর্দৃষ্টি ও জানাশোনার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, কিন্তু কোনো ভাল কাজ করতে গিয়ে আরম্ভ করেন তিনি নিবুর্দ্ধির মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে না স্বীকার করে' উপায় নেই যে এই দোষ তাঁর প্রকৃতিগত ;—ব্যাঙ্‌ কিছুকাল ডাঙায় বাস করতেও পারে, কিন্তু আসলে সে জলের জীব।

অন্যত্র—

> ডিউকের ভাবনার পরিসর সংকীর্ণ; তিনি কোনো বড় কাজে হাত দিতে চান মুহূর্তের উত্তেজনায়। কোনো সুদূরপ্রসারী কল্পনা কাজে পরিণত করতে পারলে যে বড় রকমের নূতন-কিছু করা হয় সেদিকে তাঁর মন যায় না। প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ তিনি নন।

বলা বাহুল্য ডিউককে লুকিয়ে কবি এসব উক্তি করেন নি। পরে অবশ্য ডিউক সম্বন্ধে যথেষ্ট উঁচু ধারণা তাঁর হয়েছিল—'একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ' অধ্যায়ে তা আমরা দেখ্‌ব।

ডিউক নিজের খরচ কমাতে স্বীকৃত হলে তবেই কবি অর্থ-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও তাঁর খরচ কমিয়ে দুঃস্থদের সাহায্য করতে সদাই প্রস্তুত ছিলেন। এক দুঃস্থ ব্যক্তিকে দীর্ঘ সাত বৎসর ধ'রে তিনি তাঁর পরিমিত আয়ের একষষ্ঠাংশ দিয়ে প্রতিপালন করেন—লুইসের গ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাঁর এই সব দানে মানুষের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি মনোজ্ঞ :

> হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তুলনায় নিজের এত বেশী আছে দেখে লজ্জিত হতে হয়।

দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে না দেখে কবি ব্যথিত হন। এর ফল যে ভয়াবহ সে-সম্বন্ধে ফরাসী বিপ্লবের আট বৎসর পূর্বে তিনি লেখেন :

> আমাদের বর্তমান অভিশপ্ত ব্যবস্থায় গ্রাম-দেশের মজ্জা পর্যন্ত শুষে নেওয়া হচ্ছে; তাতে সেখানকার শস্যশ্যামল ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি চলেছি যেন 'ভিক্ষুকের বসন তালি দিয়ে—তা কেবলই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে। আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিমূল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অনন্ত সুড়ঙ্গ গর্ত আর পচা নালা-ডোবার দ্বারা। কি যোগাযোগ চলেছে সেখানে, যারা সেখানে বাস করছে কি তাদের দশা—এসব কেউ ভাবে না। কিন্তু এসবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় যার আছে তার কাছে এসবের অর্থ আরো পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌বে যখন ভূমিকম্প শুরু হবে,···তখন মাটির এই সব ফাটলের ভিতর থেকে উঠ্‌বে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

কবি দিন দিন হচ্ছিলেন জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, আর ডিউকের নব-যৌবনের উন্মাদনা কেটে যায় নি—এ কথা তিনি বুঝতেন, তাই ডিউকের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির যোগ ডিউকের এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিনষ্ট হয় নি :

> ডিউকের দোষ-ত্রুটি বহু, কিন্তু সেসব আমি সহজেই ক্ষমা করি নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে'।

কর্মজীবনে এই 'ব্যর্থতা'র জন্যেই হোক অথবা তাঁর স্ব-ধর্মের প্রেরণায়ই হোক কবি ধীরে ধীরে পূর্ণভাবে সচেতন হলেন যে তিনি সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন সাহিত্যই তাঁর ক্ষেত্র। তিনি লিখেছেন:

> মনের কথা লেখায় ফুটিয়ে তুলে পূর্বের চাইতে নির্মলতর আনন্দ উপভোগ করি।

রাজমন্ত্রিত্ব যে তাঁর সত্যকার কাজ নয় সে সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই:

> আমার জন্ম একজন সাধারণ নাগরিক হবার জন্যেই। জানিনা ভাগ্য কেন আমাকে মন্ত্রীর গদিতে আর রাজপরিবারের সংস্রবে এনে হাজির করেছে।

ইতালি যাত্রার আয়োজন

গ্যেটের পিতা যৌবনে ইতালি ভ্রমণ করেছিলেন। পুত্রকেও তিনি ইতালি ভ্রমণের পরামর্শ দিয়েছিলেন—"ইতালি বিখ্যাত দেশ কাব্যের কানন"—শিল্পের "কানন" ত' বটেই! কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্যেটে তাঁর জ্ঞানব্রতে নিবিষ্টচিত্ত হলেন। রাজকার্য যোগ্যভাবে করবার জন্য যে সময় ব্যয় করা সঙ্গত তা করে' অবশিষ্ট সময় তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চায় ব্যয় করতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে তাঁর ভিলহেল্‌ম্ মাইস্‌টার, এগমণ্ট ও তাসসো রচনা এগিয়ে চলে, আর বিশেষভাবে চলে বিজ্ঞান-চর্চা। এই বৎসর তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্য হার্ৎস্ পর্বতে যান, কিন্তু সেখানেও বিজ্ঞান-চর্চাই তাঁর জন্য প্রধান হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি—এই পর্যবেক্ষণ-শক্তিই তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সাহিত্যক্ষেত্রেও এত বিচিত্র স্বভাবানুগ চরিত্র সৃষ্টি করতে। স্ফটিক সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তাঁর এই নব বিজ্ঞানানুরাগ রূপ লাভ করেছে:

> প্রকৃতির রহস্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণের কথা যাঁরা বোঝেন তাঁরা আশ্চর্য হবেন না যে আমার অতীতের পর্যবেক্ষণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে' এই নতুন ক্ষেত্রের দিকে আমি এতখানি আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। এতদিন পর্যবেক্ষণ করছিলাম, আঁকছিলাম, মানুষের হৃদয়—সৃষ্টির সর্বকনিষ্ঠ, সবচাইতে বহুমুখী, সবচাইতে চঞ্চল, সবচাইতে পরিবর্তনশীল অংশ (এর ভিত্তিমূলও আলোড়িত হয় সহজে), আর তার পরিবর্তে আজ পর্যবেক্ষণ করছি সৃষ্টির সর্বজ্যেষ্ঠ, দৃঢ়তম, গহনতম, একান্তচাঞ্চল্যহীন সন্তানকে;—একটা বিপরীত-কিছু করবার ঝোঁকেই যে এটি করছি এ-তিরস্কার আমাকে স্পর্শ করবে না। কেননা সবাই এ বিষয়ে আমার

সঙ্গে একমত হবেন যে প্রকৃতির সব-কিছু পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত, আর অনুসন্ধিৎসু মন লভ্য কোনো-কিছু থেকেই বিরত হতে চায় না। আমি—যে-আমি বহু ভুগেছি, আজো ভুগছি, ভুগেছি মানুষের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্যে, দ্রুত এবং বিরামহীন পরিবর্তন শুধু নিজের বেলায় নয় অন্যের বেলায়ও—সেই আমি আজ কামনা করছি মহান্ বিশ্রাম মহীয়সী মৃদুভাষিণী প্রকৃতির নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতার সামনে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা নব আবিষ্কারের গৌরব লাভ করে। এ পর্যন্ত বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে শারীর সংস্থানের দিক দিয়ে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করছিলেন Incisor দন্ত যে অস্থির উপরে অবস্থিত উপরের-চোয়ালের-সঙ্গে-যুক্ত সেই অস্থি বনমানুষে আছে—যেমন অন্যান্য ইতর প্রাণীতে আছে—কিন্তু মানুষে নেই। এটি তাঁদের চোখে ছিল মানুষ ও বনমানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রমাণ। গ্যেটে আবিষ্কার করেন যে এই অস্থি মানুষেও আছে। এ সময়ে হের্ডর প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে শারীর গঠনের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। গ্যেটে তাঁর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সফলকাম হয়েই হের্ডরকে লিখলেন :

> য়েনা—মার্চ ২৭—রাত্রি। আমি আবিষ্কার করেছি—সোনা রূপা নয় কিন্তু এমন কিছু যাতে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করছি—আবিষ্কার করেছি মানুষের ঊর্ধ্বহনু-সংযোগ-অস্থি (Intermaxillari bone)। লোডেরের সঙ্গে মানুষ ও পশুর মাথার খুলি মিলিয়ে দেখছিলাম, আসল সন্ধানটি পেলাম—কি আনন্দ! কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথাও নয় : আপাতত এটিকে খুব গোপন রাখতে হবে। আপনার খুব আনন্দ হবে নিশ্চয়ই কেননা এইটি হবে নৃতত্ত্বের কুঞ্জিকা—ঠিকই পাওয়া গেছে কোনো ভুল নেই! কিন্তু কেমন করে'?

তাঁর এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ক্নেব্‌লকে লিখলেন :

> বাস্তবিক মানুষ পশুর সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত। সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রত্যেক জীব তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে। মানুষকে বোঝা যায় যেমন তার উপরের চোয়ালের গঠন থেকে তেম্‌নি পায়ের আঙুলের শেষ গ্রন্থি-সংযোগের আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে। এই ভাবে বোঝা যায় প্রত্যেক প্রাণী হচ্ছে সমগ্র 'সুরগ্রামে'র এক একটি সুর, সমগ্র 'সুরগ্রামে'র সঙ্গে মিলিয়েই বুঝতে হবে তার অর্থ, নইলে তা অর্থহীন। এই চিন্তাধারাই রয়েছে আমার এই ছোট নিবন্ধের মূলে, আর বাস্তবপক্ষে এটিই এর আসল কথা।

প্রকৃতির সব-কিছু পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত এই সত্যের সন্ধান গোটে বোধ হয় প্রথম পান স্পিনোজার কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক সাধনা তাঁর এই মনোভাবকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকরা তাঁর এই বিজ্ঞান-সাধনাকে জ্ঞান করেছিলেন সময়ের অপব্যবহার আর বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে জ্ঞান করেছিলেন অনধিকারী—বহু দিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁর এই নব অস্থি-আবিষ্কার স্বীকার করেন নি। কিন্তু গোটের যে জীবন-বোধ তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বাস্তবিকই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাঁর এই বিজ্ঞান-সাধনার সূচনায় তিনি এই সুগভীর উক্তি করেন :

> আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব মন্দ হব, তোমাদের যত আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

লুডভিগ বলেন : এই বিজ্ঞান-সাধনার কালে তাঁর অন্তর্নিহিত মরমী ভাবও তাঁর মধ্যে প্রবল হয়, পুনর্জন্মবাদ তাঁর রচনায় দেখা দেয়।† মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি লেখেন :

> মানুষের যে মৃত্যু হয় এটি কত ভালো—মনোজীবনের সমস্ত ক্ষয়চিহ্ন দূর করে' দিয়ে সে ফিরে আসে যেন স্নানস্নিগ্ধ হয়ে।

এই যুগে তাঁর বিখ্যাত 'নর-দেবতা' (The Divine) কবিতা রচিত হয়। কবিতাটি যেমন রসোচ্ছ্বাসবর্জিত তেমনি ভাবপূর্ণ—মনুষ্যত্ব বলতে কি বোঝা হবে সে সম্বন্ধে এর নির্দেশ সুউজ্জ্বল :

১

মানুষ হবে মহৎ,
হবে হিতৈষী ও সৎ !
এই-ই কেবল তাকে
পৃথক করতে পারে
বিশ্বচরাচরের
সকল কিছু থেকে।

২

জয় হোক অজানাদের
মহত্তর মহিমাপুঞ্জের,
যাঁদের আমরা ধ্যান করি,

† এক ধরণের পুনর্জন্মে গোটের বিশ্বাস ছিল, তাঁর বহু উক্তিতে তা প্রকাশ পেয়েছে। তবে এ সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত তত্ত্বের অবতারণা তিনি করেন নি। তাঁর "একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ"-এ ও ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অঙ্কের শেষে এসম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত আমরা পাব।

হোক মানুষ তাঁদের মতো।
তার আচরণ আমাদের শেখাক
তাঁদের সম্মুখীন হতে বিশ্বাস-বলে

৩

চারপাশের যে প্রকৃতি
অনুভূতি-বর্জিত সে,
সূর্য কিরণ ছড়ায়
ভালোর উপরে মন্দেরও উপরে ;
চন্দ্র ও তারা আলো দেয়
পাপাত্মাকে
পুণ্যাত্মাকেও।

৪

ঝঞ্চা আর বন্যা
শিলা হানে বজ্র হানে,
গর্জন করে ছুটে চলে,
হাম্‌লা করে ছিনিয়ে নেয়,
যা তাদের সাম্‌নে পড়ে
একের পর আর।

৫

ভাগ্যেরও তেম্‌নি ধারা—
হাৎড়ে সে ফেরে জনতায়,
এই সে মারে হ্যাঁচ্‌কা টান
নিষ্পাপ বালকের কেশ ধরে' ;
এই সে খসিয়ে নেয়
বৃদ্ধ পাপীর ধূসর মুকুট।

৬

সনাতন ও লৌহকঠোর
প্রকৃতির এই বিধিবিধান,—
বিশ্বের যত জীব ও জড়
তার দ্বারা বাঁচে, চালিত হয়,
নিরূপিত তাদের আয়ুষ্কালে।

৭

মানুষ কিন্তু সাধন করে—
মানুষই কেবল সাধন করে—অসম্ভবের
বাছাই করে সে ভালো-মন্দ,
গ্রহণ করে আর মূল্য দেয় ;
ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তেরে
দান করে সে স্থায়িত্ব।

৮

আর কেউ নয় কেবল সে-ই
ভালোরে দেয় পুরস্কার,
মন্দরে দেয় লাঞ্ছনা,
রক্ষা করে, উদ্ধার করে,
সদ্ব্যবস্থা করে' চলে
ভ্রান্তের আর বিপথগামীর।

৯

সম্মান জানাই আমরা
মহান্ অমরদেরে
যেন তাঁরা মানুষের মতো,
বিরাটভাবে তাঁরা সাধন করেন
সংকীর্ণ তাদের পরিসরে
মানুষের শ্রেষ্ঠরা
যা করে বা করতে পারে।

১০

হোক মহৎ মানুষ
হিতৈষী ও সৎ,
অশ্রান্তভাবে করুক
যা প্রয়োজনীয় ও সঙ্গত।
হোক তারা প্রতীক
সেই সব মহিমার
যাঁদের আমরা ধ্যান করি।

কর্মজীবনে আশানুরূপ ফল-লাভের অভাব আর তার সঙ্গে জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রবল বোধ—অল্প কথায় এই-ই কবির ইতালি-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বের জীবনের পরিচয়। তাঁর পরমপ্রীতিপাত্রী শার্লোট ফন ষ্টাইনের সংস্রব তাঁকে যে আনন্দ দান করছিল তা গভীর। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মনের গোপনে এমন এক অস্বস্তির সঞ্চার হয়েছিল যার তীব্রতা ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর সমস্ত আনন্দ-অনুভূতি, সমস্ত কর্তব্য-বোধ। তাঁর বন্ধুরাও মাঝে মাঝে অনুভব করছিলেন তাঁর দেহমন সুস্থ নয়। অবশেষে কবি সংকল্প করলেন ভাইমার ত্যাগ করে' কিছুকাল অন্য কোথাও কাটাবেন। কিন্তু এই সংকল্পের কথা কারো কাছে তিনি ব্যক্ত করলেন না।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থাবলীর এক নূতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। বইপত্র সঙ্গে নিয়ে কবি জুলাই মাসে ডিউক, হের্ডর ও শার্লোট ফন ষ্টাইনের সঙ্গে স্বাস্থ্য-নিবাস কার্লস্‌বাড-এ গমন করেন। হের্ডর ও শার্লোট কিছুদিন পরে ভাইমারে ফিরে যান। এখানে আরো কিছুদিন ডিউকের সঙ্গে কাটিয়ে কবি ইতালি-যাত্রা করেন সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে, ডিউককে তিনি লেখেন :

> আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে স্পষ্টভাবে বলে' আসিনি কোথায় যাচ্ছি কতদিনের জন্যে—সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমি নিজেও এখনো পুরোপুরি জানি না কি করবো। আপনি আনন্দিত মনে চলেছেন আপনার লক্ষ্যে। রাজকার্য শৃঙ্খলার সঙ্গে চলেছে; আমি যদি এখন আমার পথের সন্ধান করি আশা করি তাতে অপরাধ নেবেন না, আপনি নিজেও এর প্রয়োজনের কথা বহুবার বলেছেন। এ সময়ে আমাকে না হলেও বেশ চল্‌বে, আমার অনুপস্থিতি-কালে সব শৃঙ্খলার সঙ্গে চলবে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অবস্থায় আমি চাচ্ছি এক অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি।

বাণী-পূজা

ইতালি-প্রবাস

নিজের পরিচয় গোপন করে' 'হের মেলর' (Meller) এই ছদ্মনাম নিয়ে কবি ইতালিতে উপস্থিত হলেন। ইতালি দর্শনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে' তাঁর মনে যে এক গভীর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল তার এক পরিচয় রয়েছে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইসটারের মিগ্‌নের গানে। ইতালির বাগান গাছপালা বাড়ীঘর সব যেন তাঁকে পূর্বপরিচিতের মতো প্রীতিসম্ভাষণ জানালে। সর্বোপরি ইতালির নির্মল আকাশ তাঁকে যেন আনন্দে ডুবিয়ে দিলে—এই আলোকিত আকাশ যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। (ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডে আলোকিত পরিবেষ্টনে তাঁর গভীর আনন্দ রূপ লাভ করেছে।) কৃত্রিম খাল, হ্রদ, সরু রাস্তা, চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য, জনতার স্ফূর্তি দেখতে দেখতে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, আরেৎসো, পেরুগিয়া, ফেলিগ্‌নো ও স্পোলেতো অতিক্রম করে' ২৮শে অক্টোবর তারিখে কবি রোমে উপস্থিত হলেন।

রোমে কবির প্রথমে চার মাস কাটে। কয়েকজন জার্মান শিল্পীর সঙ্গে তিনি বাস করতেন, তাঁরা তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার প্রশংসা করেছেন। কবি চিত্রাঙ্কনে বিশেষ মন দেন। তার সঙ্গে চলে বিভিন্ন গির্জা ও চিত্রশালা দর্শন। ভিঙ্‌কল্‌মান সম্বন্ধে তিনি নূতন ভাবে কৌতূহলী হন। কিন্তু সব চাইতে বড় কাজ যেটি করেন সেটি হচ্ছে ইফিগেনিয়ার ছন্দোময় রূপ দান। তাঁর এই চেষ্টা ব্রাণ্ডেসের চোখে খুব অর্থপূর্ণ, তাঁর মতে, ইফিগেনিয়ায় গ্যেটের প্রতিভা যে অভিনব ছন্দ-সামর্থ্য লাভ করে সেটি তাঁকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে ফাউস্ট রচনায় অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গতা দানে। তাঁর এই রোম-বাস সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> আমার যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন আজ আমার সামনে জীবন্ত। যেখানেই যাই সেখানেই দেখি পরিচিত বন্ধু-মুখ; যেটির সম্বন্ধে যা ধারণা করেছিলাম তেমনটিই তাকে দেখছি, তবু সবই কত নতুন। ভাব ভাবনা এ সব সম্বন্ধেও সেই কথা। নতুন কোনো ভাব ব ভাবনা যে আমি লাভ করেছি তা নয় কিন্তু সমস্ত পুরাতন ভাব এতখানি সুস্পষ্ট, জীবন্ত ও পরস্পর-সম্বন্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে যে সে-সবকে নতুন বলে' ভাবা যায়।

অন্যত্র বলেছেন :

> কেবল এখনই প্রকৃত বাচা বাঁচছি; এখানে যে এসে পৌছেচি এতে আমি শান্ত হ'তে পেরেছি; মনে হয়, জীবনের অবশিষ্ট কাল সে শান্তি নষ্ট হবে না।

ডিউক কবিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি দিলেন। রোম থেকে কবি ফেব্রুয়ারীর শেষে নেপল্‌স্‌-এ যান। সেখানে তাঁর পাঁচ সপ্তাহ কাটে। ছদ্মপরিচয় পরিত্যাগ করে' এখানে তিনি সবার সঙ্গে মেশেন। নেপল্‌স্‌-এ স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্‌টনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও তাঁর ইতিহাসপ্রসিদ্ধা পত্নী লেডী হ্যামিল্‌টনের চিত্তাকর্ষক নৃত্য দর্শন করেন।

রোমে কবি লেখাপড়ায় মন দিয়েছিলেন, কিন্তু নেপল্‌স্‌-এ সেসব প্রায় পরিত্যাগ করে' তিনি রত হন ভ্রমণে ও লোকের সংসর্গ লাভে। সমুদ্র-তীরে জেলেদের আড্ডা, জনসাধারণের ভিড়, বিশিষ্টদের সম্মেলন, জ্যোৎস্নালোকে নৌকাভ্রমণ, পোম্পেয়ি সন্দর্শন, বিসুভিয়স সন্দর্শন,—এ সবে তাঁর বহু সময় কাটে। বিসুভিয়সে তিনি তিন বার আরোহণ করেন—বিপদের ভয় তাঁর মনে স্থানই পায় না। পাএস্তুম্‌-এ (Paestum) তিনি প্রাচীন গ্রীক্‌মন্দিরের অপূর্ব গঠনের ভগ্নাবশেষ দেখে পরম পুলকিত হন।—পাএস্তুমের গ্রীক্‌মন্দির সম্বন্ধে প্রথম যোগ্য আলোচনা করেন ভিঙ্‌কল্‌মান।

নেপল্‌স্‌ থেকে এপ্রিলের প্রারম্ভে কবি পালর্মো-তে যান। সেখানে তাঁর এক পক্ষ কাটে। সেখানকার কমলালেবুর বাগান, করবী বাগান, যেন তাঁকে সংসার ভুলিয়ে দেয়। এখানে হোমর নতুন করে' তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠেন—ওডিসি তিনি নতুন করে' পড়েন; হোমরের অনুসরণে 'নাসিকা' নাম দিয়ে এক নাটক আরম্ভ করেন; এটি অবশ্য বেশী দূর অগ্রসর হয় না। এখান থেকে মে-র মাঝামাঝি তিনি নেপল্‌স্‌-এ ফিরে যান—পথে সলিল-সমাধি লাভের সম্ভাবনা তাঁর ঘটেছিল। সমুদ্র-তীরে কাঁকড়া দেখে কবি এই গভীর মন্তব্য করেন :

> প্রাণবান সৃষ্টি কী অপূর্ব ব্যাপার! পরিবেষ্টনের সঙ্গে তার কী গভীর যোগ
> —কত বাস্তব—কত বিশিষ্ট!

সমুদ্রের এক বিশেষ ধরণের মাছের জন্ম-কথা বুঝবার জন্য তিনি না কি ভারতবর্ষ-যাত্রার সঙ্কল্প করেছিলেন। নেপল্‌স্‌-এ এক পক্ষ কাল কাটিয়ে তিনি পুনরায় রোমে ফিরে আসেন। এখানে তিনি অতিবাহিত করেন ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন থেকে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত।

এই দশ মাস কাল যে পরিশ্রম তিনি করেন তা অনন্যসাধারণ। তাঁর 'তাস্‌সো' নাটকের দুই অঙ্ক লেখা হয়েছিল; সবটা লিখে তিনি নতুন করে' দাঁড় করালেন; নাটকটি তিনি অবশ্য শেষ করেন ভাইমারে ফিরে'। তাঁর 'এগমণ্ট' নাটক এখানে শেষ করা হয়। রোমে যখন তিনি তাস্‌সো নিয়ে ব্যাপৃত তখন ফরাসীবিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে—প্যারিসে Bastille ধ্বংস হচ্ছে।—তাঁর রচনাবলীর যে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তা চারখণ্ডে সমাপ্ত হয়।—আর তাঁর ফাউস্টও তিনি এই কালে

নতুন করে' আরম্ভ করেন; তিনি লিখেছেন, ফাউস্‌ট্‌ নাটকের হারানো খেইটি তিনি পুনরাবিষ্কার করেন। ফাউস্‌ট রচনা অবশ্য বেশী দূর অগ্রসর হয় না।

ইতালি-বাস কালে কবি চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। কিন্তু কোনো বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন না। তবে এর পরে আর তিনি চিত্রাঙ্কনে মন দেননি।

তাঁর বিজ্ঞান-চর্চা, বিশেষ করে' উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-চর্চা, এখানে ফলপ্রসূ হয়—বৃক্ষের রূপান্তর সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান গবেষণা করেন। ব্রাণ্ডেসের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাঁর প্রতিপাদ্য নাকি এই যে কাণ্ড ব্যতিরেকে বৃক্ষের আর-সব অংশ পত্রের রূপান্তর।

ইতালিতে চিত্র ও স্থাপত্য উভয়ের দিকেই কবি আকৃষ্ট হন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা ও রুচির বিশিষ্ট রূপ আমাদের চোখে পড়ে। খৃষ্টানধর্মের প্রভাব যে-সব স্থাপত্যে—যেমন তাঁর নবযৌবনের বহুল-প্রশংসিত 'গথিক' স্থাপত্যে—সেসব তাঁকে আকর্ষণ করে না আদৌ। চিত্রেও তেমনি খৃষ্টান-ত্যাগ-প্রাবল্যের দ্বারা প্রণোদিত আলেখ্যের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে তিনি আকৃষ্ট হন রাফায়েলের সহজমানবিকতাপূর্ণ চিত্রের দিকে। আর প্রাচীন গ্রীক-শিল্প তাঁর একান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে: প্রাচীন গ্রীক ভাবে তিনি দেখেন জীবনের পূর্ণতা-বোধ ও প্রশান্তি আর খৃষ্টান-শিল্পে তিনি দেখেন ভাবোন্মাদ। রেনেসাঁস-এর যে আনন্দ ও জীবন-বোধ্ তাই হয়েছিলে তাঁর জীবনব্যাপী আকর্ষণ-স্থল। ব্রাণ্ডেস বলেন:

> তিনি দাঁড়িয়েছেন যেন রেনেসাঁসের বর্গফল—বিরাট রেনেসাঁস এখানে পুনর্জীবন লাভ করেছে একজন ব্যক্তিতে।

প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি বিখ্যাত:

> প্রাচীনেরা আঁকতেন জীবন, আমরা সাধারণত আঁকি জীবনের প্রভাব; তাঁরা আঁকতেন ভয়ঙ্করকে, আমরা আঁকি ভয়ঙ্কর করে'; তাঁরা আঁকতেন মধুরকে, আমরা আঁকি মধুর করে'।

জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর প্রিয় বস্তুকেন্দ্রিকতা (Objectivity) সম্বন্ধে তাঁর আর একটি বিখ্যাত উক্তি এই:

> অবনতির যুগ ভাবকেন্দ্রিক (Subjective) আর উন্নতির যুগের প্রবণতা বস্তু-কেন্দ্রিকতার দিকে।

এ সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিটিও উল্লেখযোগ্য:

> চিন্তা সম্বন্ধে আমি কখনো চিন্তা করিনি।

ইতালিতে প্রকৃতির ও শিল্পের এই নির্মল সৌন্দর্য উপভোগ কালে কবি যে তাঁর বন্ধু কুসুমসায়কের লক্ষ্যস্থল আদৌ হন নি, তা নয়, তবে কুসুমসায়ক এবার তেমন

কৃতকার্য হন নি। তাঁর 'ইতালি-ভ্রমণ' গ্রন্থে আছে, এক সুন্দরী মিলান-নন্দিনী তাঁর অন্তরে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য জাগায়। কিন্তু তিনি যখন জানলেন এই তরুণী বাগ্‌দত্তা তখন ভের্টরের পুনরাভিনয়ের সম্ভাবনা থেকে সভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হলেন তাঁর নবলব্ধ শান্তি-রাজ্যে।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ২২ এপ্রিল তারিখে কবি ইতালি ত্যাগ করেন—যথেষ্ট অনিচ্ছুক হয়ে। কিছুকাল পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল; ফ্রাঙ্কফোর্ট হয়ে ভাইমারে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠ্‌লো না।

এই দীর্ঘ কালে ডিউক নিয়মিতভাবে তাঁর বেতন পাঠিয়েছিলেন। সেটি যে ভাইমারে চিত্তদাহের সৃষ্টি করেনি তা নয়। কবি শিলার গ্যেটের ভাইমার ত্যাগের কিছুকাল পরেই ভাইমারে আসেন। তিনি অসুস্থ ও সঙ্গতিহীন ছিলেন, এক পত্রে তিনি লেখেন:

> ভাইমার! গ্যেটে যে কবে ফিরবেন তার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই; অনেকের ধারণা সমস্ত কাজকর্ম থেকে তিনি রেহাই নেবেন। তিনি ইতালিতে ছবি আঁকছেন আর এখানকার রামাশ্যামাদের তাঁর জন্য গাধার মতো খাটতে হচ্ছে। কিছুই না করে' বার্ষিক ১৮শ' টালার তিনি ইতালিতে খরচ করে' যাচ্ছেন আর তাঁর অর্ধেক মাত্র পেয়ে এদের দ্বিগুণ কাজ করতে হচ্ছে।

ইতালি-বাসে কবির কি লাভ হলো সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি এই:

> আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—যে দৈহিক ও মানসিক অস্বস্তির জন্যে আমি প্রায় কাজের বাইরে চলে গিয়েছিলাম তা থেকে মুক্তি পাওয়া, আর অনাবিল শিল্প-সৃষ্টির জন্য যে প্রবল তৃষ্ণা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা প্রশমিত করা। প্রথমটিতে আংশিক ভাবে আর দ্বিতীয়টিতে পূর্ণভাবে আমি সফল হয়েছি।

এগ্‌মণ্ট

এগ্‌মণ্ট গ্যেটের একটি জনপ্রিয় নাটক। এর গানে সুর দিয়েছিলেন বেটোফন—সেটিও এর জনপ্রিয়তার এক কারণ। এর কাহিনীটি সংক্ষেপে এই:

> এগ্‌মণ্ট ষোড়শ শতাব্দীর নেদারল্যাণ্ডের একজন ব্যারন। তখন নেদারল্যাণ্ড স্পেনের অধীন। নেদারল্যাণ্ডে চলেছে অরাজকতা ও ধর্মবিপ্লব—পুরাতন ক্যাথলিক ধর্ম পরাজিত হচ্ছে নূতন প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের হাতে, কিন্তু রাজশক্তি পুরাতন ধর্ম রক্ষায় বদ্ধপরিকর, সঙ্গে সঙ্গে এইসব আন্দোলনের

ভিতর দিয়ে দেশের লোকেরা যে তাদের পুরাতন অধিকার বজায় রাখতে চাচ্ছে তা নষ্ট করতেও বদ্ধপরিকর। স্পেনরাজ ফিলিপের ভগিনী এখন নেদারল্যাণ্ডের শাসয়িত্রী†। কিন্তু বিদ্রোহ দমনে তিনি অক্ষম হচ্ছেন দেখে রাজার তরফ থেকে আসছে আল্‌ভা-র ডিউক শাসন-ভার হাতে নিয়ে। সে পরিপক্ক রাজপুরুষ, কঠোরহস্তে বিদ্রোহ দমন করতে হবে এই তার নীতি। দেশের জমিদারেরা সবাই রাজার অনুগত, অবশ্য তাদের সবারই কামনা এই যে দেশ সদয়ভাবে শাসিত হোক। তারা প্রায় সবাই ভয়ে অন্যত্র পালিয়েছে। কিন্তু এগ্‌মণ্ট অকুতোভয়—সে বিশ্বাস করছে রাজশক্তির তরফ থেকে কোনো অন্যায় হবে না। নূতন শাসক আল্‌ভা-র ডিউকের সন্দেহ হয়েছে জমিদারেরা কেউ কেউ এই বিদ্রোহ জিইয়ে রাখছে, সুতরাং তাদের দমন করা চাই-ই। এগ্‌মণ্টকে সে এই দলভুক্ত ভাবছে; এগ্‌মণ্টের বন্ধু অরেঞ্জের উইলিয়মকেও সে সন্দেহ করছে। উইলিয়ম সময় থাকতে পালিয়ে যায়; এগ্‌মণ্টকে সে সঙ্গে ডাকে, কিন্তু তাতে দেশে অরাজকতা বেড়ে যাবে এই ভেবে এগ্‌মণ্ট তার প্রস্তাবে রাজি হয় না। ডিউকের সঙ্গে শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্যে এগ্‌মণ্টের ডাক পড়ে। এগ্‌মণ্ট নির্ভয়ে ডিউক সন্দর্শনে যায় ও তাকে বলে প্রজাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই কর্তব্য, আরো কর্তব্য প্রজাদের প্রাচীন অধিকার রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা। ডিউক কটাক্ষ করে: ব্যারনরাও ত প্রজাদের অধিকার দানে খুব অগ্রসর নয়। এগমণ্ট বলে: ব্যারনরা যেসব অধিকার ভোগ করছে তা পুরাতন, নতুন করে' প্রজাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না।—ডিউক তাকে বাগে পেয়ে কারারুদ্ধ করে।

নাটকখানির অনেকগুলো চরিত্র ঐতিহাসিক যদিও নায়ক এগ্‌মণ্টের ঐতিহাসিকতা পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। তবু এতে ঐতিহাসিকতা ফুটেছে চমৎকার, বিশেষ করে' অপ্রধান চরিত্রগুলোর কথাবার্তা ও চালচলনের ভিতর দিয়ে। ক্রোচে বলেছেন, ঐতিহাসিকতা রক্ষার দিকে গ্যেটের দৃষ্টি সাধারণত কম, কিন্তু এগ্‌মণ্টে তিনি দক্ষতার সঙ্গে একটি বিশেষ যুগকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লুইস ও ব্রাণ্ডেস বিশেষ প্রশংসা করেছেন এর দুটি চরিত্রের—এগমণ্টের আর তার প্রেমপাত্রী ক্ল্যারখন-এর বা ক্লারা-র।

এগ্‌মণ্ট চরিত্র বাস্তবিক একটি অপূর্ব সৃষ্টি। ভয়ভাবনাহীন 'দিলখোলা' চরিত্র এর পূর্বেও গ্যেটে অঙ্কিত করেছেন কিন্তু এগ্‌মণ্টে যেন সে-সবের চরমোৎকর্ষ। তার দেহ ও মন দুয়েরই স্বাস্থ্য অপূর্ব। যে-যৌবনের বর্ণনা

† শাসিত্রী বাংলায় চলবে না মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর 'রক্ত করবী'র রঞ্জন সম্পর্কে যেন তার পূর্ণ দৈনন্দিন রূপ গ্যেটের এই এগ্‌মণ্টে। মানুষের অপরাধের কঠোর শাস্তি না দিতে পারলেই সে খুশী, অতি সহজ ভাবে দশের সঙ্গে মেশে, দশের অন্তরে গভীর ভালবাসা তার জন্যে—তার তেজীয়ান-ঘোড়া-সমেত তাকে দেখে তারা উল্লসিত হয়ে ওঠে। দুশ্চিন্তা ভয় এসব যেন কখনো তার অন্তরে প্রবেশ-পথ পায় না। দুর্ভাবনায় সে দেখে জীবনের-ব্যর্থতা। দেশের এই সঙ্কটে জনসাধারণের প্রতি রাজ-শক্তির দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই তাতে—যেমন ভব্য তেমনি দাপ্ত তার ভাষা।—কারারুদ্ধ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে মুক্তিলাভের জন্য সে ব্যগ্র, কারা-কক্ষে তার অন্তরাত্মা পীড়িত, কিন্তু মৃত্যুবিভীষিকা তাতে নেই আদৌ। এই মহাপ্রাণের প্রতি ডিউকপুত্র তরুণ ফার্ডিনাণ্ড একান্ত আকৃষ্ট, কিন্তু পিতার কূটনীতির কাছে হার মেনে সে মর্মাহত।

আর এই বীরের প্রতি অনুরাগিণী ক্লারা বা ক্ল্যারখন—এক সাধারণ নাগরিকের কন্যা। এগ্‌মণ্ট তাকে প্রাণ ভরে' ভালবাসে, কিন্তু এত ভালবাসলেও ভালবাসার দ্বারা বন্দী সে নয়। ক্ল্যারখনের প্রতি অপর একজন নাগরিক-পুত্রের ভালবাসাও অতি গভীর; ক্ল্যারখন তার প্রতি ভগিনীর মতো স্নেহবতী; কিন্তু তার হৃদয়-সিংহাসনে সমাসীন এই অপূর্ব-প্রভাময় এগ্‌মণ্ট—এগ্‌মণ্টের প্রেমে তার সমস্ত সত্তা প্রাণে পবিত্রতায় সঞ্জীবিত। এগ্‌মণ্টের বন্দী হওয়ার সংবাদে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে জন-সাধারণকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হয়ে বিষপান করে। শেষ দৃশ্যে এগ্‌মণ্ট স্বপ্নে দেখছে ক্লারাকে স্বাধীনতার ধ্বজাবাহিনী রূপে।

ক্লারার এই গান বিখ্যাত :

কত সুখ
কত দুখ
কত চিন্তা আর;
পথ চাওয়া
মন পোড়া
যাতনা অপার;
দুঃখী আমরণ—
বিহরে সে উচ্চ স্বর্গে
আপন মনে খুশী
প্রেমিক যে জন।

রবার্টসন বলেন, গ্যেটের চরিত্রের যে আনন্দময় দিক সেটি ফুটেছে এগ্‌মণ্টে যেমন তাঁর গাম্ভীর্য ফুটেছে ফাউস্‌টে।—ক্লারা চরিত্রে লুইস দেখেছেন ফ্রীডেরিকার ছবি—মানী গ্যেটের প্রতি গ্রাম্য যাজককন্যার প্রেম ও সম্ভ্রম।

তাস্‌সো

Gerusalemma Leberata (জেরুশালেম-উদ্ধার) কাব্যের রচয়িতা তার-কোয়াস্তো তাস্‌সো-র (Tarquanto Tasso) জীবন-কাহিনী অবলম্বনে গ্যেটের তাস্‌সো নাটক রচিত। যৌবনেই এই অসাধারণপ্রতিভাশালী কবির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে—রাজকুমারী ল্যুক্রেশিয়ার প্রতি তাঁর ব্যর্থ প্রেমই নাকি এর একটি কারণ—আর বহু দুঃখভোগের পরে তাঁর জীবন-লীলার অবসান হয়। গ্যেটের এই নাটকটি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক—ব্যর্থ প্রেম আর রাজসভাসদদের ঈর্ষা ও অনুভূতির স্থূলতা তীক্ষ্ণ-অনুভূতিসম্পন্ন কবির পক্ষে কত বেদনাদায়ক তারই নিপুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এতে। সমালোচকরা বলেন, এতে অনুভূতি-দীপ্ত তরুণ কবি ও সংসার-অভিজ্ঞ প্রবীণ রাজ-নীতিজ্ঞের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব অঙ্কিত হয়েছে তাতে কবিকেই জয়যুক্ত দেখাবার ইচ্ছা প্রথমে গ্যেটের ছিল, কিন্তু পরে বদ্‌লে অনুভূতিসর্বস্ব কবিকে তিনি এঁকেছেন মুখ্যত ব্যাধিগ্রস্তরূপে।

জ্ঞানগর্ভ উক্তির প্রাচুর্যে এই নাটকখানি গৌরবান্বিত। সহজেই বোঝা যেতে পারে ভাইমার-দরবারে কবির নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা এতে রূপলাভ করেছে। এর রাজকুমারীর পরিকল্পনায় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন শার্লোট ফন ষ্টাইন।

এর নায়ক নায়িকা পাঁচজন: দ্বিতীয় আলফান্‌সো—ফেরারা-র ডিউক; এলিওনারা—ডিউকের ভগিনী, সাধারণত রাজকুমারী নামে পরিচিতা; লিওনারা সান্‌ভিতালে—স্কান্দিয়ানো-র ডিউকের পত্নী; কবি তাস্‌সো; আন্তোনিও মন্তেকাতিনো—রাজমন্ত্রী।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ভার্জিল ও আরিওস্‌তো-র প্রস্তর-মূর্তি শোভিত উদ্যানে রাজকুমারীর ও লিওনারার আলাপ। তা'রা গ্রাম্য কুমারীদের সাজে সজ্জিতা। বসন্তের আবির্ভাবে সব সজীব হয়ে উঠেছে, সেই সজীবতা তাদের অন্তরে। তা'রা ভার্জিল ও আরিওস্‌তো-র মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। জ্ঞানের আনন্দ, কবিত্ব, ফেরারা-র সাহিত্যিক গৌরব, এসব সম্বন্ধে তাদের আলাপ চলেছে। রাজকুমারী বিদুষী মায়ের বিদুষী কন্যা, লিওনারাও মার্জিতরুচি। কথায় কথায় এদের উভয়ের প্রতি কবি তাস্‌সো-র শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা উঠ্‌লো। লিওনারা বলছে:

রাজকুমারীর মহিমা তার ধ্যানের সামগ্রী,
আর আমার লঘুতা তাকে উৎফুল্ল করে।
ভাল সে বাসে না কাউকে;
তার প্রেমের স্বপ্নকে সে দিয়েছে আমাদের নাম।
আমাদের মনের ভাবও তার মতো; মনে হয়
আমরা তাকে ভালবাসি, কিন্তু তাতে
আমরা ভালবাসি আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবনা।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজকুমারী, লিওনারা ও ডিউকের কথোপকথন। ডিউক বলছেন কদিন ধরে' কবির দেখা মিলছে না; রাজকুমারী ও লিওনারা বলছে, কবি এখন তার কাব্য শেষ করতে ব্যস্ত, তার জন্য একলা থাকাই ভাল। ডিউক বলছেন, ক্ষুদ্র পরিসর মহত্তের বিকাশের অনুকূল নয়, তার উপরে পড়া চাই তার নিজের দেশের ও বিশ্বজগতের প্রভাব, নিন্দা প্রশংসা দুইই তার জন্য চাই, তাতেই তার কাছে সুস্পষ্ট হবে নিজের মূল্য ও অপরের মূল্য। এর উত্তরে লিওনারা এই বিখ্যাত মন্তব্য করে:

প্রতিভা বিকশিত হয় নিঃসঙ্গতায়—
কিন্তু চরিত্র বিকশিত হয় সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে।

কিন্তু তাস্‌সো যে দিন দিন সন্দেহপ্রবণ হচ্ছে, তাকে আনন্দিত রাখা কঠিন, তার চিকিৎসার প্রয়োজন, এসব কথাও তাদের হয়।

তৃতীয় দৃশ্যে তাস্‌সো তার নূতন কাব্য ডিউককে উপহার দিচ্ছে। কবির কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই; দুঃস্থ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে' ডিউক যে তাকে দিয়েছেন তার প্রতিভা বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ সেসব কথা গভীর আবেগের সঙ্গে সে বলছে। কবির প্রতিভা ও বিনয় দুইই ডিউকের আনন্দের বিষয়। ভার্জিলের মস্তকে যে পুষ্প-মুকুট ছিল ডিউকের ইঙ্গিতে লিওনারা তা কবির মস্তকে স্থাপন করতে গেল। কবি মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো, বল্লে, এমন সম্মান লাভ করার পরে সে বেঁচে থাকবে কেমন করে'! লিওনারার হাত থেকে পুষ্পমুকুট নিয়ে রাজকুমারী কবির মাথায় পরিয়ে দিতে গেল, কবি নতজানু হয়ে সেটি গ্রহণ করলে। তার চিত্ত মহা আন্দোলিত।

চতুর্থ দৃশ্যে এদের সঙ্গে এসে মিললো রাজমন্ত্রী আন্তোনিও, রোম থেকে, দৌত্যের অবসানে। সে দৌত্যে সফলকাম হয়েছে এজন্য ডিউক আনন্দ প্রকাশ করছেন ও তার সম্বর্ধনার কথা বলছেন; কবি তাস্‌সো তার অসামান্য কবিপ্রতিভার জন্য আজ সম্মানিত হয়েছে, সে-কথাও তিনি আন্তোনিওকে বললেন। আন্তোনিও শুধু বললে, ডিউকের সমাদর তুলনাহীন, আর আরিওস্‌তো-র কথা তুলে' তাঁর কবিপ্রতিভার উচ্চ

প্রশংসা করলে। ডিউকের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল আন্তোনিও, রাজকুমারী ও লিওনারার অনুসরণ করলে কবি।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজকুমারী ও তাস্‌সো-র কথোপকথন। আন্তোনিওর ব্যবহারে তাস্‌সো বেশী খুশী হতে পারে নি, কিন্তু রাজকুমারী তাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে আন্তোনিও কবির হিতৈষী ভিন্ন আর কিছু নয়। রাজকুমারীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীও সুপণ্ডিতা, সে-ই কবিকে হাজির করে রাজকুমারীর সামনে; কবির প্রতি তার সেই ভগিনীর ও তার ভ্রাতার (ডিউকের) সদয়তার কথা ওঠে, কবি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায় কিন্তু আন্তোনিও সম্বন্ধে বলে: দেবতারা তাকে বহু গুণে গুণী করেছেন কিন্তু সৌজন্যের দেবতাদের আশীর্বাদে সে বঞ্চিত, আর এর অভাব যাতে সে যত গুণবান্ হোক মানুষের নির্ভরস্থল নয়। লিওনারা-র কথা ওঠে, কবি তার প্রশংসা করে কিন্তু বলে: তার কাছ থেকেও সে একটু দূরে থাকতে ভালবাসে, তাতে সদয়তার অভাব নেই কিন্তু তার সদয় উদ্দেশ্য সহজেই হয়ে পড়ে ব্যক্ত, তাতে গ্রহীতা কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করে। রাজকুমারী বলে: যে সহৃদয়তা ও সাহচর্যের কথা কবি তুলেছে তা দুর্লভ হয়ে পড়েছে, তা কেবল রয়েছে মানুষের স্বর্ণযুগের স্বপ্নে। এই স্বর্ণযুগের কথায় কবির কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, সে অতীতের স্বর্ণযুগের এক মোহন বর্ণনা দিলে—যে যুগে ছিল অপার সৌন্দর্য ও অবাধ স্বাধীনতা, মানুষ তাই করতে পারতো যা তার মন চায়। রাজকুমারী বল্লে, কবিদের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বর্ণযুগ হয়ত আজো তেম্‌নি আছে যেমন ছিল সেকালে কেননা যা আজ নেই ছিল না তা কোনোদিন, আজো এই সুন্দর জগতে সমপ্রাণ বন্ধুদের মিলন হয়, তবে সেই স্বর্ণযুগের বর্ণনা একটু ভিন্ন ভাবে দেওয়া দরকার—এই স্বর্ণযুগে মানুষের তাতেই অধিকার আছে যা সঙ্গত। এই 'সঙ্গত' কথাটির ব্যবহারে পুরুষ ও নারীর মনোভাবের বিভিন্নতার কথা ওঠে; রাজকুমারী বলে, নারী চায় শৃঙ্খলা, পুরুষ চায় অবন্ধন। কবি বলে, তাহলে কি পুরুষ অনুভূতিহীন বর্বর? রাজকুমারী বলে, পুরুষ চিরধাবিত বিচিত্রের আকর্ষণে কিন্তু নারীর আকাঙ্ক্ষা স্বল্প, সে একজনকে নিয়েই খুশী যদি তার উপরে নির্ভর করতে পারে, কিন্তু হায় নারীর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, পুরুষ তাতে কেবল চায় মনোহারিত্ব, তার অন্তরে যে বিশ্বস্ততা ও প্রেম সঞ্চিত রয়েছে তার দিকে পুরুষের দৃষ্টি নেই, যদি সেদিকে তার দৃষ্টি থাক্‌তো তবে নারীর ব্যাধি ও জরার সমস্ত দুঃখ দূর হতো—তার জন্য নেমে আস্‌তো স্বর্ণযুগ। এই থেকে ওঠে রাজকুমারীর বিবাহের কথা, কবি বলে, এটি স্বাভাবিক, তবু তার ভক্তরা ভাবতে পারে না তার বিচ্ছেদ তারা কেমন করে সহ্য করবে। রাজকুমারী বলে, তার আশু সম্ভাবনা নেই; সে কবিকে আনন্দে দিন কাটাতে বলে এবং তার কাব্যে যে নারীর মহিমা গীত হয়েছে সেজন্য আনন্দ প্রকাশ করে। কবি বলে, তার কারণ, অস্পষ্ট কল্পনা থেকে তার গানের উৎপত্তি নয়, তার স্তবগান উত্থিত হয়েছে এক অচঞ্চল

মহিমার পানে—সে সেই সৌন্দর্য ও মহিমাই বর্ণনা করেছে যা নিজের চোখে দেখেছে; তার কাব্য কালজয়ী কেননা তা এক মহৎ প্রেমের বিনীত কুণ্ঠিত নিবেদন। রাজকুমারী বল্লে, এর আর একটি গুণ এই যে এটি শুনতে মন প্রলুব্ধ হয়, শুনতে শুনতে মনে হয় যেন বোঝা যাচ্ছে কবি কি বলছে, কিন্তু তাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় না, সে তার গান দিয়ে আমাদের মন জয় করে' নেয়। এতে কবি মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো; কিন্তু রাজকুমারী তাকে সংযত করলে এই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে:

ক্ষান্ত হও তাস্‌সো। আছে সম্পদ হেন
বল যারে নিতে পারে জিনে; কিন্তু ভাবো
তারো কথা যে সম্পদ লভ্য নহে বলে—
যারে লভে দমী মিতাচারী। সে সম্পদ
মনুষ্যত্ব, সে সম্পদ প্রেম, যুক্ত যাহা
মনুষ্যত্ব সনে; রাখিও স্মরণে ইহা।

দ্বিতীয় স্বর্গে কবির স্বগতোক্তি। রাজকুমারীর কথায় সে আনন্দ ও উদ্দীপনার সপ্তম স্বর্গে উপনীত হয়েছে। তার একটি কথা এই:

অযাচিত হেন বর অযোগ্যের প্রতি
জাগায় পুলক অতুলন: কিবা ছার
এর কাছে যোগ্যতার দাবি অর্বাচীন!

তৃতীয় দৃশ্যে আন্তোনিওর আগমন। কবি তার বন্ধুত্বলাভের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আন্তোনিও উদ্দীপনাহীন। কবিকে সে ধীর স্থির হতে উপদেশ দিচ্ছে। কবি তবু তার স্নেহপ্রার্থী। কিন্তু তার কথাবার্তা থেকে যখন কবি বুঝলো যে-সম্মান সে আজ লাভ করেছে আন্তোনিওর মতে তার যোগ্য সে নয় তখন সে ক্ষুণ্ন হলো। তাদের কথাবার্তা ক্রমেই কটু হয়ে উঠতে লাগলো। অবশেষে আন্তোনিওর উত্তাপহীন তাচ্ছিল্যে কবির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে আন্তোনিওকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করে' তালোয়ার খুলে দাঁড়ালো!

চতুর্থ দৃশ্যে ডিউকের আগমন। তাস্‌সো ও আন্তোনিওকে এমন বিবাদরত দেখে তিনি বিস্মিত। তাস্‌সো বল্লে, আন্তোনিও তাকে ভয়ানক অপমান করেছে; আন্তোনিও বল্লে, এই উত্তেজনাপ্রবণ যুবক রাজপ্রাসাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে, সেজন্য ডিউকের কাছে সে সুবিচারপ্রার্থী। ডিউক কবির মর্মবেদনা অনেকখানি বুঝলেন; কিন্তু কবি যে অস্ত্র আস্ফালন করে' আইন লঙ্ঘন করেছে এজন্য তাকে কিছুকালের জন্য তার নিজের কামরায় বন্দী থাকতে আদেশ দিলেন। এতে তাস্‌সো অত্যন্ত মর্মাহত হলো। তার মনের সমস্ত আশা-আনন্দ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে তার তরবারি ও পুষ্পমুকুট রাজপদতলে রেখে বন্দিজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হলো।

পঞ্চম দৃশ্যে আন্তোনিও ও ডিউকের কথোপকথন। আন্তোনিও বলছে, এমন উত্তেজনা-প্রবণ যুবকের শাস্তি হওয়া ভাল তাতে সে শোধরাবে; ডিউক বলেছেন, হয়ত শাস্তির মাত্রা অনেক বেশী হয়ে গেছে। আন্তোনিও বলছে, তাহলে দ্বৈরথ যুদ্ধে মিটুক দু'জনের মান-অপমানের দাবি। ডিউক তখন আন্তোনিওকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তাস্‌সোর সঙ্গে বিবাদের পরিবর্তে আন্তোনিওর জন্য এবং শোভন তাস্‌সোর স্নেহময় গুরুজনের ভূমিকা গ্রহণ করা। আন্তোনিও বিচক্ষণ রাজপুরুষের মতো রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করলে।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজকুমারী ও লিওনারা'র কথাবার্তা। কবির এই বিপত্তিতে রাজকুমারী ব্যথিত হয়েছে। লিওনারা বলছে কিছুদিনের জন্য কবির ফেরারা ত্যাগ করে' রোমে চলে যাওয়া উচিত। রাজকুমারী কবির সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হতে চায় না কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা রাজি হচ্ছে। তৃতীয় দৃশ্যে লিওনারার স্বগতোক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে ফেরারা থেকে কবিকে দূরে পাঠাবার সংকল্পের মূলে রয়েছে লিওনারার ঈর্ষা,- রাজকুমারী যে কবির বিশেষ পূজা পাবে এতে তার আপত্তি, কবির স্তবগানের পাত্রী হয়ে জগতে স্মরণীয়া হতে তারও লোভ। চতুর্থ দৃশ্যে লিওনারা ও আন্তোনিওর কথোপকথন। হঠাৎ কেন তাস্‌সোর সঙ্গে তার বিবাদ হলো আন্তোনিও তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখছে। সে বহু কারণের কথার উল্লেখ করলে, শেষে তার সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো, এর মূল কারণ কবির প্রতি রাজপুরীর পক্ষপাত—অনেক সম্মান অন্যের সঙ্গে ভাগ করে' ভোগ করা যায় কিন্তু পুষ্পমুকুট ও নারীর প্রসন্ন হাসি নয়। কিন্তু তাস্‌সোর ফেরারা ত্যাগ সে অনুমোদন করলে না কেননা কবি ডিউকের প্রিয়পাত্র, সেজন্যে কবির ও তার মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টাই এখন কর্তব্য। পঞ্চম দৃশ্যে লিওনারা ভাবছে, কেমন করে' তার সংকল্পে কবির সম্মতি আদায় করবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে তাস্‌সোর উৎকট সন্দেহপ্রবণতা অথবা অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয়। লিওনারা, আন্তোনিও, ডিউক, কারো কোনো কথা সে গ্রহণ করছে না—সব কথারই বিপরীত ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু এ অবস্থায়ও মাঝে মাঝে জ্ঞানগর্ভ ও প্রদীপ্ত বাণী তার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে। সে তার কাব্য নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে ফেরারা ত্যাগ ক'রে যেতে প্রস্তুত। এই অবস্থায় একবার রাজকুমারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। রাজকুমারীর সামনে তার হৃদয়াবেগ প্রচণ্ড হয়ে উঠল, সে সবেগে তাকে বক্ষে আকর্ষণ করলে; রাজকুমারী দৃঢ়বলে নিজেকে নিষ্ক্রান্ত করে নিলে। কবি উন্মাদ হয়ে গেছে এ বিষয়ে আর কারো সন্দেহ রইল না।

কবির প্রতি আন্তোনিওর মনোভাবে পরিবর্তন ঘটেছে—তার নিজের মহানুভবতার গুণে না প্রভুর প্রীত্যর্থে তা বলা কঠিন; কবিকে শান্ত করতে সে এখন চেষ্টিত। কবির শেষ উক্তির কটি চরণ এই—আন্তোনিওকে সে বলছে:

ওগো মহান্, তুমি দাঁড়িয়ে আছ যেন পর্বত
আর আমি বাত্যাতাড়িত তরঙ্গ।
কিন্তু তোমার শক্তির গর্ব করো না। ভাবো,
প্রকৃতি পাহাড়কে দিয়েছে স্থিরতা
আর তরঙ্গকে দিয়েছে অস্থিরতা—
ঢেউ বাতাসের বেগে ফুলে' ফুলে' ওঠে, তাণ্ডব নৃত্য করে,
দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেয় ফেনরাশি,
কিন্তু সেই ঢেউয়ের বুকেই শোভা পায় সূর্যের মহিমা,
শাশ্বত তারার দীপ্তি।

ক্রোচের মতে কবি তাস্‌সোর এই যে ব্যাধিগ্রস্ত মনোভাব যে সে নির্বান্ধব, তার চারিদিকে নির্মম শত্রু, তার এক শক্তিশালী বিবৃতি তাস্‌সো নাটকে রয়েছে; কিন্তু এতে আবেগের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে জ্ঞানবত্তা—অবশ্য আবেগময় জ্ঞানবত্তা; এটিও কাব্য, তবে এর কাব্যধর্ম কিঞ্চিৎ পরিম্লান।—কিন্তু অন্যান্য সমালোচক তাস্‌সোকে খুব উঁচুতে স্থান দেন। রবার্টসন গ্যেটের এই তিনখানি গ্রন্থকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলতে চান—ইফিগেনিয়া, তাস্‌সো আর ফাউস্‌ট। তাঁর মতে তাস্‌সো পরবর্তীকালের উচ্চশ্রেণীর মনস্তত্ত্বমূলক নাটকসমূহের অগ্রদূত।

প্রত্যাবর্তন

গোটে ভাইমারে ফিরে এলেন যেমন শিল্পসম্ভার সঙ্গে নিয়ে তেম্‌নি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে। ইতালিতে থাকতেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্বন্ধে ডিউককে এই পত্রখানি তিনি লেখেন:

আমাকে এই যে অমূল্য অবসর দিয়েছেন সেজন্য আমি একান্ত কৃতজ্ঞ। নব যৌবন থেকেই আমার মনের গতি হয়েছিল এই দিকে, কাজেই এই পরিণতি লাভ না করে' আমার পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব ছিল। আমার কর্মজীবনের সূত্রপাত আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে, দীর্ঘ দিন পরে সেই সম্পর্ক থেকে আর এক নূতন সম্পর্ক উদ্ভূত হোক। সত্যই আমি বলতে পারি এই আঠারো মাসের নির্জনতায় আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি। কিন্তু কি ভাবে? শিল্পী ভাবে। এর বেশী কি আমার দ্বারা সম্ভবপর তার বিচার ও ব্যবস্থা আপনি করবেন। সারা জীবন আপনি দেখিয়েছেন মানুষের মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনার রাজোচিত জ্ঞান; আপনার সেই জ্ঞান বিকশিত হয়ে চলেছে, আপনার

চিঠিপত্র থেকে সে প্রমাণ আমি পেয়েছি ; আপনার সেই বিচার-ক্ষমতার সামনে সানন্দে নিজেকে উপস্থাপিত করছি।....আপনার পার্শ্বে আমার জীবনকে পূর্ণ সার্থকতা দানের সুযোগ আমার লাভ হোক, তাহলে নব-নির্মুক্ত পূত উৎসধারার মতো আমার শক্তি ইতস্ততঃ বহু ব্যাপারে নিয়োজিত হতে পারবে। এরই মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছি এই ভ্রমণে আমার কি উপকার হয়েছে, আমার জীবন এতে কত নির্মল ও উজ্জ্বল হয়েছে। যেমন এ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি তেমনি ভবিষ্যতেও আমার কথা মনে রাখবেন ; নিজের জন্য আমি যা করতে পারি আমার জন্য আপনি তার চাইতে বেশী করেন, যত দাবি করতে পারি তার চাইতেও বেশী। পৃথিবীর এক বৃহৎ ও সুন্দর অংশ সম্বন্ধে এই যে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে এর পরে আপনাদের সংস্রবেই জীবন কাটাবার ইচ্ছা আমাতে জেগেছে। পূর্বের চাইতেও আপনার বেশী কাজে লাগ্‌তে পারবো এখন আশা করছি যদি শুধু আমার যোগ্য কাজ আমাকে করতে দেন আর অন্য কাজের ভার দেন অন্যদের 'পরে। আপনার বিভিন্ন পত্রে আমার প্রতি আপনার যে প্রীতি ব্যক্ত হয়েছে তা এত সুন্দর, এমন সশ্রদ্ধ, যে তাতে মনে মনে লজ্জা বোধ করি, মাত্র এই বলতে পারি—প্রভু, এই আমি হাজির, তোমার যা খুশী এই দাসকে দিয়ে করাও।

ডিউক কবির প্রার্থনার মর্যাদা রক্ষা করলেন। নতুন ব্যবস্থায় কবিকে অন্যান্য সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিজ্ঞান ও শিল্প-গবেষণা আর রঙ্গমঞ্চ ও খনির ভার দেওয়া হলো। কিন্তু দুঃখিত চিত্তে কবি ইতালির আকাশ বাতাস পরিত্যাগ করে' এসেছিলেন, ভাইমারে ফিরে এলে তাঁর সে দুঃখ বেড়েই চল্‌ল। তাঁর এত যত্নের নতুন ইফিগেনিয়া ভাইমারের সমঝদারদের আনন্দ দান করতে অসমর্থ হলো। কবি হয়ত আশা করেছিলেন তাঁতে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে ভাইমার-সমাজও অন্ততঃ কয়েক পা সেদিকে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু শিলারের 'দস্যু' ও এই জাতীয় নাটক নিয়ে ভাইমারের সমাজ তখনো মশগুল, অর্থাৎ সেই গ্যোৎস্ ও 'ঝড় ঝাপটা'র যুগে তিনি শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে যে ভাববিলাসের স্তরে ছিলেন এখানকার রসিকদল মহা আনন্দে সেই স্তরেই দিন কাটাচ্ছিলেন। কবির রচনাবলীর নবসংস্করণও আদৃত হয় নি। তাঁর প্রকাশক জানালেন, তাঁদের লাভ ত হয়ইনি বরং ক্ষতি হয়েছে। কবি কিন্তু তাঁর নবলব্ধ আদর্শে অটল রইলেন ; সবাই দেখ্‌লো তিনি আগেকার চাইতে অনেক কম মিশুক হয়ে পড়েছেন।

এর উপর তাঁর দুঃখের কারণ হলো তাঁর পরমপ্রীতিপাত্রী শার্লোট ফন ষ্টাইনের সঙ্গে সম্বন্ধ। তাঁকে না বলে' কবি যে ইতালি যাত্রা করেছিলেন সেটি শার্লোট ক্ষমা

করতে পারেন নি। ইতালি থেকে কবি অবশ্য তাঁকে বহু পত্র দেন, কিন্তু শার্লোটের অন্তরে এই সন্দেহ প্রবল হয়েছিল যে তাঁর প্রতি কবির অনুরাগ পূর্বের অবস্থায় আর নেই, কবির সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর প্রসন্নতা আর প্রকাশ পেল না।

তবে ডিউকের বন্ধুত্ব যে কবির জন্য অটুট রইল এতে কবি ভাইমারে শিল্পজ্ঞান বিস্তারের এক বড় সুযোগ পেলেন। নতুন নতুন ছবি, মূর্তি, ভাইমারে আনা হলো, নতুন নতুন শিল্পাচার্যও এলেন। ভাইমার-রাজ্যের যে আয় সে তুলনায় যথেষ্ট খরচ এই ব্যাপারে ডিউক মঞ্জুর করলেন।

গ্যেটে ইতালি থেকে ফিরে এলেই শিলার তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যগ্র হন। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর শীগ্‌গির লাভ হয় না। গ্যেটেও পাশ কাটিয়ে চলছিলেন। শিলার যে শক্তিমান সেকথা তিনি বুঝছিলেন কিন্তু তাঁর 'ঝড়-ঝাপটা'-বাদ গ্যেটের বর্তমান শিল্পবোধকে আহত করছিল। তাঁদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবার পূর্বে শিলারের মনে কি অশান্তি ও আন্দোলন চলেছিল তার সুন্দর পরিচয় রয়েছে শিলারের এই সময়ের দু'খানি পত্রে—পত্রগুলো তাঁর বন্ধু ক্যোর্ণেরকে লেখা :

> ১২ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ···এইবার গ্যেটের সম্বন্ধে কিছু বলে' তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারবো। মনে মনে যা আশা করেছিলাম ঠিক তেমনটি প্রথম দর্শনে তাঁকে মনে হয়নি। তিনি মধ্যমাকৃতির। খুব সোজা দাঁড়ান, চলার ভঙ্গি সহজ নয় কঠিন, মুখের ভাব খুব খোলামেলা নয়; কিন্তু তাঁর চোখ খুব ভাবব্যঞ্জক ও সতেজ, চাহনি আনন্দ দান করে। মূর্তি তাঁর যদিও খুব গম্ভীর তবু তাঁকে মনে হয় যথেষ্ট উদার ও সদয়। তাঁর রং রোদে-পোড়া, বয়স যা দেখায় তার চাইতে বেশী। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, বলবার ভঙ্গি অনর্গল, প্রাণবন্ত, উৎসাহউদ্দীপনাপূর্ণ—শুনতে আনন্দ লাগে; আর তাঁর মেজাজ যখন ভাল থাকে—এবার তেম্‌নি মেজাজে তাঁকে পেয়েছিলাম—ইচ্ছা করেই তিনি বহু কথা তোলেন যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে। শীগ্‌গিরই আমাদের পরিচয় হলো, আর অনায়াসে। বহু লোক এসেছিলেন, প্রত্যেকেই তাঁকে পাবার জন্য ব্যগ্র, কাজেই আমার পক্ষে একলা তাঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ কিংবা বিশেষ বিষয়ে কথাবার্ত বলা সম্ভবপর হয়নি। ইতালি সম্বন্ধে তিনি খুব উচ্ছ্বসিত····মোটের উপর বলতে পারি তার সংস্রবে এসে তাঁর সম্বন্ধে আমার উঁচু ধারণা খাটো হয়নি; কিন্তু সন্দেহ হয়, হয়ত কোনোদিনই তাঁর ও আমার মধ্যে অন্তরঙ্গতা সম্ভবপর হবে না। আমি এখন যা নিয়ে ব্যস্ত তার অধিকাংশই তাঁর কাছে এখন অতীতের সামগ্রী; বয়স তাঁর যত তার তুলনায় অভিজ্ঞতা ও আত্মোৎকর্ষ তাঁর লাভ হয়েছে অনেক বেশী, তিনি আমার

চাইতে এত বেশী অগ্রসর যে তাঁর নাগাল যে কখনো ধরতে পারবো তার কোনো সম্ভাবনা নেই; আর তাঁর জীবন আর আমার জীবনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে, তাঁর জগৎ ও আমার জগৎ এক নয়, আমাদের ভাবনা চিন্তার ধারাও স্বতন্ত্র। সময়ে সব বোঝা যাবে।

অন্য পত্রখানি পরের ফেব্রুয়ারীতে লেখা:

গ্যেটের সাহচর্য বেশী লাভ করে' আমি অসুখীই হব, খুব কাছের বন্ধুদের সঙ্গে তিনি কখনো মন খুলে মেশেন না; আমার ধারণা তিনি অসাধারণ-ভাবে আত্মম্ভরী। মানুষের মন জয় করবার ক্ষমতা তাঁর আছে, তাদের প্রতি অল্পবিস্তর হৃদ্যতা দেখিয়ে তাদের মনকে ধরে' রাখতেও পারেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সব সময় তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেও তিনি জানেন। নিজের প্রভাবকে তিনি অনুভূত করান কৃপার ভঙ্গিতে, দেবতার মতো, কিন্তু পুরোপুরি ধরা দেন না; আমার মনে হয় এটি তাঁর সুপরিকল্পিত, এর ভিতর দিয়ে তাঁর লাভ হয় নিবিড় আত্মতোষণ··· এর জন্য আমি তাঁকে ঘৃণা করি যদিও তাঁর প্রতিভাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসি আর তাঁকে খুব উচ্চে স্থান দিই। তিনি আমার অন্তরে জাগিয়েছেন প্রেম ও বিতৃষ্ণার এক অদ্ভুত মিশ্রণ—ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের অন্তরে যেমন ভাব জেগেছিল সীজারের প্রতি কতকটা তার মতো। আমি যেন তাঁর প্রাণনাশ করে' তাঁকে প্রাণ ভরে' ভালবাসতে পারি। এই লোকটি, এই গ্যেটে, চিরদিন আমার পথের অন্তরায়; তাঁকে দেখে' সব সময়ে আমার মনে হয় ভাগ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর। তাঁর প্রতিভা কত সহজে তাঁকে ভাগ্যের ভ্রূকুটির ঊর্ধ্বে স্থাপন করছে! আর আমাকে আজো করতে হচ্ছে কি সংগ্রাম!

ক্রিস্তিয়ানা

ভাইমারে ফিরে আসবার কিছুদিন পরে জুলাইয়ের প্রারম্ভে কবি একদিন তাঁর বাগানে পায়চারি করছিলেন, এমন সময়ে এক তরুণী পরমশ্রদ্ধাপুরঃসর তাঁর হাতে একখানি দরখাস্ত দিলেন। এই তরুণীর নাম ক্রিস্তিয়ানা ফুল্‌পিউস্, তাঁর দরিদ্র সাহিত্যজীবী ভ্রাতার একটি পদ-প্রাপ্তি-সম্পর্কে কবিশ্রেষ্ঠের সমীপে তাঁর এই আবেদন। এই তরুণীর বয়স তেইশ বৎসর, কুমারী, বেরটুশের ফুলের কারখানায় কাজ করে' জীবিকা অর্জন করতেন, লেখাপড়া যা জানতেন তা সামান্য। কিন্তু তাঁর নিটোল যৌবনকান্তি কবিকে একান্ত মুগ্ধ করলো—যে ইতালি তিনি ত্যাগ করে' এসেছেন তার

নির্মল আকাশের সৌন্দর্য তার ঐতিহ্যের মাধুর্য যেন তাঁর সামনে মূর্তি ধরে' দেখা দিল এই তরুণীর লাবণ্যে। অচিরেই কবি তাঁকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করলেন। এঁর উদ্দেশ্যে কবির একটি কবিতা এই :

বেড়াচ্ছিলাম উপবনে,
ছিল না কোনো লক্ষ্য ;
করছিলাম শুধু পায়চারি—
সেই ছিল এক ভাবনা।

দেখলাম ছায়ায়
ফুটেছে ছোট্ট ফুল
ঝকঝক করছে তারার মতো
তার সুন্দর চোখ।

ভাবলাম তুলব এ ফুল,
বল্লে সে মৃদুভাষে :
আমার শোভা নষ্ট করতে
কেন ছিঁড়বে আমাকে ?

খুঁড়লাম মাটি, তুললাম
শিকড় সমেত,
আনলাম আমার সুন্দর বাড়ীর
ঘেরা বাগানে।

রোপিত হয়ে
ঘেরা জায়গায়,
চলছে তার বাড়—
ভরছে ফুলে ফুলে।

ইনি কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের জননী হন দেড় বৎসর পরে; কিন্তু এঁকে কবি বিধিবদ্ধভাবে বিবাহ করেন বহু দেরীতে—১৮০৬ খৃষ্টাব্দে। বলা বাহুল্য এজন্য ভাইমার-সমাজ কবিকে ক্ষমা করে নি—বিশেষ করে' এইজন্য যে ক্রিস্তিয়ানা ছিলেন পদমর্যাদা-হীন—তাঁর জাতিও বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা করেনি। গ্যেটে নিজে প্রথম থেকেই প্রকাশ করেন তিনি ক্রিস্তিয়ানার সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন; তবু তিনি প্রথমেই কেন তাঁকে বিধিবদ্ধভাবে বিবাহ করেন নি এ সম্বন্ধে সদুত্তর পাওয়া কঠিন।

ক্রিস্‌তিয়ানা নিজে নাকি বহুদিন পর্যন্ত গ্যেটের পত্নীত্বের অধিকার চান নি—তিনি নিজেকে সে-সম্মানের অযোগ্য জ্ঞান করতেন।—আমাদের মনে হয়েছে, ক্রিস্‌তিয়ানার সঙ্গে যখন গ্যেটের মিলন হয় তখন তিনি খৃষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি খুব বিরূপ ছিলেন আর প্রাচীন অখৃষ্টান স্বভাবানুগ জীবনধারার পক্ষপাতী ছিলেন, সেই পক্ষপাতিত্বের জন্য ক্রিস্‌তিয়ানার ও তাঁর পরস্পরের প্রতি নিবিড় প্রেম ও নির্ভরতাই হয়ত যথাযোগ্য বন্ধন জ্ঞান করেছিলেন।†

ক্রিস্‌তিয়ানা কবির গৃহ শৃঙ্খলাপূর্ণ করেন ও সন্তান উপহার দিয়ে কবির বহুদিনের পিতৃত্বের ক্ষুধা মেটান। কিন্তু তাঁর সব চাইতে বড় গৌরব এই যে তাঁর সংস্পর্শ লাভ করে' কবি লিখতে পেরেছিলেন তাঁর 'রোমক গাথা' (Roman Elegies)। ক্ষুদ্রকায় এই কাব্যখানি, কিন্তু সমালোচকদের মতে এটি গ্যেটে-প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ দান। এই কাব্য আদিরসাত্মক—প্রাচীন রোমান কবি Tibullus, Catullus ও Propertius-এর ভঙ্গিতে লেখা। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, প্রাচীন কবিদের ভাবধারায় গ্যেটে তাঁদের চাইতেও মহত্তর কাব্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। লুইসের অভিমত এই:

> এইসব রোমক গাথায় প্রাচীন রীতির জগৎ পুনরায় জীবন পেয়েছে, এমন কি কখনো কখনো মনে হয় হয়ত আমাদের কবিই প্রাচীনদের সঙ্গে তুলনায় যথার্থতর প্রাচীন।...কবির যে সহজ নিঃশঙ্ক ভোগানন্দ ও দ্বিধাবর্জিত বাসনাপ্রাবল্য সেটিও প্রাচীন রীতির, কিন্তু এই প্রাবল্যে তাঁর অন্যান্য প্রয়াস অবলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং সেই সব প্রয়াসের সহায় হয়েছে এই প্রাবল্য।

কবিতাগুলোর কিছু কিছু ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত হচ্ছে।

'অনুকূল মুহূর্ত' সম্বন্ধে কবি বলছেন:

Aye, we acknowledge ye gladly, ye are our prayers
and our service
Daily offered to One—She is the chosen of all
Goddess this of our hearts—Opportunity : learn
yet to know her!
Him the swiftly-deciding, swiftly-acting, she smiles on,
Him she meekly obeys, sportive and tender and kind.
Once to me she appeared, an olive-brown girl,
and her tresses,
Dusky and rich, like a cloud covered her head and fell ;
Tiny ringlets curbed round her neck in delicate beauty,

† এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত পঞ্চম ইংরেজি কবিতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ দ্রষ্টব্য।

Loose, unwoven, the hair sprang in thick
waves from her head ;
And I mistook her not then, I caught at her
passing and swiftly,
Docile she clasped me and kissed, swift her response
as my call—
O the joy that was mine !

প্রিয়ার রূপ সম্বন্ধে বলছেন :

When you told me dearest, that as a child
you were not admired,
And even your mother scorned you, till you grew up
and developed yourself silently,
I can quite believe it, I can really imagine you
as a peculiar child.
If the blossoms of the vine are wanting in colour and form,
The grapes once ripe are the delights of gods and men.

প্রিয়ার আত্মদান সম্বন্ধে বলছেন :

Blush not, my love, at the thought thou yieldest
so soon to my passion,
Trust me, I think it no shame—think it
no vileness in thee !
Shafts from the quiver of Amor have manifold
consequence, some scrach
And the heart sickens for years with the insidious bane ;
Others drawn home to the head, full plumed
and cruelly pointed,
Pierce to the marrow, and straight kindle the
blood into flame.
In the heroical age, when goddess aud god were lovers,
Scarce did they look, but they longed, longing they
rushed to enjoy.
Think'st thou Love's goddess hung back when deep
in the forest of Ida,
She with a thrill of delight, first her Anchises beheld !
Coyly had Luna delayed to fondle the beautiful sleeper,
Soon had Aurora in spite waken'd the boy from his dream.

প্রিয়াকে লাভ করার অপরূপ সৌভাগ্য সম্বন্ধে বলছেন :

Alexander, and Caesar, and Henry, and
Fred'ric the mighty
On me would gladly bestow half the glory they earned,
Could I but grant unto each one night on the couch where
I am lying ;
But they, by Orcus's might, sternly, alas, are held down.
Therfore rejoice, o thou living one, blest in thy
love-lighted homestead,
Ere the dark Lethe's sad wave wetteth thy fugitive foot.

পার্শ্ব-শায়িতা নিদ্রিতা প্রিয়ার স্পর্শলাভ করে' বলছেন :

Oh ! what a joyous awakening, ye hours, so peaceful,
succeeded.
Monument sweet of the bliss which had first rocked us
to sleep !
In her slumber she moves and sinks while her face
is averted.
Far on the breadth of the couch, leaving her hand still
in mine,
Heartfelt love unites us for ever, and yearnings
unsullied,
And our cravings alone claim for themselves
the exchange.
One faint touch of the hand and her eyes so heavenly see I
Once more open. Ah no ! let me still look on that form !
Closed still remain ! Ye make me confused, and drunken,
ye rob me
Far too soon of the bliss pure contemplation affords.
Mighty indeed are those figures, those limbs how
gracefully rounded !
Theseus, could'st thou ever fly, while Ariadne
thus slept ?
Only one single kiss on those lips ! Oh Theseus, now
leave us !
Gaze on her eyes ! She awakes ! Firmly she holds
thee embrac'd.

এই আনন্দিত জীবন হারাবার ভয়ে কবি বলছেন :

Often times I mistook, and often came to my senses,
Happier never I was, Happiness now in this girl.
O, if this too be mistake, spare me, ye gods that mistake not,
Suffer the dream to go on, till I wake on the lonely shore.

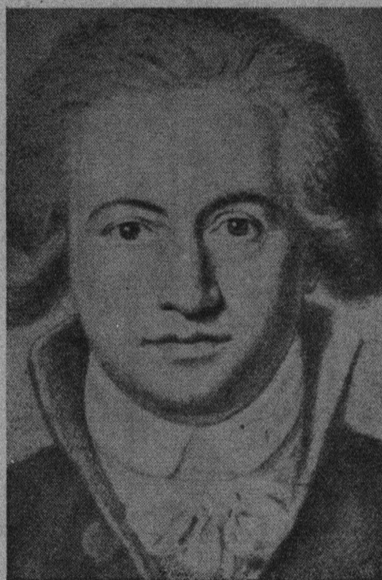
প্রিয়া ও তাঁর অঙ্কলীন সন্তানকে দেখে' নিন্দুকদের বলছেন :

Thus my beloved one replied—from his chair she lifted the boy,
Passed him close to her heart, and kissed him with tears in her eyes.
O but shame-faced I sat, to think that malignant gossip
Could have sullied for me a picture so dear and so sweet!

এসব কবিতার বাংলা গদ্যানুবাদ দিতে আমার সাহস করলাম না মুখ্যত কবির সতর্কবাণী স্মরণ করে'। তাঁর এইসব কবিতা সম্বন্ধে একেরমানকে তিনি বলেছিলেন, ছন্দের আবরণ দিয়ে ঢাকা যায় ভাবের নগ্নতা যে নগ্নতা গদ্যে দুঃসহ, হাল্কা ছন্দেও দুঃসহ ; বাইরণের "ডন জুয়ান"-এর ছন্দে 'রোমক গাথা' অশ্লীল হতো।

এই কাব্য সম্বন্ধে শিলারের উক্তি মনোরম :

অপাপবিদ্ধ প্রকৃতির কাছে ভব্যতার রীতিনীতি অচল, সেই ভব্যতার রীতিনীতির জন্ম হয়েছে পাপ-বোধের পরে। অবশ্য অপাপ-বোধের তিরোধান ও পাপ-বোধের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভব্যতার রীতিনীতি সর্বথা মান্য হয়ে দেখা দিয়েছে, আমাদের নৈতিক অনুভূতি সেসব রীতিনীতির লঙ্ঘন সহ্য করতে পারে না। অপাপের জগতে স্বভাবের নিয়মের যে স্থান কৃত্রিমতার জগতে ভব্যতার রীতিনীতির সেই স্থান। কিন্তু কবির স্বধর্ম এই যে নিজের ভিতর থেকে সমস্ত কৃত্রিম রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি রত হয়েছেন স্বভাবের ঋজুতা ফিরিয়ে আনতে। যদি তাতে তিনি সফলকাম হয়ে থাকেন তবে সমস্ত কৃত্রিম রীতিনিয়মের দাসত্ব থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন, কেমনা এই সব কৃত্রিম রীতিনিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বিকারপ্রাপ্ত সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ। কবি পবিত্র, কবি অপাপবিদ্ধ—অপাপবিদ্ধ স্বভাবের নিয়মে যা বৈধ তাঁরও জন্য তা বৈধ। যদি তাঁর পাঠকদের জন্য সেই অপাপ-বোধ অসম্ভব হয়ে থাকে, যদি কবির পবিত্র প্রভাবে মুহূর্তের জন্যও সেই অপাপ-বোধের সঞ্চার তাঁদের অন্তরে না হয় তবে সেটি তাঁদেরই দুর্ভাগ্য



৪১ বৎসর বয়সে

কবির নয়; সে-রকম পাঠক কবির গ্রন্থ যেন স্পর্শ না করেন, তাঁদের শ্রবণের জন্য তাঁর সঙ্গীত উদ্‌গীত হয়নি।

এই কাব্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার আছে কবির সুরুচি বা মাত্রা বোধ—লুইস যেটি লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন কাব্যে অনেক উপভোগ্য আদিরসাত্মক কবিতা রয়েছে; কিন্তু সেসবে—এমন কি বহুস্থলে পরমসৌন্দর্যরসিক কালিদাসেও—নারী হয়েছে মোটের উপর ভোগের বস্তু। গ্যেটের প্রিয়াও অপূর্বযৌবনা, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অখলা—তাঁর প্রতি একটি মধুর সম্ভ্রম কবির অন্তরে। এই কাব্যে ভোগে কবির পরম উৎফুল্লতা ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু লোভের কদর্যতা নয় আদৌ।† লুডভিগ যেন বলতে চেয়েছেন ভোগসর্বস্ব "রোমক গাথা" ত্যাগসর্বস্ব "ইফিগেনিয়া"র প্রতিবাদ। কিন্তু গ্যেটের ভোগের এই বিশিষ্টতার কথা ভাবলে বোঝা যায় রোমকগাথা ইফিগেনিয়ার অনুপূরক।

গ্যেটের ও ক্রিসতিয়ানার দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়েছিল। ক্রিসতিয়ানা ছিলেন পতিব্রতপ্রাণা আর গ্যেটেও তাঁকে প্রাণভরে' ভালবাসতেন। তথাকথিত শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা ক্রিসতিয়ানার স্বভাবদত্ত বুদ্ধি ও অনুভূতি যে খণ্ডিত হয়নি এটি গ্যেটের আনন্দের কারণ হয়েছিল। ক্রিসতিয়ানার উদ্দেশ্যে গ্যেটে আরো অনেক কবিতা লেখেন, সে সবেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের দাম্পত্য-জীবনের আনন্দ—সর্বোপরি কবির প্রাণঢালা ভালবাসা ও অলোভ।

শার্লোট ফন্ ষ্টাইন

শার্লোট ফন্ ষ্টাইনের সঙ্গে গ্যেটের প্রথম দেখা হয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে অর্থাৎ তাঁর ভাইমারে আগমনের অল্প কয়েক দিন পরেই। ভাইমারে আসবার পূর্বেই গ্যেটে তাঁর ছবি দেখেছিলেন এবং তাঁর আকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যখন তাঁদের প্রথম পরিচয় হয় তখন গ্যেটের বয়স ছাব্বিশ আর শার্লোটের বয়স তেত্রিশ, শার্লোট তখন সাতটি সন্তানের জননী, তার মধ্যে তিনটি জীবিত ছিল, জ্যেষ্ঠ ফ্রিৎস্ কবির কাছে পুত্রের আদর যত্ন লাভ করে।

পরিচয়ের সূচনায় লিলির-বিচ্ছেদ-কাতর গ্যেটে শার্লোটকে গ্রহণ করেছিলেন স্নেহময়ী মর্যাদাময়ী জ্যেষ্ঠা ভাগিনী রূপে: কবি যেন তাঁর পরিবারের একজন হয়ে পড়েন; দরবারি আদব-কায়দা এঁর কাছ থেকেই যে তিনি শিক্ষা করেন তা আমরা

† রবীন্দ্রনাথের কবিতার আদিরসাত্মক চরণ এর সঙ্গে তুলনীয়। তাতেও প্রকাশ পেয়েছে আনন্দ ও আলোভ। ভবভূতির (উত্তররামচরিতে) ও বিহারীলালের আদিরসাত্মক কবিতাও অপূর্ব, তবে সেসবে আদিরস প্রায় শান্তরস হয়ে গেছে।

জেনেছি। কিন্তু অগোপে কবি তাঁর প্রতি এক প্রবল অনুরাগ অনুভব করেন। শার্লোট অবশ্য কবির হৃদয়াবেগকে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করতে দেন নি ; এ সম্বন্ধে কবির এক পত্রে আছে :

> আমার ভগিনী ব্যতিরেকে নারীর সঙ্গে আমার এই যে পবিত্রতম সুন্দরতম পরম অবিকৃত সম্বন্ধ তারও উপরে আঘাত পড়বে !......যদি তোমার সাহচর্য না পাই তবে তোমার প্রীতি হবে আমার অনুপস্থিত বন্ধুদের প্রীতির মতন—সে রকম বন্ধুত্বে আমি সমৃদ্ধ। প্রয়োজনের মুহূর্তে উপস্থিত বন্ধু সম্মুখে দেখতে পারে, কিন্তু অনুপস্থিত বন্ধু জলের ভাণ্ড নিয়ে আগুন নিভাতে আসে আগুন যখন নিভে গেছে তখন।—আর এর প্রয়োজন দশজনের দিকে তাকিয়ে ! যে-দশজন আমার কোনো কাজেই লাগে না, তোমাকে দেবে না আমার জন্য কিছু হতে !......

কিন্তু কালে কালে শার্লোটও যে কবির প্রতি এক প্রবল অনুরাগ অনুভব করেন তার পরিচয় রয়েছে কবির এক পত্রের পিঠে লেখা তাঁর এই কটি ছত্রে (কবির কাছে লেখা তাঁর সমস্ত পত্র তিনি পরে চেয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন) :

> এই গভীর হৃদয়াবেগ, এ কি অন্যায় ?
> আমার এই নিষিদ্ধ অনুরাগের জন্য আমাকে কি মনস্তাপে পুড়তে হবে !
> কোনো উত্তর পাই না বিবেকের কাছে থেকে।
> ভগবান্, ধ্বংশ ক'রো সেই বিবেক যদি সে কখনো আমার দোষ ধরে।

শার্লোটের প্রভাব ও কবির ও শার্লোটের এই "আত্মিক" প্রেম যে কবির চিত্তবিকাশের সহায় হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় কবির ইফিগেনিয়া এবং তাস্সোর রাজকুমারী। শার্লোট এই যুগে কবির "মানসী"র স্থান গ্রহণ করেছিলেন। কবি যে তাঁর প্রেমপাত্রীদের কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে' দেখতেন তার পরমবন্ধু ডিউক কার্ল আউগুস্টের একটি উক্তিতে সে কথা রয়েছে। কবি নিজেও এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন, তাঁর তাস্সোর লিওনারার মুখে এই কথাটি স্মরণীয় :

> ভাল যে বাসে না কাউকে—
> তার প্রেমের স্বপ্নকে সে দিয়েছে আমাদের নাম।

শার্লোটকে কবি প্রায় এক হাজার চিঠি লেখেন। কবির চরিতকারেরা সেই সব চিঠির শ্রেণীবিভাগ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের মতে শার্লোটের প্রতি আকর্ষণের খুব একটা প্রবলতা কবির প্রথম কয়েক বৎসরের চিঠিতে রয়েছে, সে-প্রাবল্য আবার চোখে পড়ে তাঁর ইতালি-যাত্রার কিছু পূর্বে। শার্লোটকে না জানিয়ে কবি ইতালিতে যান আমরা দেখেছি। সেখানে গিয়ে তাঁকে বহু পত্র দেন। কিন্তু তাঁর মনের

অপ্রসন্নতা দূর হলো না কবিকে ফিরে আসতে দেখেও। এর উপরে ক্রিসতিয়ানাকে গ্রহণ করার সংবাদ যখন শার্লোটের কর্ণগোচর হলো তখন তিনি কবির প্রতি একান্ত বিরূপ হয়ে গেলেন। কবি তাঁকে বোঝাতে বহু চেষ্টা করেন, এ সম্পর্কে তাঁর দুইখানি পত্র এই:

> তোমার পত্রের জন্য ধন্যবাদ, যদিও তা থেকে নানাভাবে দুঃখই পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হলো, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে মনের কথা খুলে' বলা আর দুঃখ না দেওয়া খুব কঠিন।...ইতালিতে আমি কি ফেলে' এসেছি সে-সব কথা আর বলবো না, সে-সম্বন্ধে তোমার উপরে আমার আস্থাকে কঠিন আঘাত দিয়েছ। যখন প্রথম ফিরে এলাম তখন দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার মনের অবস্থা ছিল অদ্ভুত; অকপটেই বলছি, তুমি তখন আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলে তাতে আমি খুব আহত হয়েছিলাম। হের্ডরের ও ডিউক-মাতার ইতালি যাত্রা কালে তাঁদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে যাই, তাঁদের গাড়ীতে জায়গা ছিল, তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য তাঁরা আমাকে পীড়াপীড়ি করেন; কিন্তু আমি রয়ে গেলাম সেই বন্ধুর জন্য যার কথা ভেবে আমি ফিরে এসেছি। অথচ সেই সময়ে কেবলই আমাকে বিদ্রূপ করে' শোনানো হচ্ছিল যে আমার ইতালিতে ফিরে যাওয়াই ভাল ছিল, আমার অন্তরে বিন্দুমাত্র দরদ নেই, ইত্যাদি। আর এসব যখন ঘটেছে তখন আমার যে "সম্পর্কে"র জন্য তুমি এত অসন্তুষ্ট হয়েছ তার কোনো আভাস ছিল না। আর এই সম্পর্কই বা এমন কি? এর দ্বারা কাকে বঞ্চিত করা হয়েছে? সেই বেচারীর প্রতি আমার যে মনোভাব কেইবা তার জন্য দাবি-দাওয়া রাখে? যে সময় আমার তার সঙ্গে কাটে কার তাতে প্রয়োজন? ফ্রিৎস, হের্ডর-পরিবার, আমার পরিচিত যাকে খুশী, জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারো আমার দরদ কমে গেছে কি না, আমি পূর্বের মতো পরিশ্রমী কি না, পূর্বের মতোই বন্ধু-বৎসল কি না,—এমন কি এখনই যথার্থভাবে তাদের একজন হয়ে পড়েছি কি না। আর এই সময়ে যদি আমার সব-চাইতে বড় সব-চাইতে গভীর সম্বন্ধের কথা, অর্থাৎ তোমার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা, ভুলে যাই তবে সেটি হবে এক অতিপ্রাকৃত ব্যাপার।.......

অপর পত্রখানি এই:

> ......আমার নিজের সাফাই স্বরূপ কিছুই বলবো না। কিন্তু আমি তোমার সাহায্য চাই যাতে আমার যে "সম্পর্ক" তোমার চোখে আপত্তিকর তা আরো আপত্তিকর না হয়ে যেমন আছে তেমনি থাকে। আবার

> তোমার আস্থা চাই, স্বভাবের দিক থেকে ব্যাপারটার দিকে তাকাও, ব্যাপারটা তোমার কাছে শান্ত ভাবে বুঝিয়ে বলতে দাও, আমার আশা আছে তাতে তোমার ও আমার সম্পর্ক পুনরায় পবিত্র ও প্রীতিময় হয়ে উঠবে।……

যাঁরা গ্যেটে ও শার্লোট ফন ষ্টাইনের সম্বন্ধ মোটের উপর এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ জ্ঞান করেন, তাঁদের মতের সমর্থন রয়েছে এই দুই পত্রে। এই সঙ্গে এই কথাটিরও উল্লেখ অসঙ্গত নয় যে ফন ষ্টাইন তাঁর পত্নীর সঙ্গে গ্যেটের বন্ধুত্বে কখনো অস্বস্তি প্রকাশ করেন নি। শিলারও ভাইমারে এসে শুনেছিলেন কবির ও শার্লোট ফন ষ্টাইনের প্রেম আত্মিক।—কিন্তু এই চেষ্টায় শার্লোটের বিরূপতা বরং বেড়ে গেল। কবিকে তিনি আর ক্ষমা করতে পারলেন না। ক্রিসতিয়ানার সঙ্গে গ্যেটের সম্পর্ককে লোকচক্ষে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করা তাঁর এক কাজ হয়ে দাঁড়াল। শেষে কয়েক বৎসর পরে তিনি লিখলেন এক নাটক, তার নাম 'ডিডো'—ব্রাণ্ডেস্ বলেন, তার সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নেই। এই নাটকে কবিকে তিনি দাঁড় করালেন এক অতি হীন প্রকৃতির বিশ্বাসঘাতক রূপে। কবির শত্রুস্থানীয় সাহিত্যিকদের তিনি হলেন উৎসাহ-দাত্রী। ব্রাণ্ডেসের কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে যে এমন শার্লোটের প্রেরণায় সৃষ্টি হয়েছিল ইফিগেনিয়া।—কিন্তু সৃষ্টি চিরদিনই পরম রহস্যময়—যেন পঙ্ক থেকে পঙ্কজ!

লুইস ও ব্রাণ্ডেস দুজনেই শার্লোটের এই মনোভাব ও আচরণের নিন্দা করেছেন, তাঁদের মতে এতে শার্লোট তাঁর নিজের অতি হীন পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আসলে শার্লোট-চরিত্র এখানে হয়ে উঠেছে কৌতুকাবহ। কবির প্রতি তাঁর এতখানি বিরূপতার কারণ মনে হয় এই: কবির প্রতি যতখানি আনুকূল্য তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন তার চাইতে তাঁর অন্তরের অনুরাগ ছিল অনেক প্রবল; তাই কবির নবপ্রেমপাত্রীর প্রতি তাঁর ঈর্ষা তাঁর সেই অনুরাগকে রূপান্তরিত করেছিল এমন উৎকট ঘৃণায়। শার্লোটের একখানি পত্রে আছে: একদিন ক্রিসতিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে কবি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই রাস্তার পাশে এক গোলাপ-বাগানে শার্লোট তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, তাঁদের দেখে তিনি এতখানি ঘৃণা বোধ করলেন যে সামনে ছাতা আড়াল দিলেন যেন তাঁদের দেখতে না হয়।

হয়ত মাত্র একবার শার্লোটের এই বিরূপতা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছিল: ১৮০১ খৃষ্টাব্দে—গ্যেটের বয়স তখন পঞ্চাশের উপরে আর শার্লোটের বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি—গ্যেটের কঠিন পীড়া হয়, তখন শার্লোট তাঁর পুত্রকে লিখেছিলেন:

> আমি জানতাম না যে আমাদের পূর্বতন বন্ধু গ্যেটে আজো আমার এত প্রিয়। নয় দিন ধরে' তাঁর সাংঘাতিক অসুখ যাচ্ছে, তাতে বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।….এরই মধ্যে শিলার-পরিজন ও আমি তাঁর

জন্য বহুবার অশ্রু বিসর্জন করেছি। আমার বড় দুঃখ হচ্ছে এই জন্য যে এবার নববর্ষে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে শিরঃপীড়ায় ভুগছিলাম বলে' তাঁকে আসতে বলতে পারিনি,—আর হয়ত তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

কবি কিন্তু শার্লোট সম্পর্কে কখনো অনুদারতার পরিচয় দেননি, বারবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন শার্লোটকে প্রসন্ন করতে। শার্লোটের যা প্রিয় এমন কোনো খাবার বস্তু তাঁর সামনে দেওয়া হলে তিনি বলতেন: ফন ষ্টাইন-গৃহিণীকে কিছু পাঠিয়ে দাও।—শার্লোট সম্বন্ধে তাঁর শেষ কবিতা এই:

এক সে আছিল প্রিয়া মোর, আছিল সে সবার উপরে!
হারালেম তারে চির তরে! নীরবে বহন কর ক্ষতি।

শার্লোট দীর্ঘজীবিনী হয়েছিলেন। দীর্ঘদিনে তাঁর বিরূপতা তীব্রতাহীন হয়েছিল। গ্যেটের আগ্রহে, শেষ বয়সে মাঝে মাঝে তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনাও হ'তো। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ফরাসী-বিপ্লব

গ্যোৎস নাটকে যে স্বাধীনতাপ্রীতি রূপলাভ করেছে তা মোটের উপর ঝড়-ঝাপটা-বাদের অবন্ধন-প্রীতি—কিন্তু সেই স্বাধীনতা বলতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অনেকখানি বোঝা হয়েছিল। ব্রাণ্ডেস বলেছেন, গ্যোৎসের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞার ভাব যথেষ্ট ছিল।—জনসাধারণের দুঃখের সঙ্গে কালে কালে গ্যেটের যে নিবিড় পরিচয় ঘটে সে কথাও আমরা জেনেছি। সেই পরিচয়ের জন্যই ইতালি থেকে তিনি লিখতে পেরেছিলেন:

সৌন্দর্যের যুগ অন্তর্হিত হয়েছে, আমাদের যুগ আশু প্রয়োজন ও অশান্ত দাবিদাওয়ার যুগ।

ফরাসী-বিপ্লব, যখন আরম্ভ হলো তখন গ্যেটে এ'কে অভিনন্দিত করেন নি, এর সম্ভাবনাও তেমন ভাবেন নি। কিন্তু অচিরেই ফরাসী-বিপ্লব অত্যাচারের রূপ গ্রহণ করলো। তার পর থেকে ফরাসী-বিপ্লব সম্বন্ধে গ্যেটের যে মনোভাব দেখা দিল তা মোটের উপর বিরোধিতার মনোভাব—কখনো তীব্র কখনো অতীব্র।

বিপ্লবের কোনো অর্থ যে তিনি বুঝতেন না তা নয়। তাঁর অসমাপ্ত 'আউফ্-গেরেগ্‌টেন' নাটকে বিচারক রাণীকে ভাগ্যবতী বলছেন এই জন্য যে

এক মহান জাতির স্বাধীনতা ও বন্ধনমুক্তি উপলব্ধির প্রথম মুহূর্তের পরম উত্তেজনার

সাক্ষী তিনি হতে পেরেছেন।—এই বিচারকেরই মুখে তাঁর আর একটি অমর বাণী উচ্চারিত হয়েছে :

> মহৎ ব্যাপারে ভুল করার মর্যাদা ক্ষুদ্র ব্যাপারে নির্ভুল হওয়ার চাইতে সব সময়েই বড়।

ফরাসী-বিপ্লব গ্যেটের কাছে যে সমর্থন পায়নি এজন্য তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন—সনাতনের বন্ধু। এজন্য তাঁর প্রতিভাও তাঁদের অনেকের চোখে দীর্ঘদিন স্বল্পমূল্য মনে হয়েছিল। তাঁর চরিতকাররা নানা দিক দিয়ে এই ব্যাপারটি বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এর জন্য তাঁরা তাঁর তেমন দোষ দেননি, তাঁর জীবনের বিশেষ সাধনার দিকে দৃষ্টি রেখে'। ক্রোচে এজন্য বিশেষ প্রশংসাই করেছেন আমরা দেখেছি।

গ্যোৎসের রচয়িতা ও ঝড়ঝাপটা-বাদের নেতা গোটে বিপ্লব-পন্থীরূপেই তাঁর দেশের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গভীর জীবন-বোধ ও সত্যপ্রীতি অচিরেই তাঁর সামনে উন্মুক্ত করে জীবনের বহু দিক। এর উপর ভাইমারের রাজদরবারের সংস্রব তাঁর সামনে বিশেষভাবে উন্মুক্ত করলো সেই ব্যাপক জীবন-বোধ ও সত্য-প্রীতির ক্রম-বিবর্তনের পথ—বিপ্লবের পথ নয়। ফরাসী-বিপ্লবের বহু পূর্বে তার এই নূতন ও ব্যাপক জীবন-বোধে তিনি যে উপনীত হন তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।

যখন ফরাসীবিপ্লব আরম্ভ হলো তখন সেই জীবন-বোধে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অধিকন্তু বিজ্ঞান-সাধনায় অগ্রসর হয়ে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন অতি ধীর বিবর্তনের সত্যের—বিপ্লবের বা উল্লম্ফনের আদৌ নয়। এই নব উপলব্ধির ফলে তিনি কতখানি আত্মস্থ হন তার পরিচয় রয়েছে 'স্ফটিক' সম্বন্ধে তাঁর উক্তিতে। নিজের উপরে এই কর্তৃত্ব লাভের মর্যাদার সঙ্গে তাঁর ঝড়ঝাপটা-দলের বন্ধুদের অবিকাশ ও দুর্দশা মিলিয়ে দেখাও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তির অর্থ বোঝা সহজ হয় :

> আমার প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য আমি বরং অবিচার করতে পারি, কিন্তু বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে পারি না।

সমস্ত রকমের বিপ্লবকে তিনি ভাবতেন অবাঞ্ছিত ব্যাধি; এর জন্য অবশ্য তাঁর বিবেচনায় শাসকরা ও প্রধানরাই দায়ী—সুশাসন যেখানে সেখানে বিপ্লব দেখা দিতে পারে না একথা বারবার তিনি বলেছেন। যেমন ফরাসী-বিপ্লব তেমনি এর পূর্বের ধর্মসংস্কার-আন্দোলন (Reformation)—বিশেষ করে' তার দলাদলি—তাঁর প্রীতির ব্যাপার হতে পারেনি। বিদ্রোহের পতাকাবাহীদের সম্বন্ধে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি এই :

স্বাধীনতার বীর সেনাপতিদের আমি সহ্য করতে পারি নি কোনোদিন,
তাদের প্রত্যেকের অদ্বিতীয় লক্ষ্য দেখেছি যা খুশী তাই করা ;
জনসাধারণকে মুক্তি দিতে চাও ? তবে রত হও তাদের সেবায়।
সেবার পথে কত বিঘ্ন জান কি ? জানতে চেষ্টা কর।

তাঁর "হেরমান ও ডোরোতেয়া" কাব্যে এক জায়গায় বলা হয়েছে :

কেউ স্বাধীনতার বুলি না আওড়াক—যেন শুধু তার দ্বারাই চলবে শাসনের কাজ ;
বাঁধ ভাঙা হলেই যেনো জলের মতো এসে পড়বে যত পাপ,
আইনের শাসনেই সে সব থাকে অবরুদ্ধ।

আর এ সম্পর্কে সব চাইতে বিখ্যাত তাঁর এই বাণী :

যাতে ভাবের মুক্তি আনে, কিন্তু সেই অনুপাতে আত্মজয় এনে দেয় না, তা অকল্যাণকর।

'নেপোলিয়ন' ও 'আলাপ' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কবির আরো উক্তি আমরা পাব।

ইতালি থেকে ফিরে এসে গোটে রত হন বিজ্ঞান-চর্চায় ও কাব্য-চর্চায়। অল্প কিছুকাল পরে পুনরায় তিনি যান ভেনিস-এ—ডিউক-মাতা ও হের্ডর যেখানে বাস-করছিলেন। এবার আর ইতালি তাঁর ভাল লাগে না। ইতালিতে বসবাসের অসুবিধা ও ইতালীয়দের বিচিত্র দুর্বলতা এবার তাঁর চোখে পড়ে—তাঁর প্রিয়া ও তাঁর নবজাত পুত্রকে ভাইমারে ফেলে গিয়ে তিনি স্বস্তি বোধ করছিলেন না বোধ হয় মুখ্যত এই কারণে। এই খুঁতখুঁতে ভাব থেকে তাঁর 'ভেনিসীয় কণিকা'র (Venetian Epigrams) জন্ম। একটি কবিতায় গৃহ-আবেষ্টনে ফিরে যাওয়ার জন্য কবির ব্যাকুলতা সুন্দর রূপ পেয়েছে :

জগৎ বৃহৎ ও সুন্দর, কিন্তু দেবতাদের প্রাণভরে' ধন্যবাদ দিই এইজন্যে যে আমাকে তাঁরা অধিকারী করেছেন একটি বাগানের, হোক ছোট, তবু আমারই।
প্রলুব্ধ করছে সেই বাগান আমাকে গৃহের পানে। বাগানের মালিক কেন ঘুরবে পথে পথে :
সম্মান ও আনন্দ দুই-ই সে অনুভব করে যখন সামনে দেখে তার বাগান।

ভেনিস থেকে ফিরে এসে কিছুকাল পরে কবি ডিউকের সঙ্গে যান ফরাসী যুদ্ধ-ক্ষেত্রে। ডিউক হয়েছিলেন প্রাশিয়ার একজন সেনাপতি। এই যুদ্ধক্ষেত্রের ডায়ারি থেকে তাঁর "ফরাসীদেশে রণ" গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে কবি যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন। ঠিক যেখানে যুদ্ধ চলেছে সেখানে উপস্থিত হয়ে কাব অনুভব করতে চেষ্টা করেন কামান-গর্জনে দেহে মনে কি ভাব হয়। তিনি লিখেছেন, তাঁর ভিতরে তেমন ভাবান্তর ঘটেনি ; খানিকটা উত্তেজনা তিনি অনুভব করেছিলেন

মাত্র। এর আনুষঙ্গিক বিপদ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: বিপদে তাঁর সাহস এমন কি হঠকারিতা বেড়ে যেতো।—প্রাশিয়ার দল গিয়েছিল ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই-এর ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই যোদ্ধা-দল যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপ আচরণ করেছিল সে সম্বন্ধে গ্যেটের এই বর্ণনা সুপ্রসিদ্ধ:

> কয়েকজন ভেড়ার রাখাল তাদের ভেড়ার দল গুছিয়ে বনের মধ্যে ও অন্যান্য নির্জন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, আমাদের প্রহরীরা তাদের ধরে' নিয়ে আসে। তাদের প্রতি প্রথমে খুব ভাল ব্যবহার করা হলো, তারা কে কোন্ দলের মালিক তা জিজ্ঞাসা করা হলো ও ভেড়াগুলো দলে দলে ভাগ করে' গুনতি করা হলো। রাখালদের মুখে দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ, ভয় ও কিঞ্চিৎ আশা। এর পরে ভেড়াগুলো বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে ভাগ করে' দেওয়া হলো আর রাখালদের যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে দেওয়া হলো ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের নামে 'বিল', আর রাখালদের সামনেই ভেড়াগুলো জবাই করে' চললো ক্ষুধাতুর সৈন্যদল;—এর চাইতে বড় নির্দয়তার দৃশ্য, আর তা এমন নীরবে সহ্য করার বীর্য, আমার চোখ ও মন আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। কেবল গ্রীক নাটকেই আছে এমন অবিমিশ্র বেদনার ছবি।

যুদ্ধক্ষেত্রে কামান-গর্জনের মধ্যে কবির চলেছিল অনন্যমনে ভূ-বিজ্ঞান ও বর্ণ-বিজ্ঞানের চর্চা আর চলেছিল লোক-চরিত্র পাঠ। যুদ্ধের প্রভাব মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপরে কেমন হয় সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

> আজ তুমি হচ্ছ দুঃসাহসী ও ধ্বংসশীল, কাল হচ্ছ করুণা-প্রবণ ও স্থিতিশীল, ক্রমাগত শুনে চলেছ উত্তেজনা ও আশার বাণী, তাতে করেই নিজেকে বজায় রেখে চলেছ অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে; এর ফলে যাজক ও রাজসভাসদদের অনুরূপ এক অদ্ভুত মিথ্যাচারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

আর এই সমস্তের মধ্যে তিনি অনুভব করেন:

> সে-ই সুখী যার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে মহত্তর আবেগে।

ভাল্মী-র যুদ্ধে ফরাসী জাতীয় দলের হাতে জার্মানদের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কবিও এই পরাজয় আশঙ্কা করেন নি। রাত্রে তাঁদের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল মিলিত হলে কবির উপরে ভার পড়লো কিছু বলে' তাদের মনের ভার লাঘব করতে—যেমন প্রায়ই তিনি করতেন। তিনি বললেন:

> এই জায়গা থেকে আর আজকার দিন থেকে জগতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের জন্ম হলো, আপনারা সবাই বলতে পারবেন সেই জন্ম আপনারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

জনশক্তির জাগরণের প্রতি গ্যেটের গভীর সম্ভ্রম ব্যক্ত হয়েছে এই উক্তিতে।

ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব তাঁর অনেক রচনায় ব্যক্ত হয়। সমালোচকরা বলেছেন সেসব মোটের উপর তাঁর দুর্বল রচনা। সেসবের মধ্যে ইয়োরোপের "শৃগাল কাহিনী" তিনি যে হোমরের ছন্দে নূতন করে' লেখেন সেইটি উল্লেখযোগ্য, তাতে মানুষের শঠতা, প্রবঞ্চনা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে কবির তিরস্কার উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু এই বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে কয়েক বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর "হেরমান ও ডোরোতেয়া" কাব্য—হোমরের ছন্দে রচিত।

তাঁর শেষ বয়সে তাঁর রাজনৈতিক মতামত যা দাঁড়ায় তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে তাঁর "ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টার-এর ভ্রমণে" আর "একেরমান ও সোরে-র সঙ্গে আলাপে"। বিশেষ বিশেষ জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে যেসব পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটে তা তিনি সমর্থন করেন, কিন্তু সমর্থন করেন না একদেশের অনুকরণে অন্যদেশে বিপ্লব ডেকে আনা। "আলাপে" আছে :

> অন্য জাতির মর্কটি অনুকরণ নয়, যা জাতির মর্ম থেকে তার সাধারণ অভাবাদি থেকে উদ্ভূত কেবল তাইই জাতির জন্য কল্যাণকর ; কেননা যা কোনো বিশেষ যুগে কোনো বিশেষ জাতির জন্য পরিপোষণের উপায় তা অন্য জাতির জন্য বিষতুল্য হতেও পারে।...যদি কোনো জাতির জন্য কোনো বড় সংস্কারের সত্যকার প্রয়োজন থাকে তবে ঈশ্বর হন তার সহায়, তার বিকাশ ঘটে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে কবি দেখে আনন্দিত হলেন যে, ডিউকের আদেশে তাঁদের অনুপস্থিতি-কালে একটি প্রাচীন গৃহ তাঁর জন্য নতুন ক'রে তৈরি হয়েছে। সেইদিনে এটিকে প্রাসাদ বলেই গণ্য করা হতো। এই গৃহের বিভিন্ন কক্ষে সংগৃহীত হয়েছিল বিচিত্র প্রস্তর-মূর্তি, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, চিত্রকলা ও গ্রন্থ। এর বিস্তৃত বর্ণনা লুইস দিয়েছেন। এই গৃহই গ্যেটের বাস-ভবন রূপে জগদ্বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

শিলার

শিলার গ্যেটের চাইতে বয়সে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য শিলার ব্যগ্র হন, কিন্তু গ্যেটে ধরা দিচ্ছিলেন না,—আমরা দেখেছি। য়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ খালি হলে গ্যেটের সুপারিশে শিলার সেই পদটি পান, সুপারিশ-পত্রে শিলার সম্বন্ধে তিনি লেখেন—ইনি একজন ঐতিহাসিক।—এর পরে শিলারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে গ্যেটে ও শিলারের মধ্যে প্রথম আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

এক বিজ্ঞান সভা থেকে ফিরবার কালে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ-রীতি সম্বন্ধে তাঁদের কথা হয়। পথে শিলারের বাড়ী পড়ে, সেখানে গিয়ে গ্যেটে তাঁর "বৃক্ষের রূপান্তর-তত্ত্ব" শিলারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। শিলার গ্যেটের যুক্তি পুরোপুরি মেনে নেন না, কিন্তু গ্যেটে শিলারের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হন। এর পরে তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। যে বিখ্যাত চিঠিখানিতে শিলার গ্যেটে ও তাঁর মধ্যেকার পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেন তার কতক অংশ এই :

> যা বিশ্লেষণ-বুদ্ধির আয়াস-লভ্য এমন অনেক কিছু আপনার অভ্রান্ত 'সহজাত জ্ঞানে'র মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিত রয়েছে, আপনার মধ্যে সেই সহজ জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে বলেই নিজের সেই সমৃদ্ধি আপনার অজ্ঞাত।...আপনার মতো চিত্ত যাঁদের তাঁরা কদাচিৎ বুঝতে পারেন কত গভীরে তাঁরা প্রবেশ করেছেন, দর্শনের কাছে ঋণী হবার প্রয়োজন তাঁদের কত কম, বরং দর্শনই তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে' দূরে থেকে আমি লক্ষ্য ক'রে আসছি আপনার চিৎ-শক্তি,—উত্তরোত্তর আনন্দিত হচ্ছি আপনার গতিপথ দেখে। আপনি সন্ধান করছেন প্রকৃতির ভিতরে এক আদিম নিয়ম, কিন্তু অত্যন্ত শ্রমসাধ্যভাবে। অজটিল জীব পর্যবেক্ষণ থেকে আপনি ধাপে ধাপে উঠছেন জটিলতর সৃষ্টির অভিমুখে, আর এখন আপনার চেষ্টা হচ্ছে প্রকৃতির বিচিত্র উপাদান পর্যবেক্ষণ ক'রে জটিলতম সৃষ্টি যে মানব-জীবন—তার গঠন উপলব্ধি করা। প্রকৃতির দিক থেকে ধীরভাবে মানব-জীবনের গঠন বুঝতে চেষ্টা ক'রে আপনি চেষ্টা করছেন সমগ্র মানবজীবনের রহস্য ভেদ করতে। এ এক মহৎ বীর্যবন্ত ভাবনা নিঃসন্দেহ......আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে সারাজীবনেও এই লক্ষ্যে আপনি পৌছুতে পারবেন, কিন্তু এমন পথে পা বাড়ানোর মর্যাদা অন্য পথে লক্ষ্যে পৌছানোর চাইতেও বেশী।...

এই পত্র পেয়ে গ্যেটে সন্তুষ্ট হন। তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর নিঃসঙ্গ সাহিত্যিক জীবনে একজন বুদ্ধিমান শ্রোতা পাওয়া যাচ্ছে। এই বৎসর শিলার "ডী হোরেন" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাতে গ্যেটে লিখতে সম্মত হন। তদানীন্তন জার্মানীর শ্রেষ্ঠ মনীষিবর্গ, যথা কাণ্ট, ফিকটে, হুম্‌বোল্‌ড্‌ট্‌-ভ্রাতৃদ্বয়, ক্লপষ্টক, য়াকোবি প্রভৃতির সাহায্য পাওয়া যায়। এই পত্রিকার সম্পর্কে শিলার গ্যেটের গৃহে একপক্ষ কালের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন, এবং নানা আলোচনায় তাঁদের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়।

গ্যেটে ও শিলারের প্রকৃতির মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য ছিল। গ্যেটে স্বাস্থ্যবান্, উন্মুক্ত প্রকৃতি তাঁর প্রিয়, শিলার ক্ষয়রোগগ্রস্ত, বদ্ধ ঘরে পচা আপেলের গন্ধে লাভ

করতেন কর্মের প্রেরণা; শিলার ইতিহাসের বীরচরিত্রের দ্বারা মুগ্ধ, গ্যেটের সাধনা প্রকৃতিকে বুঝতে পারা, প্রকৃতির অনুবর্তী হওয়া; শিলার সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করতেন যশ ও প্রতিপত্তি, গ্যেটে তাঁর জাতির প্রিয়পাত্র হবার আশা ত্যাগ ক'রে বাইবেলের কৃষাণের মতো ছড়িয়ে চলেছিলেন চিন্তা-বীজ—কোন্‌টি কোথায় পড়লো সেদিকে দৃষ্টি নেই। কিন্তু এত বড় পার্থক্য সত্বেও এই দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়েছিল—তাঁদের সুবিখ্যাত পত্রাবলীতে রয়েছে তাঁদের সেই অন্তরঙ্গতার পরিচয়। এই বন্ধুত্বে শিলারই অবশ্য লাভবান্ হন বেশী। গ্যেটের গভীর প্রকৃতি ও উন্নততর মনীষার সংস্পর্শে এসে তাঁর মানসশক্তির উৎকর্ষ ঘটে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টি গ্যেটের প্রভাবের ফল, তাঁর জনপ্রিয়তা লাভেও উদারহৃদয় গ্যেটে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছিলেন। গ্যেটেও শিলারকে বন্ধুরূপে পেয়ে কিছু পরিমাণে উপকৃত হন: শিলারের উদ্দীপনা তাঁর অন্তরে নব সাহিত্যিক উদ্দীপনার সঞ্চার করে, তিনি বলেছেন, এই সংযোগ তাঁর জন্য হলো যেন নব বসন্ত, তাঁর নব নব চিন্তা-বীজ অঙ্কুরিত মুঞ্জরিত হয়ে চললো। তাঁর ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার শিলারের আগ্রহাতিশয্যে তিনি সম্পূর্ণ করেন; এই ভিলহেলম মাইস্‌টার শিলারের সাহিত্যিক জীবনে অশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাঁর ফাউস্‌ট (প্রথম খণ্ড) সম্পূর্ণ করার মূলেও শিলারের আগ্রহ কার্যকর হয়েছিল।

যে পত্রিকা বহু আয়োজন করে' শিলার বা'র করেন তা বেশী দিন চললো না। তাঁরা দুই বন্ধু ক্ষুণ্ণ হলেন। তখন তাঁরা দুই বন্ধু সম্মিলিত ভাবে লিখলেন Xenien—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ কবিতা। জার্মানীর বহু খ্যাত অখ্যাত সাহিত্যিকের নির্বুদ্ধিতা ও অকর্মণ্যতার উপরে বিষম আঘাত করা হলো। একটি কবিতা এই:

ইতস্ততঃ চালিয়েছি আমরা ঘোড়া
কখনো কাজে কখনো হাওয়া খাওয়ায়,
আমাদের পেছনে ধেয়ে আসছে কুকুর
তার ঘেউ ঘেউ-এর আর অন্ত নেই।
আমাদেরই আস্তাবলের এই কুকুর
নিয়েছে আমাদের পিছু,
সারাক্ষণ তার আর্ত চীৎকারে প্রমাণ হচ্ছে
আমরা চলেছি ঘোড়ায় চড়ে'।

সমালোচকরা বলছেন শিলারের লাইনগুলোই হয়েছিল বেশী ধারালো।

চারদিকে দেখা দিল মহা চাঞ্চল্য। আহত সাহিত্যিকরাও এই দুই সম্মানিত কবির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখলেন না, তীব্রতর ভাষায় তাঁরা প্রতি-আক্রমণ করলেন। গ্যেটে কিন্তু আর অগ্রসর না হয়ে চুপ ক'রে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলতেন এমন রচনায় হাত দিয়ে সময়ের অপব্যবহার করা হয়েছে।

গ্যেটের মনুষ্যত্ব ও প্রতিভার প্রতি এত শ্রদ্ধান্বিত হয়েও শিলার কিন্তু গ্যেটের জীবন-সঙ্গিনী ক্রিস্তিয়ানার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান নি যদিও তাঁর নিজের জীবন ত্রুটিশূন্য ছিল না, আর শার্লোট ফন ষ্টাইনের কুখ্যাত ডিডো নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি করেছিলেন। এই সব কারণে লুডভিগ বলতে চান শিলার কোনোদিনই গ্যেটেকে পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। এ অভিযোগ হয়ত পুরোপুরি মিথ্যা নয় কেননা শিলারের নিজস্বতা আর প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তবে গ্যেটের প্রতিভা ও মনুষ্যত্বের প্রতি শিলারের শ্রদ্ধা যে অকৃত্রিম ছিল তা নিঃসন্দেহ, আর গ্যেটেও তাঁকে যে স্নেহে ও শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত করেছিলেন তা অপরিসীম, একেরমানের সঙ্গে আলাপে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অসাধারণ বন্ধুবাৎসল্য, গুণগ্রাহিতা আর স্বধর্মনিষ্ঠা:

> একদা জনৈক সেনাপতি আমাকে সহজভাবেই বলেছিলেন শিলারের মতো লিখতে। তাঁর কথার উত্তরে আমি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করলাম শিলারের সাহিত্যিক গুণপণার কথা কেননা সে-সম্বন্ধে আমি সেনাপতির চাইতে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলাম। নীরবে আমি চলেছিলাম আমার পথে সাফল্যের কথা আর না ভেবে, আর আমার বিরুদ্ধবাদীদের কথা যথাসম্ভব মনে স্থান না দিয়ে।

একেরমান বলেছেন শিলারের প্রসঙ্গ উঠলে গ্যেটে সে-সন্ধ্যা তাতেই বিভোর থাকতেন।

শিলারের প্রতি গ্যেটে এত অনুরক্ত হয়েছিলেন তাঁর মনীষার জন্যেও—তাঁর শিল্পাদর্শ শিলার যেমন দ্রুত আত্মসাৎ করছিলেন সেটি তাঁকে গভীর আনন্দ দিয়েছিল। শিলার কাণ্টের দর্শনের একান্ত ভক্ত ছিলেন, গ্যেটেও যত্নের সঙ্গে কাণ্ট পড়তে আরম্ভ করেন। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন গ্যেটের উপর শিলারের এই প্রভাব গ্যেটের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল, এর ফলে তিনি তত্ত্বপ্রিয় হয়ে ওঠেন—তাঁর শেষ বয়সের অনেক রচনায়ই রয়েছে সেই তত্ত্বপ্রিয়তার পরিচয়। কিন্তু এ সম্পর্কে ক্রোচের মত মূল্যবান, গ্যেটের শেষ বয়সের রচনা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন:

> কবিত্ব যেমন জ্ঞানবত্তায় পর্যবসিত হয়েছে জ্ঞানবত্তাও তেমনি হয়ে উঠেছে কবিত্ব, গ্যেটেতে কখনো লোপ পায়নি অনুভূতি আর সেই অনুভূতির রূপদান।

এই দুই বন্ধুর প্রভাবে জার্মান সাহিত্য-জগতে অপরিসীম উদ্দীপনার সঞ্চার হ'লো। তাঁরা দুই বন্ধু উৎকৃষ্ট গাথা রচনা করে' Xenien রচনার প্রায়শ্চিত্ত করলেন। শিলারের শ্রেষ্ঠ গাথা বীরত্বের ভাবে পূর্ণ, আর গ্যেটের গাথা প্রেমের ভাবে পূর্ণ; তাঁর "করিন্থ-কন্যা" (The bride of Corinth) ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বিখ্যাত—

খৃষ্টান ত্যাগধর্মের বিরুদ্ধে এটি এক প্রতিবাদ, প্রকাশ-ভঙ্গি যেমন সরল তেমনি অব্যর্থ। এই কালে শিলার গ্যেটের সহায়তায় তাঁর বিখ্যাত ভালেংস্টীন (Wallestien) নাটক শেষ করেন—জার্মানীর নাট্য-জগতে এটি এক অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করে। শিলারের অপর বিখ্যাত নাটক "উইলিয়ম টেল"-এর মূলেও ছিল গ্যেটের পরিকল্পনা, এ সম্বন্ধে গ্যেটে একেরমানকে বলেন :

> ···টেল সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আমি শিলারকে বলেছিলাম, আমার কল্পিত দৃশ্যাবলী ও নায়ক-নায়িকা শিলারের মনে ধারণ করলো নাটকীয় রূপ। আমি ব্যাপৃত ছিলাম অন্যান্য কাজে, পরিকল্পনায় রূপ দিতে কেবলই দেরী হতে লাগল, তাই এটি শিলারকে পুরোপুরি দিয়ে দিলাম, —আর তিনি দাঁড় করালেন তাঁর সেই অপূর্ব নাটকটি।

এঁদের পরস্পরের প্রতি নিবিড় সৌহার্দ্য কোনো কোনো সাহিত্যিকের মনে ঈর্ষা জাগায়, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার কোৎসেবুয়ে (Cotzebue) প্রধান। তিনি এঁদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গ্যেটে ও শিলার দু'জনেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন : গ্যেটের কেমন ধারণা হয় তাঁদের একজনের জীবনলীলার অবসান হবে। প্রথমে গ্যেটের অবস্থাই খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন, আর শিলারের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে লাগলো। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁর জীবনলীলার অবসান হয়।

শিলারের মৃত্যুতে গ্যেটে এত কাতর হন যে তেমন কাতর তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর বন্ধু সেল্টেরকে (Zelter) তিনি লিখলেন :

> আমার জীবনের অর্ধেক চলে গেছে।

শিলারের মৃত্যুর পরে গ্যেটে দীর্ঘদিন সাহিত্য রচনায় মন দেন নি।

মৃত্যুর পরে শিলারের যশ ও প্রভাব অসাধারণভাবে বর্ধিত হয়। স্বদেশবাসীদের অন্তরের অভিনন্দন গ্যেটের চাইতে শিলারের লাভ হয় অনেক বেশী। জনগণের উপরে সেই প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গ্যেটে শিলারের করোটি লক্ষ্য করে' এই প্রশস্তি রচনা করেন (এই সময়ে শিলারের অস্থি কবরান্তরে নীত হয়) :

> ···সেই আকৃতি—যার দিকে আমি চাইতাম সম্ভ্রম-মুগ্ধ দৃষ্টিতে !
> এর উপরে এখনো রয়েছে একাগ্র চিন্তার ছাপ।
> একে দেখে আমার মন চলে গেছে স্বপ্নের দেশে
> যেখানে দাঁড়িয়েছে শত শত দীপ্ত বীর·······
> জাদু-পাত্র, তোমার অপরূপ বাণী বিঘোষিত হয়ে চলেছে !
> এই অযোগ্য হাতে স্থান লাভ করে' তুমি আদেশ করছ

তোমার মতো কবর-বাস উপেক্ষা করে',
উন্মুক্ত আকাশের নীচে আমার সমস্ত চেতনা উন্মীলিত করে'
শ্রদ্ধানম্র ললাটে উদার সূর্যালোকের স্পর্শলাভ করতে।
মরণশীল মানুষের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ দান—
ঈশ্বর-ও-প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য এমনি ভাবে প্রত্যক্ষ করা।
চেয়ে' দেখ বিশুদ্ধ মনন কঠিন অস্থিতে কেমন পরিবর্তন ঘটাতে পারে,
চেয়ে' দেখ মনন-জীবিত কেমন পরিবর্তনকে উপহাস করে!

অন্য একটি কবিতায় তিনি শিলারের প্রকৃতিগত উদ্দীপনাকে অভিহিত করেছেন চিরন্তন যৌবন-ধর্ম বলে'—যার সামনে সব বাধাই কালে কালে হয় নতশির।

"শতবর্ষ পরে শিলার" গ্রন্থের লেখক রবার্টসন বলেন: ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিলারের অনাবিল উৎসাহ-দীপ্ত বাণী জার্মান জাতিকে অফুরন্ত প্রেরণা দিয়ে এসেছে; কিন্তু তার পরে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে আর গ্যেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে—তাঁর জাতির ধারণা হয়েছে শিলার যা বলেছেন তা গত যুগের—একালের কথা ব্যক্ত হয়েছে গ্যেটের রচনায়।

ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার-এর শিক্ষানবিশী

ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার-এর সূচনা হয় ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্যন্ত মাত্র এর প্রথম খণ্ড লেখা হয়। তারপর এটি ফেলে রাখা হয়। পুনরায় কবি এটিতে হাত দেন ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর চার খণ্ড সমাপ্ত হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইতালি-যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত লেখা হয় এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড। ইতালি থেকে ফিরে এসে কবি আবার এটিতে হাত দেন ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। পুরাতন পরিকল্পনার অদল-বদল হয়। শেষে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

ইতালি-যাত্রার পূর্বে কবির হাতে এটি রূপ পায় মুখ্যত রঙ্গমঞ্চের জীবন-আলেখ্য হিসাবে। সেই প্রথম পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার-এর উদ্দেশ্য পূর্বের পরিকল্পনার তুলনায় অনেক ব্যাপক ও গভীর।

এই গ্রন্থ সম্পর্কে কবির উক্তি এই:

মাইস্‌টারের মূলে রয়েছে এই বড় সত্যের অস্পষ্ট অনুভূতি যে মানুষ অনেক সময়ে তাই-ই বেশী করে' চায় প্রকৃতির বিধানে যা পাওয়া তা'র পক্ষে সম্ভবপর নয়। সমস্ত সৌখীন খেয়াল ও মিথ্যা আগ্রহ এই

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এও সত্য যে এই সব মিথ্যা খেয়ালের গতি অসীম কল্যাণের দিকেই।

অন্যত্র বলেছেন :

এই গ্রন্থ এক দুজ্ঞের্য় সৃষ্টি। এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চাবিকাঠি যে আমার কাছেই আছে তা ঠিক নয়। এর মূল কথা কি সবাই তা খুঁজছে। কিন্তু সেটি খুঁজে পাওয়া সোজা নয় : এই প্রশ্নও সঙ্গত নয়। আমার ত ধারণা কোনো স্পষ্ট ধারণার পরিবর্তে একটি সমৃদ্ধ বহুমুখী জীবন যে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি এই যথেষ্ট, স্পষ্ট ধারণা ত মোটের উপর বুদ্ধির ব্যাপার। কিন্তু তেমন কিছু যদি না হলেই নয় তবে সেটি পাওয়া যাবে ভিল্‌হেল্‌মের প্রতি ফ্রীড্‌রিখের এই উক্তিতে : আমার মনে হয় তোমার অবস্থা বাইবেলের সেই কিশ-এর পুত্র সৌল-এর মতো, বেরিয়েছিল সে পিতার গাধার পালের সন্ধানে কিন্তু পেয়ে গেল এক রাজ্য। — বাস্ এইটি নাও। আমার ত মনে হয় সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে এই কথাটিই বলা হয়েছে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মহত্তর শক্তির পরিচালনায় মানুষ শেষে গিয়ে পৌঁছোয় এক আনন্দময় লক্ষ্যে।

গ্রন্থের এই যে দুটি দিক—শিল্প-সৌন্দর্য আর তত্ত্ব—গ্যেটে-সমালোচকরা কেউ কেউ বেশী মনোযোগ দিয়েছেন এর প্রথমটির দিকে, কেউ কেউ দ্বিতীয়টির দিকে। গ্যেটের চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা যে অসাধারণ সেকথা সবাই স্বীকার করেছেন।—মাইস্‌টার-এ "সাধু" চরিত্রের সংখ্যা কম "পাপী" চরিত্রের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু 'পাপ'কে কবি লোভনীয়ও করেন নি, ঘৃণ্যও করেন নি, তিনি এঁকে চলেছেন জীবনের ছবি 'পাপ' অথবা ত্রুটি যার আনুষঙ্গিক। কাহিনীটি এই :

তরুণ ভিল্‌হেল্‌ম্ তরুণী মারিয়ানার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে ; মারিয়ানা অভিনেত্রী, নোরবের্গ নামক একজন ধনাঢ্য যুবক তাকে লাভ করতে ইচ্ছুক, মারিয়ানাকে সে আর্থিক সাহায্য করে' চলেছে, কিন্তু ভিল্‌হেল্‌ম তার কিছুই জানে না। নোরবের্গের অনুপস্থিতিকালে মারিয়ানা ও ভিল্‌হেল্‌ম্ পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। মারিয়ানার বিচক্ষণ পরিচারিকা বারবারা তার কর্ত্রীকে শোনাচ্ছে নোরবের্গের কথা, নোরবের্গ সম্প্রতি যেসব উপহার মারিয়ানার জন্য পাঠিয়েছে সেসব সে তাকে দেখাচ্ছে, কিন্তু সেসব কথা মন থেকে বিসর্জন দিয়ে মারিয়ানা ভিল্‌হেল্‌মের সাহচর্যে নিবিড় আনন্দ উপভোগ করে' চলেছে। ভিল্‌হেল্‌ম্ মারিয়ানাকে ও তার পরিচারিকাকে শোনাচ্ছে তার বাল্য-কাহিনী—যে-জীবনে পুতুলের সাহায্যে নাটক দেখানো তার অপরিসীম আনন্দের বিষয় ছিল। সেই থেকে নাট্যকলার প্রতি তার নিবিড় অনুরাগের সূত্রপাত। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে চলেছে ভিল্‌হেল্‌মের সেই

ছেলেবেলাকার পুতুল-নাট্যের বিবৃতি।—তারপর ভিল্‌হেল্‌ম্‌ বিষয়-কর্মে নিযুক্ত হচ্ছে তার পিতার ইচ্ছায়। সেই সূত্রে অভিনেতা মেলিনা ও তার প্রণয়িনীর সঙ্গে তার পরিচয় হচ্ছে—প্রণয়িনী তার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে' এসেছে মেলিনার সঙ্গে আর মেলিনা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ভিল্‌হেল্‌মের চেষ্টায় প্রণয়িনীর পিতার ক্রোধ প্রশমিত হচ্ছে ও মেলিনা তার প্রণয়িণীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। মেলিনা অভিনেতার দুঃসহ ভাগ্যের কথা ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে বলছে ও এই ব্যবসায় ত্যাগ করতে চাচ্ছে। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মুখে কোনো প্রতিবাদ করছে না কিন্তু স্বব্রতত্যাগী মেলিনাকে মনে মনে ধিক্কার দিচ্ছে :

> ····মানুষের মনে যে পবিত্র অনল-কণা সঞ্চিত রয়েছে তার অস্তিত্ব তুমি অনুভব করছ না ; সেই অনল-কণাকে যদি লালন করা না হয়, বাতাস দিয়ে সতেজ রাখা ন হয়, তবে তা আবৃত হয় প্রাত্যাহিক জীবনের ওদাসীন্য ও অভাবের ভস্মে। কিন্তু তবু দীর্ঘকালেও যেন সেই অনল-কণা নির্বাপিত হতে চায় না—হয়ত কখনো নির্বাপিত হয় না। এই অনল-কণাকে সতেজ করে' তোলার তাগিদ তুমি নিজের অন্তরাত্মায় অনুভব করছ না, তোমার অন্তরে এমন সম্ভার নেই যার দ্বারা এই প্রজ্জ্বলিত অনল-কণা লালিত হতে পারে।···

মারিয়ানাকে বিবাহ করতে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ একান্ত ইচ্ছুক। তার সেই ইচ্ছা ও তার জীবনের লক্ষ্য সে একখানি দীর্ঘ পত্রে ব্যক্ত করলে, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই চিঠিখানি মারিয়ানাকে দেওয়া হলো না। এই সময়ে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মারিয়ানার কাছ থেকে নেওয়া একখানি রুমালে পেলো মারিয়ানার সাহায্যদাতা ও প্রেমাকাঙ্ক্ষীর এক পত্র। সেই পত্র পড়ে' সে মুষড়ে পড়লো—তার সমস্ত রঙীন কল্পনা কোথায় উবে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায় ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে দেখা যাচ্ছে নিরতিশয় শোকগ্রস্ত, শেষে সে রোগশয্যাশায়ী হলো। তার বন্ধু ভের্ণর মারিয়ানার অবিশ্বাস্য প্রকৃতির কথা তুলে' ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে সুপথে আনতে চেষ্টা করলে, কিন্তু সব বৃথা। রোগভোগের পরে একদিন ভিল্‌হেল্‌ম্‌ তার সমস্ত বাল্য-রচনা ভস্মীভূত করলে ও সংকল্প করলে অভিনেতার জীবন সে কখনো গ্রহণ করবে না। তার এমন চিত্তবিক্ষোভ লক্ষ্য ক'রে তার এই সাংসারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন বন্ধু হতভম্ব হলো।

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ তার পিতার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলে। বহুজনের কাছে টাকা বাকি পড়েছিল, সেসব আদায় করতে সে এক সময়ে বেরিয়ে পড়লো। এই সূত্রে বহু স্থান পরিদর্শন ক'রে যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে নিয়ে একদিন সে উপস্থিত হলো এক সরাইখানায়—সেখানে এক সার্কাস-পার্টি আড্ডা গেড়েছে। সেই সরাইয়ের অদূরে আর এক সরাইয়ে ফিলিনা ও লেয়ার্টেস বাস করছিল, তারা এক থিয়েটারের দলের

ভগ্নাবশেষ—নতুন কাজের সন্ধানে রয়েছে ও হাতে যা আছে খরচ করে' চলেছে। তাদের সঙ্গে ভিল্‌হেল্‌মের পরিচয় হলো। সার্কাস-পার্টিতে মিগ্‌নন নামে একটি বালিকা ছিল। তার অবাধ্যতার জন্যে সার্কাসের ম্যানেজার তাকে খুব শাস্তি দেয়। তার হাত থেকে ভিল্‌হেল্‌ম্ এই বালিকাকে উদ্ধার করে কিছু অর্থব্যয় করে'। মিগনন অতি মিতভাষিণী—ভাঙা ভাঙা জার্মানে দুই একটি কথা বলে। ভিল্‌হেল্‌মকে সে প্রভু বলে' জেনেছে, তার সন্তোষ-সাধনের জন্য সে একান্ত চেষ্টিত হলো। একদিন একখানি কার্পেটের উপরে কয়েকটি ডিম সাজিয়ে চোখ বেঁধে সে এমন দক্ষতার সঙ্গে নাচ্‌ল যে একটি ডিমও স্থানভ্রষ্ট হলো না। তার এই কৃতিত্বে ভিল্‌হেল্‌ম্ খুশী হলো। অভিনেতা লেয়ার্টেস ও অভিনেত্রী ফিলিনার সঙ্গে তার হৃদ্যতা হলো। ফিলিনার বালক-ভৃত্য ফ্রীডরিখও তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে তার অদ্ভুত ঈর্ষার দ্বারা—সে মনে মনে ফিলিনার অনুরাগী হয়ে উঠ্‌ছিল আর সেজন্যে অন্যের সঙ্গে ফিলিনার সম্পর্ক প্রীতির চক্ষে দেখছিল না। ফিলিনা শিল্পীর এক অপূর্ব সৃষ্টি। তার রূপ-যৌবন, চঞ্চলতা, অবিশ্বস্ততা ও অকৃত্রিমতা তাকে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দান করেছে। নারীরা কেউই তাকে দেখতে পারে না, পুরুষরা যেমন তার দ্বারা আকৃষ্ট হয় তেম্‌নি তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে চটেও যায়। কিন্তু তার বহু অপরাধ সত্ত্বেও তার উপরে পুরোপুরি রাগ করা যেন কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এমন প্রাণবন্ততা আর ঋজুতা তার মধ্যে রয়েছে যার জন্য সমস্ত অসঙ্গত আচরণ সত্ত্বেও সে সুন্দর। এক সময়ে ভিল্‌হেল্‌ম্ তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলে, কিন্তু অচিরেই ক্রুদ্ধ হলো তাকে আয়ত্তের মধ্যে না পেয়ে। অবশ্য তার এই ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। লেয়ার্টেস কর্মদক্ষ কিন্তু নারী-বিদ্বেষী, তার নববধূর অবিশ্বস্ততা তার এমন মনোভাবের মূলে। এদের সঙ্গে খানাপিনায় ও ভ্রমণে ভিল্‌হেল্‌ম্-এর দিন আনন্দেই কাট্‌তে লাগ্‌লো। এক স্টীমার-ভ্রমণকালে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ভিল্‌হেল্‌মের দেখা হলো। কথায় কথায় সে বল্লে:

> বাল্য সঙ্গ ও শিক্ষার কুফল পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা প্রতিভার পক্ষেও সম্ভবপর নয়।

কথাটা ভিল্‌হেল্‌মের মনে দাগ কাট্‌লো। এই সময়ে একদিন সে জানলে মারিয়ানার এখন সন্তানসম্ভাবনা, সে থিয়েটারের দল ছেড়ে কোথায় চলে গেছে; জেনে মারিয়ানার চিন্তা নূতন ক'রে তার অন্তরে প্রবল হলো। অল্পকিছুকাল পরে এক অদ্ভুত বুড়ো সারেঙ্গী (Harper) এখানে এসে জুটলো। ভিল্‌হেল্‌ম্ তার গভীর ভাবপূর্ণ গানে একান্ত মুগ্ধ হলো। তার একটি বিখ্যাত গান এই:

> রুটির সঙ্গে যার না মিশেছে চোখের জল,
> রাতের আঁধার যে না কান্নায় ভোর করেছে

একলা বিছানায়,
সে জানেনা তোমাদের ওগো স্বর্গের দেবকুল !

তোমাদের শক্তিতে মানুষ পেয়েছে জীবন,
কিন্তু ছেড়ে দিয়েছ হতভাগাদের অপরাধের পথে,
তারপর দাও তাদের তীব্র অনুশোচনা,—
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় মানুষকেই।

মিগননও মাঝে মাঝে মধুর গান করতো। 'ইতালি-প্রবাস' অধ্যায়ে তার যে গানের কথা বলা হয়েছে তার প্রথম কলি এই :

জানো কি বন্ধু, সে-দেশের কথা যেখানে জন্মে অম্ল-আপেল,
ঘন পাতার মধ্যে ফলে সোনালি নারাঙ্গী ?
গম্ভীর নীলাকাশ থেকে আসে মৃদুমন্দ হাওয়া,
ঘনপত্র 'মার্টল্' আর উঁচু 'লরেল' জন্মে যে দেশে !
জান কি তবে সে দেশের কথা—আছে সে দেশ আছে সে দেশ,
ওগো পরাণ-বন্ধু; যেতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে সেই দেশে !

মেলিনা ও তার স্ত্রী এখানে এসে জুটেছে। মেলিনার অনুনয়ে তার থিয়েটারের দল গঠনের জন্য ভিল্‌হেল্‌ম্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে কিছু টাকা কর্জ দিলে। তারপর এই স্থান ত্যাগ করে' যাবার জন্য সে প্রস্তুত হলো। কিন্তু তার প্রভু তাকে ত্যাগ করে' চলে যাচ্ছে এই ভেবে মিগনন এত বিহ্বল হয়ে পড়লো যে ভিল্‌হেল্‌ম্ তার সংকল্প ত্যাগ করলে।

তৃতীয় খণ্ডে মেলিনার নতুন থিয়েটারের দল আমন্ত্রিত হয়েছে স্থানীয় এক 'কাউণ্টে'র ভবনে। তার গৃহে এদের তেমন সমাদরই জুটেছে এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের যা জুটে থাকে। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ও এদের সঙ্গে কাউণ্টের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে। তার সাহিত্যিক রুচি ও প্রতিভার দ্বারা অচিরেই সে কাউণ্ট-পরিবারের প্রীতি আকর্ষণ করলে। ফিলিনা ও লেয়ার্টেস এই দলে ছিল। ফিলিনা তার চাঞ্চল্য ত্যাগ করে' কাউণ্ট-পত্নীর একান্ত অনুগত হয়ে তার স্নেহ লাভ করলে। কাউণ্ট-পত্নীর অপূর্ব সৌন্দর্যে ভিল্‌হেল্‌ম্ মুগ্ধ হলো। এই পরিবারে জার্ণো নামক এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিন্তু দুর্মুখ ব্যক্তি ছিল। এই থিয়েটারের দল, মিগনন, সারেঙ্গী প্রভৃতির সঙ্গে ভিল্‌হেল্‌মের সংস্রবের জন্য সে তার তীব্র নিন্দা করলে। এর কাছেই ভিল্‌হেল্‌ম্ শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের গুণবত্তার সংবাদ পেলে ও অচিরে শেক্‌স্‌পীয়রের একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লো। কাউণ্ট-পত্নীর মনেও ভিল্‌হেল্‌মের প্রতি আনুকূল্য জাগ্‌লো। তাদের মিলন ঘটাবার জন্য কাউণ্ট-পত্নীর বান্ধবী ব্যারণ-পত্নী চেষ্টিত হলো—সে একনিষ্ঠা ছিল না—কিন্তু

সফলকাম হলো না। একদিন কাউণ্টের যুদ্ধযাত্রা কালে কাউণ্ট-পত্নী তার রত্নালঙ্কার পরিধান করলে। তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য দর্শনে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ যেন বিহ্বল হয়ে পড়লো। সাজ-সজ্জার যারা নিন্দা করে তাদের মূঢ়তা সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হলো; তার মনে জাগ্‌লো :

> মিনার্ভা যেমন পূর্ণ যুদ্ধসজ্জা নিয়ে জুপিটারের মস্তক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তেমনি এই সালঙ্কারা দেবী যেন লঘুপদে পুষ্প থেকে নির্গত হয়েছে।

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ সে'দিনও কাউণ্ট-পত্নীর সভায় কিছু পাঠ করে' শোনালে। ভাবাবেগের আতিশয্যে তার পাঠ তেমন সুন্দর হলো না, তবু কাউণ্ট-পত্নী তার পাঠের প্রশংসা করলে ও তাকে উপহার দিল তার নিজের একটি আংটী। ফিলিনার নির্দেশ মতো ভাবে-দিশাহারা ভিল্‌হেল্‌ম্‌ নতজানু হয়ে কাউণ্ট-পত্নীর হস্ত চুম্বন করে' তার কৃতজ্ঞতা জানালে। শেষে সভাগৃহে কাউণ্ট-পত্নী ও ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ভিন্ন আর কেউ ছিল না। তারা যে কেমন করে' পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হলো, পরস্পরকে চুম্বন করলে, তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারলে না। হঠাৎ কাউণ্ট-পত্নী নিজেকে নিষ্ক্রান্ত করে' অন্তরের আবেগ সামলে নিয়ে পরম করুণ কণ্ঠে ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে বল্লে : এখনই চলে যাও যদি আমাকে ভালবাস।

চতুর্থ খণ্ডে এই থিয়েটারের দল শহরের দিকে রওনা হয়েছে, ভিল্‌হেল্‌ম্‌ও তাদের সঙ্গে। কাউণ্ট তাকে কিছু অর্থ দিয়েছে। প্রথমে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ এই অর্থ গ্রহণ করতে ঘোর আপত্তি করে, তার যুক্তি, অর্থ গ্রহণ করলে সব সম্বন্ধ চুকে যায়, সে বরং এই সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তরে স্থান পেতে চায়। কিন্তু কাউণ্ট অসন্তুষ্ট হবে ভেবে শেষ পর্যন্ত সে অর্থ গ্রহণ করে আর গ্রহণ করে' আনন্দিত হয় তার প্রকৃতিদত্ত শক্তির এই স্বীকৃতি দেখে। পথে এই থিয়েটারের দল কাউণ্ট ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে ও মন্তব্য করে : বড়লোকেরা ধনে ও পোষাকে-পরিচ্ছদে অভ্যস্ত, অপরকেও তারা সেই-সবে অভ্যস্ত দেখতে ভালবাসে; পদমর্যাদা, ধন ও পোষাক-পরিচ্ছদের সেজন্য তাদের কাছে বেশী মূল্য মানুষের প্রকৃতিগত গুণপনার চাইতে, অন্তরের সম্পদের প্রাচুর্যের যে আনন্দ—যেমন প্রাণঢালা বন্ধুত্বের আনন্দ—সেটি দরিদ্রদের জন্যই।—অবসর সময়েও শিল্পীদের শিল্পসাধনায় একান্ত মনোযোগী হওয়া উচিত, তাদের এমন দক্ষ হওয়া চাই যেমন দক্ষ তারের উপরে যারা বাজি করে তারা', ভিল্‌হেল্‌মের এই কথায় সবাই অভিনয়ে উৎকর্ষ লাভ করতে চেষ্টিত হলো। একদিন ভিল্‌হেলম্‌ হ্যামলেট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলে, তার মর্ম এই : হ্যামলেট নাটকটি পুরোপুরি বোঝা নানা কারণে দুরূহ; তবে এটি বোঝা যায় যদি হ্যামলেটের পূর্বজীবনের কথা ভাবা যায়; সেই জীবনে সে রাজপুত্র, ভবিষ্যৎ রাজা, অকপট, স্নেহপ্রবণ—অর্থাৎ

সহজভাবে মহৎ; তার জীবনের এই পটভূমিকা স্মরণে রাখলে বোঝা যায় মানুষের অশোভন আচরণ, অপরাধ-প্রবণতা, এসব তাকে কেন এত অস্থির করে' তোলে। (এই হ্যামলেট-সমালোচনা অনেকের মতে বহুমূল্য)। যে পথ দিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছিল সে-পথে দস্যুভয় ছিল। কিন্তু ভিল্‌হেল্‌মের উৎসাহে সবাই সেই পথেই অগ্রসর হয়। হঠাৎ বাস্তবিকই তারা ডাকাতদের হাতে পড়ে—ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ও লেয়ার্টেস আহত হয়। ভিল্‌হেল্‌ম আহত হয় গুরুতরভাবে, তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মিগ্‌ননও আহত হয়। এই বিপদ থেকে তারা উদ্ধার পায় হঠাৎ-এসে-পড়া এক বীরাঙ্গনার ও তার পার্শ্বচরদের যত্নে। তার পরিচয় তারা পায় না, কিন্তু তার পরিচয় পাবার জন্য ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ব্যাকুল হয়। ফিলিনার আন্তরিক সেবায় ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে, যদিও ফিলিনার সান্নিধ্যে সে তেমন আনন্দলাভ করছিল না। ভিল্‌হেল্‌মের অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীর্ঘদিন তার সেবা করে', ভালবেসে, বিরক্ত করে' একদিন ফিলিনা অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই দলবলসহ ভিল্‌হেল্‌ম্‌ শেষে উপস্থিত হয় তার পূর্বপরিচিত থিয়েটারওয়ালা সের্লোর কাছে। সের্লোর ভগিনী সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী আউরেলিয়ার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আউরেলিয়া তার জীবনের কাহিনী তাকে শোনায়। যার সঙ্গে আউরেলিয়ার বিবাহ হয়েছিল তার সঙ্গে তার অসদ্ভাব ছিল না, খুব মিল যে ছিল তাও নয়। তার মৃত্যুর পূর্বেই লোথারিও নামক এক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। লোথারিওর রুচি বুদ্ধি অকপটতা ও কর্মকুশলতা তার মনকে আকৃষ্ট করে। লোথারিও চলে যায়। তার অনুপস্থিতিকালে তার প্রতি আউরেলিয়ার প্রেম দিন দিন তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে চলেছে। এক প্রবল ভাবাবেগে তার দিন কাটছে। তার একটি কথা এই:

> নারীর অন্তরাত্মা যখন তার প্রেমিককে নিবেদিত হয় তখন তার মতো স্বর্গীয় বস্তু আর কিছু নেই।

ভিল্‌হেল্‌মকে থিয়েটারে নামবার জন্য সের্লো পীড়াপীড়ি করে। এদের কাছেও সে হ্যামলেট ব্যাখ্যা করে। ভিল্‌হেল্‌মের অন্তর্দৃষ্টি দেখে আউরেলিয়া পুলকিত হয় আর বিস্ময় প্রকাশ করে সংসার সম্বন্ধে তার অজ্ঞতা দেখে' কেননা মেলিনার দলের মতো একটি অপদার্থ দলের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করেছে। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ বলে, ছেলেবেলা থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভের চেষ্টাই সে করেছে, ফলে মানুষকে সে কিছু জানে কিন্তু মানুষদের জানে না আদৌ। তাতে আউরেলিয়া বলে:

> সেটি ক্ষোভের বিষয় নয়; বুদ্ধি বিচার আয়ত্ত করা যায় কিন্তু অন্তরের পূর্ণতা বাইরে থেকে পাওয়া যায় না; শিল্পীর দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রখরদৃষ্টি না হলেও চলে কিন্তু ফুলের কুঁড়ির উপরকার আবরণের মতো তার মোহন স্বপ্ন যদি অকালে ভেঙে যায় তবে সেটি বড় দুঃখের কথা।

পঞ্চম খণ্ডে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ পাচ্ছে তার পিতার মৃত্যু-সংবাদ। তার বন্ধু ভের্নের

এ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছে, তার পত্রে ব্যক্ত হয়েছে আর্থিক উন্নতি লাভের জন্য তার ব্যগ্রতা। কিন্তু ভিল্‌হেল্‌ম্ তাকে লিখলে: সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে' ফেলেছে; ধনী হওয়া তার কাম্য নয় সে চায় চিত্তোৎকর্ষ লাভ করতে; জার্মানীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যা অবস্থা তাতে কোনো কোনো বিষয়ে কৃতী হতেই তারা পারে, প্রকর্ষবান্ হওয়া তাদের আয়ত্তের বাইরে; কিন্তু সে শুধু কৃতী হতে চায় না সুন্দর হতে চায় পরিপূর্ণ আত্মোৎকর্ষ লাভ করে'—জন্মসূত্রে যা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে; এই পথেই সে অগ্রসর হয়ে চলেছে ও এর মধ্যেই কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, স্বাভাবিক মহিমা-সমন্বিত অভিজাত-সমাজে এখন সে অনেকটা সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারে; সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে সে জাতির উপরে তার কল্যাণ ও সৌন্দর্য্য সাধনার প্রভাব বিস্তার করবে।—এর পরে ভিল্‌হেল্‌ম্ সের্লোর থিয়েটারে যোগ দিলে। মিগনন এতে আভাসে ইঙ্গিতে প্রবল আপত্তি জানায়। বুড়ো সারেঙ্গীও এসে বল্লে: সে ভাগ্যতাড়িত, তার এখান থেকে চলে যেতে হবে। ভিল্‌হেল্‌ম্ এসবে মন দিল না। হ্যামলেট নাটকে সে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করলে আউরেলিয়া গ্রহণ করলে ওফেলিয়ার ভূমিকা। তাদের হ্যামলেট-অভিনয় আশাতীত ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলো। কিন্তু হঠাৎ তাদের গৃহে আগুন লাগ্‌লো আর বুড়ো সারেঙ্গী সেদিন ফেলিক্‌স্ নামক একটি ছোট ছেলেকে বলি দিতে চেষ্টা করলে। এই ফেলিক্‌স্ আউরেলিয়ার পুত্র, ভিল্‌হেল্‌ম্ তার লালন-পালনের ভার নিয়েছিল আউরেলিয়ার অসুস্থতার জন্যে। সবাই বুঝলো বুড়ো সারেঙ্গীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে, তাকে এক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রাখা হলো। সেইদিন রাত্রে ভিল্‌হেল্‌ম্ হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মার মুখোস তার ঘরে দেখতে পেলে তার উপর লেখা ছিল: হে যুবক পালাও! ব্যাপারটা ভিল্‌হেল্‌মের মনে হলো অদ্ভুত। এর পরে তারা অন্যান্য নাটক অভিনয় করলে। লেসিঙ্-এর এক নাটকের এক ব্যর্থ প্রেমিকার ভূমিকায় আউরেলিয়া এতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করলে যে শ্রোতারা আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হলো। কিন্তু তার ভাই সের্লো ক্রুদ্ধ হলো প্রকারান্তরে তার নিজের জীবন-রহস্য এতখানি ব্যক্ত করায়। আউরেলিয়াও বিষম ক্রুদ্ধ হলো এবং সেই রাত্রে এমন ঠাণ্ডা লাগালে যে অচিরেই মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করলে। এক ডাক্তার তার অবস্থার কথা জেনে তাকে ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে দিয়ে পড়ে শোনালে "এক সুন্দর-আত্মার আত্মকাহিনী"। সেই বিবৃতি শুনে আউরেলিয়ার মন কিছু শান্ত হলো। মৃত্যুর পূর্বে সে ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে ভার দেয় তার এই ব্যর্থ প্রেমের বার্তা তার নিষ্ঠুর প্রেমিকের কাছে বহন করতে। সের্লোর থিয়েটারে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। মেলিনা ভিল্‌হেল্‌মের প্রভাব সহ্য করতে পারছিল না, সে চাচ্ছিল থিয়েটারকে অপেরায় পরিণত করতে। আউরেলিয়ার মৃত্যুর পরেই ভিল্‌হেল্‌ম্ তার দৌত্যে অগ্রসর হলো।

ষষ্ঠ খণ্ডে সেই "সুন্দর-আত্মার আত্মকাহিনী"। কুমারী ফন ক্লেটেনবের্গের কথা যে এতে বলা হয়েছে তা আমরা জানি। এই 'সুন্দর-আত্মা' এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। ছেলেবেলায় সে স্বাস্থ্যবতী ছিল কিন্তু আট বৎসর বয়সে খুব অসুস্থ হয়। রোগশয্যায় পুতুল নাড়াচাড়া করে' সে আনন্দ লাভ করতে চেষ্টা করতো। তার মা তাকে শোনাতো বাইবেলের গল্প, পিতা তাকে দিত তার সংগৃহীত বিচিত্র দ্রব্য—হাড়, শুকনো গাছ, শুকনো পোকা, শুকনো চামড়া ইত্যাদি। কখনো কখনো শিকার-করা পাখী তাকে দেখতে দিত। তার এক মাসী তাকে শোনাতো রূপকথার রাজপুত্রের গল্প। এ সবই বালিকার মনের উপর অল্প বিস্তর প্রভাব বিস্তার করতো। এক অজ্ঞাত শক্তির ধারণা বালিকার মনে আসে, তার উদ্দেশ্যে সে কবিতা রচনা করে। মাসী তাকে বলেছিল যে-মেষশাবকের গল্প সে ছিল ছদ্মবেশী রাজকুমার, ছদ্মবেশ ত্যাগ করে' একদিন সে রাজকুমারীর বর হলো—বালিকার মনেও চলতো তেমন মেষশাবকের কামনা।

তেমন মেষশাবক তার জুটলো: রোগভোগের পরে তার পরিচয় হলো দুটি কিশোরের সঙ্গে; তাদের সঙ্গে তার খুব ভাব হলো। তাদের বড়টির সঙ্গেই শেষে তার বেশী ভাব হলো আর ছোটটি তাতে খুব ঈর্ষান্বিত হলো। এই বালিকার ফরাসী শিক্ষক বালিকাকে তার বন্ধুদের সম্বন্ধে সাবধান করে, বলে, এমন বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত হয় বিপজ্জনক কারণ মেয়েরা খুব দুর্বল। তার কথা বালিকা বিশ্বাস করে না; কিন্তু তার মতের দৃঢ়তা বালিকাকে স্পর্শ করে। বালিকা উত্তর দেয়: ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করবে যেন সব বিপদ থেকে তিনি তাকে রক্ষা করেন। তেমন না ভেবে-চিন্তেই সুন্দর-আত্মা এই কথা বলে কেননা ঈশ্বরের চিন্তা তখনো তার মনে প্রবল হয়নি। এই দুই কিশোর মারা যায়। সেদিনে জার্মানীর ভদ্রসমাজের তরুণরা সাধারণত ছিল ভ্রষ্টচরিত্র, এদের সম্বন্ধেও ফরাসী শিক্ষক বালিকাকে সাবধান করে। বালিকা এদের সংস্রব এড়িয়ে চলে, এমনকি এদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হতো। এর পর বালিকার পরিচয় হয় নার্সিস নামক এক যুবকের সঙ্গে। তার সঙ্গে তার বিবাহের কথা স্থির হয়। কিন্তু নার্সিস তাকে যতখানি নিকটে পেতে চায় তাতে বালিকা সম্মত হয় না—তার ফরাসী শিক্ষকের সতর্ক-বাণী সে ভুলতে পারে নি। এতে নার্সিস খুশী হয় না। কথা ছিল নার্সিসের চাকরি হলেই তাদের বিবাহ হবে। একটি চাকরি খালি হলো। বালিকা ভগবানের কাছে খুব প্রার্থনা করলে যেন চাকরিটি নার্সিস পায়। কিন্তু চাকরিটি পেল নার্সিসের চাইতে নিকৃষ্টতর এক ব্যক্তি। সুন্দর-আত্মা মর্মাহত হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ধারণা হলো যা হয় সব ভগবানের বিধানে। ভগবানের পরে এই নির্ভরতায় সে বল পেল, আনন্দ পেল। এই থেকে সে ভাবতে লাগল কেন এমন নির্ভরতা নষ্ট হয়। সে বুঝলো

সামাজিক জীবনে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদের আকর্ষণই এর মূলে। সে নাচ ও খেলায় যোগ দেওয়া বন্ধ করলে। ধীরে ধীরে সে তার নূতন সংকল্প দৃঢ় করলে। আর নার্সিস ও তার মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চললো—যদিও নার্সিসের প্রতি তার নিজের ভালবাসা শিথিল হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নার্সিসকে ত্যাগ করেও তার নিজেরপথে অবিচলিত রইল। তার এমন আচরণে তাদের পরিবারের সবাই বিস্মিত ও দুঃখিত হলো, কিন্তু তার পিতা শেষ পর্যন্ত তার স্বাতন্ত্র্য মান্য করলে। ধীরে ধীরে সুন্দর-আত্মার ঈশ্বর-বোধ ঘনীভূত হলো, সে অনুভব করতে লাগলো ঈশ্বরের সান্নিধ্য—ঈশ্বর যেন সব সময়ে তার সামনে, তিনি তার অদৃশ্য বন্ধু। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধানের দিকে তার প্রবণতা হলো না, পাপ-চিন্তা পরলোক-চিন্তা এসব তাকে স্পর্শ করলো না। তার মনে হলো যারা ঈশ্বর-বোধ-বর্জিত তারা পরলোকে শাস্তি পাবে কিনা তার চাইতে অনেক বড় কথা এই যে এই অভাবের জন্য জীবনে তারা মহা দুঃখী, নরকের শাস্তি তার চাইতে আর বেশী কি হবে।

দীর্ঘদিন এই চিন্তায় তার কাটল। তারপর তার পরিচয় হলো ফিলো নামক একজন যুবকের সঙ্গে। তার সঙ্গে তার খুব ভাব হলো। ফিলো উন্নতপ্রকৃতির কিন্তু তার মনের ভিতরে চলেছে যেসব কামনার সংগ্রাম সে-সবই ধীরে ধীরে এই সুন্দর-আত্মার কাছে প্রকাশ পেলো। এ থেকে সুন্দর-আত্মা দেখলে তার নিজের নিষ্পাপ অন্তরেও কামনা কেমন প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে এবং এখন কি প্রবল হতে চাচ্ছে। তার ভিতরকার এই কদর্যতায় সে স্তম্ভিত হলো। এই অসহায় অবস্থায় সে আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকলে উদ্ধার পাবার জন্যে। এমনি প্রার্থনার সময় একদিন সে চমকিত হয়ে অনুভব করলে ভগবানে সত্যকার বিশ্বাস কি জোরালো ব্যাপার। এই জোরালো ভক্তি ও নির্ভরতার গুণে সে রক্ষা পেল।† এই ঈশ্বর নির্ভরতাই এখন থেকে হলো তার জীবনের অবলম্বন। এরপর তার পরিচয় হলো হের্ণহুট সম্প্রদায়ের সঙ্গে।

এই সুন্দর আত্মার এক বিপত্নীক ও নিঃসন্তান কাকা ছিল। সে সুবিজ্ঞ। সুন্দর আত্মার এই আদর্শনিষ্ঠার প্রতি সে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, বলে, এতে রূপ পেয়েছে সুন্দর-আত্মার অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্ম যার সার্থকতা না হলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে অন্য একটি চিন্তাধারার কথা যাতে চেষ্টা করা হয় মানুষের সর্ববিধ চেতনার সঙ্গে পরিচয় লাভের ও তার সমস্ত শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের। সুন্দর-আত্মার ছোট বোনকে তার এই কাকা বিবাহ দেয় ও তার ও তার স্বামীর অকাল মৃত্যুর পরে তাদের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই কাজে সুন্দর আত্মার সাহায্য সে পরিহার করে' চলে; সুন্দর-আত্মা বুঝতে পারে

† 'কৈশোর' খণ্ডে 'অসুস্থতা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় ঈশ্বর-চিন্তা ও আত্ম-অনুসন্ধান তার কাকা স্থান দিতে চায় না, সে চায় যা সহজ ভাবে মানুষের চারপাশে রয়েছে ও তার জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ সে-সবের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচয়। সমস্ত রকমের ভাবাবেশ যে শ্রেষ্ঠ নৈতিক উৎকর্ষের পথে বাধা এর ইঙ্গিতও সে সুন্দর-আত্মাকে দেয়। সুন্দর-আত্মা অবশ্য নিজের আদর্শকে যথেষ্ট কার্যকর জ্ঞান করে; আর তার ধারণা হয় কেউই প্রকৃতপক্ষে পরমতসহিষ্ণু নয়, কাজের বেলায় সবাই ভিন্নমতাবলম্বীকে পরিহার করে' চলে। সুন্দর-আত্মা তার আখ্যায়িকা শেষ করছে এই বলে':

> ধর্মের কোনো আদর্শের দ্বারা আমি পরিচালিত হয়েছি মনে পড়ে না, কোনো কিছুই অনুশাসন রূপে আমার সামনে দেখা দেয় নি; আমাকে চালিত করেছে এক প্রেরণা, আর সব সময়ে ঠিক পথে। আমি সহজ-ভাবেই অনুসরণ করি আমার অন্তরের প্রবণতা—যেমন বাইরের বন্ধন তেমনি অনুতাপ আমার অজ্ঞাত। ভগবানেরই প্রশংসা—তিনি জানেন আমার অন্তরের এই আনন্দের জন্য আমি কার কাছে ঋণী, আর এর জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার নিজের কি সাধ্য সে-সম্বন্ধে আমার কোনো অহঙ্কার নেই, ভালভাবেই আমি জানি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে কত বড় দানবের জন্ম ও লালন হতে পারে যদি উচ্চতর প্রভাব আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত না করতো।

সপ্তম খণ্ডে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ লোথারিওর বাড়ী খুঁজে পেয়েছে। তার বাড়ী এক পার্বত্য অঞ্চলে; এক পুরোনো বাড়ীর সঙ্গে পরে পরে যুক্ত হয়েছে নানা কোঠা; গৃহস্বামীর দৃষ্টি যে সৌন্দর্যের দিকে তেমন নয় যেমন প্রয়োজনের দিকে তা বোঝা যায়। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে' লোথারিওর সঙ্গে তার দেখা হলো। সে আউরেলিয়ার পত্র তাকে দিলে। তাকে যেসব কড়া কথা শোনাবে বলে ঠিক করে' রেখেছিল তা আর বলা হলো না, লোথারিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, বলে গেল এর পরে এ বিষয়ে কথা হবে। কিছুক্ষণ পরেই এক তরুণীর আকুল কান্নায় বাড়ী সরগরম হয়ে উঠ্‌লো। এই বাড়ীতে ছিল আমাদের পূর্বপরিচিত জার্নো আর একজন পুরোহিত। তারা তরুণীকে শান্ত করতে চেষ্টা করলে। তরুণীর নাম লিডিয়া—লোথারিওর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। লোথারিও গেছে এক দ্বৈরথ যুদ্ধে, সেজন্য তার এই আকুলতা। শীগগিরই লোথারিও ফিরলো সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে। এই দ্বৈরথ যুদ্ধের মূলে ছিল এক মহিলার ক্ষোভ; সে লোথারিওর সুপরিচিত, কিন্তু কালে কালে তার ধারণা হয় লোথারিও তার পাশ কাটিয়ে চলেছে; এতে সে নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করে ও এর প্রতিবিধান করতে তার অনেক বন্ধুর শরণাপন্ন হয়; শেষে তার অবহেলিত স্বামীই তার সম্মান রাখবার জন্য লোথারিওকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করে।

এই দ্বন্দ্বে তারা দুজনেই গুরুতর রূপে আহত হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই ভিল্‌হেল্‌ম্ এখানকার একজন হয়ে পড়লো। অসুস্থ অবস্থায় লোথারিওকে কিছু কিছু পড়ে শোনাবার ভার সে নিলে। এই রোগশয্যায় লোথারিও একদিন ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে তার সম্পত্তি সম্বন্ধে তার পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সমাধা করে ফেলতে। জার্ণো বল্লে আরোগ্যলাভের পরে সেসব হবে। লোথারিও বল্লে: দীর্ঘ ভাবনা ত্যাগ করে যখন যা করবার তা করে ফেলাই সঙ্গত, শিক্ষিত সমাজের দোষ এই যে তারা ভাবের পেছনে ছোটে, উপস্থিত ক্ষেত্রে ও উপস্থিত কালে (Here and Now) কি করতে হবে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই, বিচার বিবেচনা এসবের প্রভাবও তাদের জীবনে কম। লোথারিও তার ভগিনীপতি কাউণ্টের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলে—সে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করতে যাচ্ছে হের্ণহুট সম্প্রদায়ের পারলৌকিক কল্যাণের আশায়। জার্ণোর মুখে ভিল্‌হেল্‌ম্ শুনলে এ হচ্ছে সেই কাউণ্ট যার গৃহে মেলিনার দলসহ সে গিয়েছিল, এর পত্নী তার সুপরিচিতা। তার স্মরণ হলো এই কাউণ্ট পত্নীর বান্ধবী ব্যারণ-পত্নী একদিন কাউণ্টের অনুপস্থিতি কালে তাকে ডেকে নিয়ে কাউণ্টের কামরায় বসিয়ে কাউণ্টের পোষাক পরিয়ে দেয়—উদ্দেশ্য কাউণ্ট-পত্নীর সঙ্গে চাতুরী খেলা। কিন্তু হঠাৎ এসে পড়ে কাউণ্ট; কামরায় ঢুকে নিজের মতো আর একজনকে বসে' দেখে কাউণ্ট কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও তার পর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। তার পর থেকে মৃত্যু ও পরলোক-চিন্তা তাতে প্রবল হয়, তার ধারণা হয় সে তার প্রেতাত্মা দেখতে পেয়েছে। ভিল্‌হেল্‌ম্ জানতে পেলে কাউণ্ট-পত্নীও স্বামীর সঙ্গে ধর্ম ও ত্যাগের জীবন গ্রহণ করেছে। এই পরিবারের এমন দুর্গতির সঙ্গে তার সংস্রব রয়েছে দেখে ভিল্‌হেল্‌ম্ গভীর মানসিক যাতনা ভোগ করলে, লোথারিওকে ভৎর্সনা করবার ইচ্ছা তার প্রশমিত হলো।—জার্ণোকে সে জানালে সে থিয়েটারের দল ছেড়ে দিয়েছে কেননা ওদের কিছু হবার আশা নেই। অভিনেতাদের প্রতি ভিল্‌হেল্‌মের এমন বিরূপতায় জার্ণো আমোদ বোধ করলে, বল্লে, অভিনেতাদের সম্বন্ধে তার যে অভিযোগ তা ব্যাপক ভাবে মানুষ সম্বন্ধেও খাটে, অভিনেতাদের দোষ সে বরং কমই দেখে কেননা তাদের কাজ হচ্ছে প্রদর্শন ও মনোরঞ্জন।—লোথারিওর চিকিৎসার ভার যে ডাক্তার নিয়েছিল তারই হাতে ছিল সারেঙ্গীর চিকিৎসার ভার। ভিল্‌হেল্‌ম্ জানলে সারেঙ্গীর অবস্থা অতি ধীরে উন্নতির দিকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে; সেই সারেঙ্গীর কথা থেকে ডাক্তারের ধারণা হয়েছে তার মস্তিষ্কবিকৃতির মূলে পাপবোধ,—হয়ত বিবাহ-অযোগ্যা নিকট-আত্মীয়ার সঙ্গে সংস্রব। লোথারিওর দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য ডাক্তার লিডিয়াকে দূরে সরিয়ে দেবার প্রয়োজনের কথা বলে। জার্ণো তাকে কৌশলে সরিয়ে দিতে চায় মহীয়সী থেরেসার আশ্রয়ে। লিডিয়াকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার ভার পড়ে ভিল্‌হেল্‌মের পরে, লোথারিওর জীবনের মূল্যের কথা ভেবে ভিল্‌হেল্‌ম্ রাজি হয়; সে বলছে:

> বন্ধুর জন্য জীবন বিপন্ন করতে হবে এইই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হলে তার উপকারে নিজের মত-বিশ্বাসও বলি দিতে হবে। আমাদের সব চাইতে প্রিয় বাসনা প্রিয় খেয়াল বন্ধুর উপকারে বলি না দিয়ে আমাদের উপায় নেই।*

লিডিয়াকে নিয়ে যাবার ব্যপদেশে থেরেসার সঙ্গে ভিলহেলমের পরিচয় হলো। থেরেসা যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেমনি চরিত্রবলসম্পন্না, তার কর্মশক্তিও অসাধারণ। লোথারিওর সম্বন্ধে তাদের কথা হলো। ভিলহেলম লোথারিও, জার্নো ও পুরোহিতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে, বল্লে, সমঝদারদের সঙ্গে আলাপ করার কি সুখ তা সে প্রথম অনুভব করেছে তাদের সাহচর্যে, তাদের সঙ্গে আলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা তার মনে ছিল অস্পষ্ট। থেরেসা যে শুধু নিজের সম্পত্তি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করে তাই নয়, আশেপাশের অনেকে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তার উপদেশ-প্রার্থী হয়। লোথারিওর সঙ্গে তার বিবাহের কথা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয় না; সে-কাহিনী ভিলহেলম তার মুখে শোনে। থেরেসার পিতা ছিল ধীর স্থির মাতা ছিল আমোদ ও আলাপপ্রিয়। স্ত্রীর অপব্যয় ও খেয়ালীপনা তার পিতা নীরবে সহ্য করে। থেরেসা তার মাতার প্রকৃতি পায়নি, মাতা তার উপরে কোনোদিন সন্তুষ্ট ছিল না। শেষে তার মাতা দেশভ্রমণে বহির্গত হয়। পিতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় ও কিছুদিন পরে মারা যায়। থেরেসা একজন সম্পন্না প্রতিবেশিনীর সাহায্য পায়। তার সামান্য আয় দিয়েই যত্ন করে' সে নিজের অবস্থা সচ্ছল করে' তোলে। লিডিয়া ও সে একই সময়ে লোথারিওর সঙ্গে পরিচিত হয়। লিডিয়া সুন্দরী—লাবণ্যবতী। থেরেসা বলছে : পুরুষের বুদ্ধি চায় কর্মকুশলাকে কিন্তু হৃদয় চায় লাবণ্যবতীকে। কিন্তু একদিন নারী সম্বন্ধে লোথারিওর উক্তি শুনে সে খুশী হয়, সে বলছিল :

> ...পুরুষ বাইরের জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করে' চলেছে, সে-সংগ্রামে হারই হয় তার বেশী, জয় ও কর্তৃত্বলাভ কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু নারী এই ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে সহজে মুক্ত হয়ে পেয়েছে পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্ব। মানুষের সব চাইতে আনন্দ কিসে? যা সঙ্গত ও কল্যাণকর তার সাধনায়। সেই সুযোগ নারীর ভাগ্যে ঘটেছে; এই সুযোগ যে-নারী সত্যকার ভাবে উপলব্ধি করে, তার স্বামীর অন্তরেও সে সঞ্চারিত করতে পারে এই জয় ও কর্তৃত্বের ভাব।....

থেরেসাকে বিয়ে করতেই লোথারিও ইচ্ছা জ্ঞাপন করে—বিবাহ ঠিক হয়। এমন সময়ে একদিন লোথারিওর চোখে পড়ে থেরেসার মায়ের ছবি; তার মা যখন সুইটজার-ল্যাণ্ডে তখন তার সঙ্গে লোথারিওর পরিচয় হয়—লোথারিওর প্রতি সে অনুপণ হয়েছিল। গভীর দুঃখে লোথারিও এই বিবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। তারপর

দিডিয়া তাকে লাভ করতে ব্যাকুল হয়েছে।—থেরেসার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ভিলহেল্‌ম্ দেখলে। ধর্ম-সাহিত্য সম্বন্ধে থেরেসা বল্লে :

> আমি ত' বুঝতে পারি না মানুষ কেমন ক'রে বিশ্বাস করতে পেরেছে যে ভগবান পুঁথি ও গল্পের ভিতর দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন ; বিশ্বজগৎ যার কাছে ব্যক্ত হয়নি সহজভাবে, এর সঙ্গে যার যোগ স্থাপিত হয়নি, যে নিজে বোঝে না কি কথা তার মনে খেলে, অপরের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, সে যে বই থেকে কিছু শিখতে পারবে তা সুদূরপরাহত, বই ত সাধারণত আমাদের ভুলের বর্ণনা।

থেরেসার ওখানে ক'দিন কাটিয়ে লোথারিওর গৃহে ফিরে' ভিলহেল্‌ম্ দেখলে লোথারিও অনেকটা সুস্থ হয়েছে। তার কিছু কিছু প্রণয়-কাহিনী সে সবাইকে বল্লে। তার প্রকৃতির সবলতায় ও ঋজুতায় ভিলহেল্‌ম্ একান্ত মুগ্ধ হলো, বুঝলে, লোথারিওর মতো ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের দিকে বহু নারীর আকৃষ্ট হওয়া কত স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গেই লোথারিও বল্লে : থেরেসার সঙ্গে বিয়ে হলেই সে সুখী হতো, কেননা থেরেসাতে সে পেতো জীবনসঙ্গিনী—সুখস্বর্গ নয় সুনিশ্চিত মর্ত্য-জীবন—সম্পদে শৃঙ্খলা, বিপদে বীর্য, তুচ্ছতমের জন্য যত্ন আর উচ্চতমের উপলব্ধি ও উদ্‌যাপনের যোগ্যতা। থেরেসার জন্য সে আউরেলিয়াকে ত্যাগ করে সে কথাও সে বল্লে ; আউরেলিয়ার প্রতি তার বন্ধুভাবকে সে যে পর্যবসিত হতে দিয়েছিল প্রেমের ভাবে—যে-ভাব ধারণ করবার যোগ্যতা আউরেলিয়ার ছিল না—এই ভুলের জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করলে। আউরেলিয়ার পুত্রকে অর্থাৎ লোথারিও ও আউরেলিয়ার পুত্র ফেলিক্‌সকে এখন লোথারিওর গ্রহণ করা উচিত ভিল্‌হেল্‌মের এই কথায় লোথারিও এই পিতৃত্ব অস্বীকার করে। জার্ণোর কাছে ভিল্‌হেল্‌ম্ জানতে পারে ফেলিক্‌স্ আউরেলিয়ার পালিত পুত্র। এই প্রসঙ্গে জার্ণো ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে রঙ্গ-মঞ্চ ত্যাগ করতে বলে কেননা অভিনয়ে তার সত্যকার প্রতিভা নেই। জার্ণোর এই মন্তব্যে ভিল্‌হেল্‌ম্ স্তম্ভিত হয়, কিন্তু রাজি হয় জার্ণোর প্রতি শ্রদ্ধার প্রভাবে। সে ফিরে যায় ফেলিক্‌স্ ও মিগ্‌ননকে আনতে,—উদ্দেশ্য, এদের থেরেসার তত্ত্বাবধানে রাখবে। কিন্তু গিয়ে দেখা পায় বৃদ্ধা বারবারার—তার মুখে মারিয়ানার মৃত্যু-সংবাদ শোনে। বারবারা বিস্তারিত ভাবে বলে কেমন করে' তার (বারবারার) প্ররোচনায় নোরবের্গের সাহচর্য মারিয়ানা স্বীকার করে কিন্তু অল্প কিছু কাল পরেই ভিল্‌হেল্‌মের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তারপর বারবারার শত চেষ্টায়ও সে ভিল্‌হেল্‌মের প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়নি। ভিল্‌হেল্‌ম্ অত্যন্ত ব্যথিত হয় কিন্তু বারবারার প্রকৃতি জেনে তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিতও হয়। এই ঘৃণিত জীবনের জন্য সে বারবারাকে ধিক্কার দেয় ; বারবারা উত্তর দেয় : ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা জানে না অভাব কি তাই সম্মান সত্যরক্ষা এসব কথা তারা বলতে পারে সহজে।—

ঠিক হয় ফেলিক্‌স্‌কে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ নিজের সঙ্গে রাখবে, মিগ্‌ননকে রাখবে থেরেসার কাছে। মিগ্‌নন রাজি হয় না, সে বরং তার প্রভুর সঙ্গেই থাকতে চায়, বলে, শিক্ষার তার দরকার নেই, আর তাকে যদি যেতেই হয়—তবে সে যেতে চায় সারেজীর কাছে, ফেলিক্‌স্‌কেও সে সঙ্গে চায়। শেষে ফেলিক্‌স্‌ ও মিগ্‌ননকে সঙ্গে নিয়ে বারবারা থেরেসার বাড়ীতে যায়। এখানকার থিয়েটারের দল ও শ্রোতারা ভিল্‌হেল্‌মের প্রতি সমাদর দেখায়, কিন্তু ভিল্‌হেল্‌ম্‌ বুঝতে পারে তাকে বাদ দিয়ে এখানে বেশ চলে যাচ্ছে, তার পুরাতন আশ্রয় ত্যাগ করার দিনই এসেছে। এই অবস্থায় সে ভাবলে ভের্ণেরকে সে লিখবে সে রঙ্গ-মঞ্চ ত্যাগ করেছে সে বরং চায় দশজনের সংসর্গ আর সুনিশ্চিত জীবন ধারণ। সে জানতে চাইলে তার সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা। সে দেখলে আত্মোৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে তার সাংসারিক অবস্থার কথা কিছুই সে ভাবে নি—যারা আত্মোৎকর্ষকে বেশী মূল্যবান জ্ঞান করে তাদের সবারই যে এই দশা হয় তা সে জানতো না। এই সে প্রথম বুঝলো এ ক্ষেত্রেও সচ্ছল অবস্থার একান্ত প্রয়োজন।—লোথারিওর গৃহে ফিরে সে দেখলে কাকার মৃত্যুর পরে লোথারিও নতুন সম্পত্তি পেয়েছে ও আরো সম্পত্তি কিনতে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে একজন দূরবর্তী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাদের কথাবার্তা চলছে। সেও কিছু সম্পত্তি কিনবার সংকল্প করলে।—একদিন জার্ণো তাকে বল্লে, তাকে গোপন কিছু জানাবার প্রয়োজন হয়েছে। পরদিন সে এই বাড়ীর এক গোপন কক্ষে ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে প্রবেশ করিয়ে দিলে। সেখানে এক অশরীরীর আদেশে উপাসনা-গৃহের মতো এক কক্ষে গিয়ে সে বসলো। সেখানে একজন এসে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তার পিতামহের সংগৃহীত শিল্প-সামগ্রীর কথা, অর্থাৎ ভিল্‌হেল্‌মের শিল্প-প্রবণতার কথা; বল্লে, ভাগ্যের নির্দেশ আর আকস্মিকতা একই ব্যাপার। আর এক জন এসে বল্লে: ভুল থেকে রক্ষা করা গুরুর কাজ নয়, তাঁর কাজ ভুলে রত শিষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; বরং তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞতা শিষ্যকে ভুলের মদিরা পূর্ণ মাত্রায় পান করতে দেওয়ায়; যে ভুলের অল্প স্বাদ জানে তার দীর্ঘদিন মুগ্ধ হয়ে কাটে ভুলে, কিন্তু যে পূরো মাত্রায় ভুল করেছে তার মাথা ঠিক থাকলে সে শীগ্‌গীরই পথ পাবে। আর এক জন বল্লে—কাদের উপরে ভরসা করা যাবে তা বুঝতে শেখো। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ বিস্মিত হলো, ভাবলে তার এত হিতৈষী থাকতে তার জীবন আশানুরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় নি কেন;—কেন তাঁরা তাকে তুচ্ছতায় রত থাকতে দিয়েছেন! অশরীরী কণ্ঠে উত্তর এলো: আমাদের সঙ্গে তর্ক করো না; তুমি উদ্ধার পেয়েছ, লক্ষ্যের পথে দাঁড়িয়েছ, যেসব ভুল ভ্রান্তি তোমার হয়েছে তার জন্য অনুশোচনার প্রয়োজন নেই, সেসবের পুনরাবৃত্তি আর হবে না—এর চাইতে বড় ভাগ্য মানুষের আর হতে পারে না।—এর পর ভিল্‌হেল্‌ম্‌ যেন শুনলে তার পিতার কণ্ঠ, জীবনের পথে ভিল্‌হেল্‌মের অগ্রগতিতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন, বল্লেন, চড়াইয়ের পথে ঘুরে

ফিরে ভিন্ন ওঠা যায় না, সমতলে সোজা পথ সম্ভব। শেষে লোথারিওর গৃহের পুরোহিত ভিল্‌হেল্‌কে এক লিপি পড়তে দিলে—গ্যেটের উক্তি হিসাবে এটি প্রসিদ্ধ :

শিল্পের পথ দীর্ঘ, আয়ু স্বল্প ; সিদ্ধান্ত সুকঠিন, সুযোগ ক্ষণস্থায়ী। কাজ করা সহজ, চিন্তা করা কষ্টসাধ্য ; চিন্তানুযায়ী কাজ করা ধৈর্যসাপেক্ষ। প্রত্যেক সূচনাই আনন্দকর ; দ্বারদেশ আশার স্থান। বালক দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিহ্বল চোখে, তার গতি যা তার ভাল লাগে সেই দিকে ; হাসতে খেলতে সে শেখে, গাম্ভীর্য তাতে আসে অকস্মাৎ। অনুকরণ প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত, কিন্তু কি অনুকরণ করতে হবে তা খুঁজে পাওয়া সোজা নয়। যা শ্রেষ্ঠ তা কদাচিৎ মেলে, তার মর্যাদা লোকে বোঝে আরো কম। শিখর আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু তাতে উঠ্‌বার পথ নয় ; শিখরের দিকে তাকিয়ে আমরা ভালবাসি নীচে চলাফেরা করতে। শিল্পের অতি অল্প অংশই শেখানো যায়; কিন্তু শিল্পীকে জানতে হয় সবটা। যে অর্ধেক জানে সে বকে বেশী আর ভুল করে সব সময়ে ; যে পূরো জানে সে বরং কাজ করতে ভালবাসে, কথা বলে কদাচিৎ, অথবা দেরীতে। এই বকিয়েদের গোপন সম্পদ কিছু নেই, শক্তিও নেই। তাদের উপদেশ সেঁকা রুটির মতো, সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর দিনেকের জন্য ; কিন্তু ময়দা বোনা যায় না আর বীজও পিষতে নেই। কথা ভালো, কিন্তু সব চাইতে ভালো নয়। যা সব চাইতে ভাল কথায় তার ব্যাখ্যা হয় না। আমাদের কাজের মূলে কোন্ মনোভাব রয়েছে সেইটিই সব চাইতে বড় কথা। পেছনে কি ভাব রয়েছে তার দ্বারাই কোনো কাজের অর্থ বোঝা যায়, তার পুনরাবৃত্তিও সম্ভবপর হয়। যখন ঠিক কাজ করা হয় তখন বোঝা যায় না কি করা হচ্ছে, কিন্তু ভুল করলে সব সময়ই সে বিষয়ে চেতনা হয়। যে শুধু প্রতীক নিয়ে ব্যস্ত সে পণ্ডিতম্মন্য, ভণ্ড, অপকর্মা। এমন অনেকে আছে, তারা ভালবাসে দল বেঁধে থাকতে। তাদের প্রলাপে সত্যকার পণ্ডিতের সময় নষ্ট হয় ; তাদের একগুঁয়ে সাধারণতা শ্রেষ্ঠদেরও বিরক্তির উদ্রেক করে। সত্যকার শিল্পীর উপদেশে আমাদের চিত্ত উন্মুক্ত হয়, তার কথা যেখানে প্রকাশ করতে অক্ষম তার কাজ সেখানে কথা বলে। প্রকৃত বিদ্বান জ্ঞাত থেকে বোঝেন অজ্ঞাতের সন্ধান আর ধীরে ধীরে অধিকার করেন গুরুর আসন।

যাজক এর বেশী ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে আপাতত জানাতে অসম্মত হলো। আগাগোড়া

ব্যাপারটা ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে বিস্ময়ে অভিভূত করলো। তাকে আরো দেখানো হলো জার্ণো লোথারিও এদের শিক্ষানবিশীর খাতা। এই বিজ্ঞের কথা থেকেই সে জানলে ফেলিকস্‌ তারই সন্তান, মারিয়ানা তার অযোগ্যা ছিল না। শেষে যাজক তাকে বল্লে, তার শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছে, প্রকৃতির বিধানে সে এখন মুক্ত।

অষ্টম খণ্ডে সেই সম্পত্তির অংশ ক্রয় সম্পর্কে ভের্ণের লোথারিওর গৃহে এসেছে; সে-ই সেই ব্যবসায়ী যার সঙ্গে এদের কথা হচ্ছিল। ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে দেখে সে মহা খুশী হলো, বল্লে, ভিল্‌হেল্‌ম্‌ দেখতে চমৎকার হয়েছে। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ দেখলে ভের্ণেরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়েছে কিন্তু সৌন্দর্য বরং কমে গেছে। (অর্থলিপ্সু কিন্তু স্নেহপ্রবণ ভের্ণেরের ব্যক্তিত্ব বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।) এই সম্পত্তির এক অংশ ভিল্‌হেল্‌ম্‌ও কিন্‌লে, বিশেষ করে' এই জন্য যে এর বাগান ও বাড়ীর পরিবেষ্টনে ফেলিক্‌স্‌ বেড়ে উঠ্‌তে পারবে। ফেলিক্‌স-এর কৌতূহলের অন্ত নেই। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভিলহেল্‌ম্‌ বুঝলো সে জগৎ সম্বন্ধে কত কম জানে, কত বেশী তার জানা দরকার। ফেলিক্‌স্‌কে পেয়েই তার মনে হলো এ সংসারে সে দুদিনের বাসিন্দা হয়ে আসেনি, তার এই পুত্রের জন্য তাকে সব কিছু এমন ভাবে করতে হবে যেন তা ক্ষণভঙ্গুর না হয়। প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে মানুষকে যেভাবে গড়ে' তোলে সে সম্বন্ধে সে বলছে :

> হায় নীতির কড়াকড়ির বিড়ম্বনা! প্রকৃতি স্বয়ং করুণা করে' শেখাচ্ছে আমাদের যা কিছু শিখবার আছে সব। হায় সমাজের দাবির বিড়ম্বনা! প্রথমে তাতে আমরা হই দিশাহারা, চলি বিপথে, তারপর আমাদের কাছে দাবি করা হয় প্রকৃতির যা দাবি তার চাইতে অনেক বেশী! বৃথা সেই সব উৎকর্ষ-চেষ্টা যাতে সত্যকার উৎকর্ষ হয় নষ্ট—দৃষ্টি সেসবের কেবল চরম লক্ষ্যের পানে, যাত্রাপথের আনন্দের দিকে নয়। †

এই ফেলিক্‌স-এর চিন্তা থেকেই তার মনে হলো থেরেসার মতো রমণী যদি তার মাতৃস্থানীয়া হতো তবে তা কত সুখের হতো। সে যথেষ্ট ভাবলো। তার পর থেরেসাকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখলে—তাতে সে তার জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করলে আর থেরেসার পাণি প্রার্থনা করলে যদি তার করুণা হয়।—সম্পত্তি কেনা শেষ হলো। সম্পত্তি সম্বন্ধে লোথারিওর উক্তি এই :

> যোগ্য পিতা খাবার টেবিলে সন্তানকে আগে খাবার পরিবেশন করে, তেম্‌নি সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাগরিক যে রাষ্ট্রের প্রাপ্য সর্বাগ্রে পরিশোধ করে।

সম্পত্তিশালী হবার আকাঙ্ক্ষা তার মতে নিন্দনীয়।—লোথারিও ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে জানায় তার ভগিনী ভিল্‌হেলম্‌কে দেখা করতে বলেছে বিশেষ কাজে। এ'কে সেই

† গ্যেটের প্রকৃতি-বাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ-বাদ তুলনীয়।

কাউণ্ট-পত্নী ভেবে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ অন্তরে অশেষ উদ্বেগ অনুভব করে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে লোথারিওর আরো ভগিনী আছে। সে গিয়ে দেখলে এ সেই কাউণ্ট-পত্নী নয়, যে বীরাঙ্গনা তাকে দস্যুহস্ত থেকে উদ্ধার করেছিল তার সঙ্গে এর চেহারার মিল রয়েছে। এর নাম নাটালিয়া। এর এখানেই মিগনন এখন ছিল। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ জানলে মিগনন খুব অসুস্থ, তার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ডাক্তার মিগনন সম্বন্ধে এই গোপন সংবাদ ভিল্‌হেলমকে দিলে যে তার অসুখের মূলে তার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা, সেই সব আকাঙ্ক্ষার একটি হচ্ছে ইতালিতে ফিরে যাওয়া, অপরটি তার প্রভুর একান্ত সান্নিধ্য লাভ—যেমন নিষ্কলুষ তেম্‌নি প্রবল তার এই আকাঙ্ক্ষা, চঞ্চলা ফিলিনার ভাবভঙ্গি থেকে এর সঞ্চার হয় তার মনে। প্রভুর এমন সান্নিধ্য লাভ করতে সে যে দুই এক রাত্রি চেষ্টাও করেছে সেকথাও ডাক্তার জেনেছিল।—এতদিন মিগনন বালকের পোষাক পরতো। এই ছিল তার খেয়াল। সম্প্রতি এক খেলায় সে পরী সেজেছিল, সেই থেকে মেয়ের পোষাক সে পরছে, আর সব সময়ে সে পরী সেজে থাকতে ভালবাসে। এ সম্বন্ধে তার গানের কয়েকটি কলি এই :

আমাকে দেখাচ্ছে যেমন তেম্‌নি থাকতে দাও যে পর্যন্ত না আমি তেম্‌নি হই ;
আমার তুষারশুভ্র পরিচ্ছদ খুলে নিও না।
এই ধূসর ধরণী থেকে শীগগিরই আমি বিদায় নেব
আলোকের দেশের উদ্দেশে।

প্রভাতের শান্ত প্রোজ্জ্বল আলোক-সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করে না
কে বালক কে বালিকা ;
কোনো সাজ কোনো পোষাক সেখানে পরতে হয় না,
আমাদের দেহ সেখানে নির্মুক্ত পাপের সংস্রব থেকে।

দীর্ঘ জীবন আমাকে বহন করতে হয় নি,
কিন্তু বেদনায় এই চিত্ত ব্যথিত হয়েছে দীর্ঘ দিন,
ব্যথায় আমার জীবন-পুষ্প ঝরে' গেল অকালে ;
পুনর্বার দাও আমাকে চির-তারুণ্য।

যে সুন্দর-আত্মার কথা এর পূর্বে বলা হয়েছে সে নাটালিয়ার পিসি। এই পরিবারের পুরুষপরম্পরাগত মাহাত্ম্যে ভিল্‌হেলম্‌ মুগ্ধ হলো। যে ফ্রীডরিখের সঙ্গে বহু দিন পূর্বে তার পরিচয় হয়েছিল জানা গেল সেও এই পরিবারের, সে নাটালিয়ার ভাই। কিছুদিন পরে সেও একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো। জানা গেল সে আর ফিলিনা এখন স্বামী-স্ত্রী রূপে জীবন অতিবাহিত করছে—ফিলিনার সন্তানসম্ভাবনা। চঞ্চলা

ফিলিনার এই দশা তারা সবাই খুব উপভোগ করলে। ফ্রীডরিখের চাঞ্চল্য একটুও কমে নি, কিন্তু প্রাচীন মহাজনদের কিছু কিছু লেখা পড়ে সে বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। নাটালিয়ার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এরা সবাই সচেতন। লোথারিও তাকে জানে তার পিসি সুন্দর-আত্মার চাইতেও মহীয়সী। থেরেসা নাটালিয়ার সংস্পর্শে এসেই বুঝতে পারে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও বিবেচনার চাইতেও মহত্তর মর্যাদা লাভ জীবনে সম্ভবপর, কেননা থেরেসা মানুষকে গ্রহণ করে যে-মানুষ যেমন তাকে সেই ভাবেই কিন্তু নাটালিয়ার মতে এটি অন্যায়: মানুষের সঙ্গে বরং ব্যবহার করতে হবে যা হবার সম্ভাবনা তার আছে সেদিকে দৃষ্টি রেখে। তার মতে: শুধু প্রকৃতির উপরে নির্ভর করলে মানুষের চলে না, তার হাওয়া চাই নিয়মের অনুবর্তী; স্বভাব বা শিল্পের সৌন্দর্যের দিকে নাটালিয়ার তত দৃষ্টি নয় যত দৃষ্টি মানুষের অসম্পূর্ণতা ও অভাব-অভিযোগের দিকে, এ বিষয়ে সে অতন্দ্রিতচিত্ত।—নাটালিয়ার এই সহৃদয়তা থেরেসা ভিল্‌হেল্‌মের ভুলে-ভরা জীবনের মধ্যেও দেখেছে তাই তাকে সে স্বামিত্বে বরণ করতে ইচ্ছুক, এই কথা সে জানিয়েছে। এই সংবাদ ভিল্‌হেল্‌ম্ আনন্দে উৎফুল্ল হলো কিন্তু বিস্ময়ে সে দেখলে তার অন্তরের তলদেশে নাটালিয়াকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে চাচ্ছে। এই সময়ে জার্ণো একদিন এসে জানালে থেরেসার মা বলে' যে পরিচিত সে তার যথার্থ মা নয়, তার মা তাদের পরিবারের গৃহরক্ষিণী। ডাক্তারের উপদেশে একসময়ে থেরেসার পিতাকে দীর্ঘকাল তার পত্নী থেকে পৃথক থাকতে হয়েছিল, সেই সময়ে তাদের গৃহরক্ষিণীর গর্ভে থেরেসার জন্ম হয় কিন্তু রটনা করা হয় যে থেরেসা তার পত্নীর গর্ভজাত,—সুতরাং থেরেসার সঙ্গে লোথারিওর বিবাহ সম্ভবপর। এই সংবাদে ভিল্‌হেল্‌ম্ অন্তরে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লো কেননা সে থেরেসা ও লোথারিওর পরস্পরের প্রতি অনুরাগের কথা জানতো। কিন্তু থেরেসা জানালে ভিল্‌হেল্‌ম্‌কেই সে স্বামিরূপে গ্রহণ করবে। থেরেসা নাটালিয়ার বাড়ী এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখবার জন্য ফেলিক্‌স্ ও মিগনন দৌড়ে এলো। ভিল্‌হেল্‌ম্ ও থেরেসাকে আলিঙ্গনবদ্ধ দেখে মিগনন বুকে হাত দিয়ে চীৎকার করে' নাটালিয়ার পায়ের কাছে পড়ে গেল। দেখা গেল তার দেহে প্রাণ নেই। ভিল্‌হেল্‌ম্ একান্ত ব্যথিত হলো। মিগননের দেহ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার জীবন্তের মতো করে' রক্ষা করা হলো নাটালিয়ার কাকার বিখ্যাত শিল্পাগারে; সেখানে বাল্য যৌবন ও বার্ধক্যের বিচিত্র আনন্দ-মুহূর্ত শিল্পের সাহায্যে অক্ষয় হয়েছে।† এই কক্ষের দ্বারদেশে যে সৌম্য প্রস্তরমূর্তি আছে তার হাতের পুঁথির পাতে লেখা রয়েছে:

মনে রেখো বাঁচবার কথা (Remember to live)।

---

† Keats এর Ode to Grecian urn স্মরণীয়।

এই দারুণ উৎকণ্ঠার অবস্থায় একদিন ভিল্‌হেল্‌মের আলাপ হলো জার্ণোর সঙ্গে। সে বল্লে, তাকে গোপন কক্ষে বলা হয়েছিল তার শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছে, সে এখন মুক্ত, কিন্তু তারপর থেকে বিষম মানসিক অস্বস্তিই হয়েছে তার ভাগ্য। জার্ণো জানালে, যার সম্ভাবনা যত বেশী তার ক্ষমতার পরিণতি ঘটে তত দেরীতে; খুব কম লোকেই একই সঙ্গে চিন্তায় ও কর্মে দক্ষ হয়—চিন্তা বেশী এগিয়ে গিয়ে হয় খোঁড়া; কাজ উদ্দীপনা আনে কিন্তু হয়ে পড়ে সংকীর্ণপরিসর। তাকে সে আরো বল্লে যে দুই একটি ভূমিকায় ভাল অভিনয় করা ভিল্‌হেল্‌মের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু নাটকে নামতে হবে সব ভূমিকায়, তার প্রতিভার গতি সেদিকে নয়। জার্ণো শেষে তাকে বল্লে ব্যস্ত না হতে ও যাজকের উপদেশ গ্রহণ করতে। কিন্তু ভিল্‌হেল্‌মের স্থৈর্য লাভ হলো না।

এই সময়ে এল একজন সম্ভ্রান্ত ইতালীয় পর্যাটক—কথা হলো ভিল্‌হেল্‌ম্ হবে তার জার্মানী-ভ্রমণের দোভাষী। পর্যাটক মিগননের মূর্তি দেখে চিন্‌লে—সে তার হারিয়ে যাওয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী; তার জন্মের ইতিহাস এই: এই পর্যাটকের পিতামাতা বৃদ্ধ বয়সে এক কন্যা লাভ করে; এতে তারা খুব সঙ্কোচ বোধ করে ও গোপনে কন্যার লালনের ভার দেয় অন্য একজনের উপরে; এই কন্যা বড় হলে এর অনুরাগী হলো পর্যাটকের যাজকব্রতধারী মধ্যম ভ্রাতা—সে যে তার বোন একথা না জেনে; তাদের সন্তান এই মিগনন। মিগনন একদিন সমুদ্রের ধারে হারিয়ে যায়। সবাই ভাবে সে ডুবে গেছে। মিগননের বাপ-মাকে পৃথক রাখবার কড়া ব্যবস্থা হয়েছিল। মিগননের পিতা তার অনুরাগের বৈধতার সমর্থনে প্রথমে যথেষ্ট যুক্তি দেখায়, বলে, ভাই বোনে বিবাহ হয়েছে এমন জাতি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধধর্মী এটি নয়; কিন্তু মনে মনে তার অস্বস্তি বেড়েই যায়। শেষ পর্যন্ত মিগননের বাপ মা দু'জনেরই মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। মিগনন সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে ভেবে তার মা সমুদ্রের তীরে হাড়গোড় কুড়োতে আরম্ভ করে, ভাবে, একদিন দৈববলে এ সবের ভিতর থেকে মিগনন জীবন্ত হয়ে উঠ্‌বে। তার এমন প্রবল বিশ্বাস দেখে জনসাধারণ তাপসী জ্ঞানে তাকে ভক্তি করতে থাকে। সে মরে গেলে তার কবরের উপরে রীতিমতো শীরনি পড়া শুরু হয়। মিগননের পিতা একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেল, বহু খুঁজেও তাকে আর পাওয়া গেল না। পর্যাটকের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে সবাই বুঝলো বুড়ো সারেঙ্গীই তার পিতা। ফেলিক্‌স্‌কে সে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল তার কারণ সে যেন প্রায়ই দেখতো একটি ছেলে ছুরি নিয়ে তাকে মারতে আসছে।—একদিন হঠাৎ এই সারেঙ্গী স্বাভাবিক বেশে নাটালিয়ার গৃহে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে মনে হলো তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি আর নেই। তার এমন পরিবর্তনের কারণ, সে বিষের শিশি জোগাড় করে' সেই বিষ খেতে গিয়েছিল কিন্তু ভয়ে খেতে পারে নি—এই

ভয় তাকে ফিরিয়ে এনেছে জীবনের পথে। কিন্তু একদিন এই সারেঙ্গী ব্যাকুল হয়ে এসে বল্লে, সেই বিষ ফেলিক্স্ খেয়েছে। বিষম হুলুস্থূল পড়ে গেল। একটি পাত্রে সেই বিষ ঢালা ছিল, তার পাশেই ছিল দুধের বোতল, ফেলিক্স্ দুধ না খেয়ে সেই বিষ খেয়েছে। ফেলিক্স্ও বল্লে—হাঁ তাই। কিন্তু আসলে সে বিষ খায় নি। সে বাটিতে দুধ না খেয়ে খেতো বোতলে, সেজন্য আউরেলিয়া তাকে শাস্তি দিত, কিন্তু তাকে শোধরাতে পারে নি। শাস্তির ভয়ে সে এই মিথ্যা কথা বলেছে। তার কু-অভ্যাসই এক্ষেত্রে হয়েছিল তার রক্ষার হেতু। এই বাড়ীতে সে-সময়ে সেই কাউন্ট উপস্থিত ছিল। সে বালকের কামরায় ঢুকে তার গায়ে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে রইল। পরদিন যখন দেখা গেল ফেলিক্স্ সুস্থই আছে তখন সবাই বুঝলো সে বিষ খায় নি, কিন্তু কাউন্ট সেকথা অবিশ্বাস করলে; সে নিশ্চিতভাবে বুঝলে তার প্রার্থনার বলেই বালক রক্ষা পেয়েছে। হের্ণহুট সম্প্রদায়ে যোগদানের সংকল্প তার আরো প্রবল হলো। এদিকে দেখা গেল সেই সারেঙ্গী নিজের কণ্ঠনালী কেটে আত্মহত্যা করেছে।

গ্রন্থের শেষে ফ্রীডরিখের জ্ঞানবত্তা ও চঞ্চলতার পরিচয় রয়েছে। তার একান্ত ইচ্ছা নাটালিয়ার সঙ্গে ভিল্‌হেল্‌মের বিবাহ হয়। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। থেরেসার বিয়ে হলো লোথারিওর সঙ্গে আর জার্ণোর বিয়ে হলো লিডিয়ার সঙ্গে। এই শেষভাগেই ফ্রীডরিখ ভিল্‌হেল্‌ম্‌কে বলেছিল: তোমার অবস্থা দেখছি কিশ-এর পুত্র সৌল-এর মতো। বাপের গাধার খোঁজে বেরিয়ে সে পেয়ে গেল এক রাজ্য।—তার উত্তরে ভিল্‌হেল্‌ম্ বলে: সে রাজ্যের মূল্য বোঝে না, কিন্তু এমন আনন্দের অধিকারী হয়েছে যার যোগ্য সাধনা সে করেনি, সেই আনন্দের পরিবর্তে আর কিছুই সে চায় না।

ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টারের যে অসম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হলো তা থেকেও বোঝা যাবে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় গ্যেটে এই গ্রন্থে দিয়েছেন। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে এ যেন এক বিরাট মায়াপুরী—কত বিচিত্র ব্যক্তি ও ভাব যে এতে রূপলাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষের দুই খণ্ডে অবশ্য রূপাঙ্কনের চাইতে তত্ত্বচিন্তা প্রবলতর হয়েছে কিন্তু সেই চিন্তাও সাহিত্যিক-সৌন্দর্য-ভূষিত।

সেই দিনে এবং তার পরেও এর বিরুদ্ধে নীতিহীনতার অভিযোগ আনা হয়েছিল†। কিন্তু গ্যেটে এখানে যা বলতে চেয়েছেন প্রচলিত নীতিধর্মের চাইতে

† ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টারের প্রতিবাদে য়োহান ফ্রীডরিখ ভিল্‌হেল্‌ম্ পুসটুকুখেন নামে একজন প্রটেস্‌টান্ট পাদ্রী "ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইসটারের ভ্রমণ" নাম দিয়ে এক চার খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন; গ্যেটের "ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টারের ভ্রমণ"-এর বহু পূর্বে এটি প্রকাশিত হয়। এতে রয়েছে সেই

তা উচ্চতর মর্যাদায়। তাঁর খুব বড় উক্তি: মনে রেখো বাঁচবার কথা,—অর্থাৎ মানব-প্রকৃতির সার্থকতার দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন অতিবাহিত করবার কথা। তিনি মানুষের জন্য যে-সার্থকতা কাম্য জ্ঞান করেছেন তা বৈরাগ্য সাধনে নয়, কোনো সংকীর্ণ আদর্শের অনুসরণেও নয়, তা লাভ হতে পারে মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনে—এরই নাম সৌন্দর্যসাধন। এমন উৎকর্ষ-সমন্বিত ব্যক্তি প্রচার করে না, হুকুম করে না—তার সান্নিধ্য থেকেই সঞ্চারিত হয় অশেষ আশা ও আনন্দ। এর আর একটি বড় কথা এই যে জীবন তার গতিপথেই নিজেকে শোধরাতে শোধরাতে অগ্রসর হয়, এজন্য বাইরে থেকে চাপানো বিধিবিধানের প্রয়োজন তেমন নেই। অবশ্য এই প্রকৃতি-বাদের সঙ্গেই গ্যেটের চিন্তায় মিশেছে অতন্দ্রিত-কল্যাণ-বাদ। পরে পরে তার আরো বিবৃতি আমরা পাব।

দেখা যাচ্ছে গ্যেটে এখানে শিল্পকে প্রচারধর্মী করেছেন—তাঁর এই ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইসটার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এক মহা গ্রন্থ। কিন্তু সেই প্রচারের উদ্দেশ্যে এর শিল্পধর্ম অর্থাৎ রূপাঙ্কন ক্ষুণ্ণ করা হয়নি।—উপন্যাসের সাহায্যে জীবনাদর্শ প্রচারের এই প্রয়াস একালে সার্থকতা লাভ করে' চলেছে। ক্রোচের মতে এর একালের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রোমাঁ রোলাঁর "জন ক্রিস্‌টোফার"। ‡

রবার্টসন বলেন, গ্যেটের কাব্য ও নাটকের তুলনায় তাঁর উপন্যাস একালে অনেকটা মর্যাদাহীন হয়েছে। এই উক্তি আংশিক ভাবেই সত্য, কেননা তাঁর উপন্যাসে স্থানে স্থানে ভাবালুতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর যুগের প্রবল উচ্ছ্বাসপ্রবণতার প্রভাবে, গাঁথুনিও মাঝে মাঝে দুর্বল হয়েছে। কিন্তু এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও যে অন্তর্দৃষ্টি ও

দিনের 'ধর্মভীরু'রা গ্যেটের প্রতিভা ও সাহিত্যের প্রতি কি দৃষ্টিতে চাইতো তার পরিচয়। এতে গ্যেটের একজন ভক্ত পাঠককে দাঁড় করিয়ে তাকে লেখক বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্যেটের সাহিত্য হেন্ডের রুপ ব্‌টক ভীলাণ্ড প্রভৃতির তুলনায় অল্পমূল্য, গ্যেটে জড়বাদী, কোনো মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত নন, এবং এই সব কারণে তাঁর রচনা সর্বথা পরিত্যাজ্য।—গ্যেটের আর একজন খ্যাতনামা নিন্দুকের নাম ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ মেন্‌ৎসেল। এঁর লেখা খুব জোরালো কিন্তু অন্তঃসারশূন্য, এঁর মতে গ্যেটে সত্যকার প্রতিভারও অধিকারী নন, মানুষের চিত্ত তিনি জয় করতে পেরেছেন তাঁর বর্ণনা-কৌশলে। এঁর সম্বন্ধে লুইসের মন্তব্য উপভোগ্য:

…কেন্টের একজন জোয়ান চাষীকে যদি প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মন্দির সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে উক্ত মন্দিরের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সে যথেষ্ট জোরালো ভাষায় তার অভিমত ব্যক্ত করবে, কিন্তু তার সেই ভাষার বিক্রম পুষিয়ে নিতে পারবে না তার জ্ঞান অনুভূতি ও রুচির অভাব; মেন্‌ৎসেলের বিক্রমবতী ভাষায়ও তেমনি পুষিয়ে যায় নি তাঁর স্বভাব ও শিক্ষার ত্রুটি যার জন্য শিল্প-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি তাঁর সাধ্যাতীত।

‡ রোমাঁ রোলাঁ গ্যেটে-বেটোফেনের যুগের জার্মান ভাবধারায় যারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত আর একালের বাংলার ভাবধারার উপরে তাঁর কিছু প্রভাব পড়েছে।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর উপন্যাসে রয়েছে সেজন্যে আজো তা বহুমূল্য। তাঁর উপন্যাসের এই মর্যাদা সম্বন্ধে ক্রোচে সচেতন।

হেরমান ও ডোরোতেয়া

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে "হেরমান ও ডোরোতেয়া" কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। হোমরের ছন্দে এটি লেখা, সমালোচকেরা প্রচার করেছিলেন এতে জার্মান সাহিত্যের লাভ হয়েছে প্রাচীন গ্রীক কাব্য-সৌন্দর্যের গৌরব। হোমরের অনুসরণে "একিলিস" নামে আর একখানি কাব্য গ্যেটে আরম্ভ করছিলেন। কিন্তু তা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। ইতালিতে হোমর নূতন করে' গ্যেটের প্রিয় হন আমরা দেখেছি। তাঁর সেই হোমর-প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তাঁর শেষ বয়সের সাহিত্যের ক্লাসিক রীতি বা ক্লাসিক ঝোঁক বিখ্যাত। এ সম্বন্ধে লুইস মন্তব্য করেছেন :

> সাহিত্যে দার্শনিক প্রবণতা আর কোনো বিশেষ রীতির অনুকরণ দুইই অনিষ্টকর। এ দুয়ের ফল গ্যেটে ও শিলারের উপরে তেমন ক্ষতিকর হয়নি কেননা তাঁরা প্রতিভাবান, কিন্তু তাদের জাতির জন্য হয়েছিল বিভ্রান্তিকর। দার্শনিকতা কাব্যকে করেছিল বিকৃত আর সমালোচনার জন্য হয়েছিল অভিশাপের তুল্য; অনুকরণপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ সৃষ্টি করেছিল "রোমান্টিক"-মতবাদের মতো সুদর্শন ভুল।

একটি সরল প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এই "হেরমান ও ডোরোতেয়া" কাব্য রচিত, সেই প্রাচীন কাহিনীটিকে দাঁড় করানো হয়েছে ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকার উপরে। ঘটনার স্থান রাইন নদীর দক্ষিণ তীর, সময় গ্রীষ্মকাল। বিপ্লবের ফলে ঘরছাড়া নরনারী এই অঞ্চল দিয়ে দল বেঁধে চলেছে—বহু লোক এই দুঃস্থদের দেখতে যাচ্ছে। একজন বর্ধিষ্ণু কৃষক তার দাওয়ায় বসে' লোকদের এই দুর্দশার কথা ভেবে বিস্মিত ও দুঃখিত হচ্ছে, আর তার গৃহিণী যে ছেলের হাতে এদের জন্য কাপড় ও খাবার পাঠিয়েছে এ জন্য মনে মনে খুশী হচ্ছে। তার ছেলে হেরমান এখন বিবাহ-যোগ্য নবীন যুবক। কাব্যের প্রথম সর্গে এই সুখী গোষ্ঠীপতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে গ্রামের যাজক ও বৈদ্য। এই ঘরছাড়াদের দুরদৃষ্টের কথা উঠ্‌লো। মোড়ল ভাবছে তার ছেলে নিশ্চয়ই এই দুঃস্থদের নাগাল পেয়েছে ও তাদের যা দেবার তা দিয়ে দিয়েছে। তার ছেলের এখন বিয়ে দেওয়ার দরকার সে কথাও উঠ্‌লো। যেখানে তারা বসেছে সেখানে গরম লাগছে দেখে তারা ঘরের একটি ঠাণ্ডা কোণে গিয়ে বসলো ও তৃপ্তির সঙ্গে রাইন-মদ্য পান করে' চললো।—সবকিছুই অনাড়ম্বর, বর্ণনাও

অনাড়ম্বর, আর এই অনাড়ম্বর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে গ্রামের উন্মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ।

দ্বিতীয় সর্গে হেরমান ফিরে এসে দুঃস্থদের কথা বলছে। সে গিয়ে দেখলে দুঃস্থদের দলে এক গরুর গাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক প্রসূতিকে—সে পূর্বে অবস্থাপন্ন ছিল, সদ্যোজাত শিশু তার বুকে, এক তরুণী দক্ষতার সঙ্গে চালাচ্ছে সেই গাড়ী। এই প্রসূতির দুর্দশার কথা তরুণী হেরমানকে বল্লে ও তার কাছে কিছু কাপড় চাইলে। এই শান্তস্বভাবা বীর্যবতী তরুণীর সদয়তা দেখে' তার হাতেই হেরমান দিয়ে এসেছে যা কিছু নিয়ে গিয়েছিল—তার হাতে সে-সবের যে সদ্ব্যবহার হবে সে-সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিল।—এই তরুণীর প্রতি হেরমানের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে। তার প্রফুল্ল চোখ মুখ দেখে যাজক লক্ষ্য করছে তার ভাবান্তর। বৈদ্য বল্লে, এই দুঃখ-দুর্দশার সময়ে বোঝা যায় স্ত্রীপুত্র যার নেই সেই বরং আছে ভালো, তাকে এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। কিন্তু হেরমান তার প্রতিবাদ করে' বল্লে, বিপদের দিনেই বরং কুমারীরা বুঝতে পারে স্বামীর সাহায্যের তাদের কত প্রয়োজন আর পুরুষরা বুঝতে পারে পত্নীর মুখের সান্ত্বনা তাদের কত বড় সম্পদ। তার এই কথা শুনে তার পিতা খুশী হয়ে বল্লে, হেরমান বড় বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে। তার মাও খুশী হয়ে বল্লে, তার নিজের বিয়ে দুঃখের দিনেই হয়েছিল, তার স্বামীর কিছু ছিল না, তার পিতারও বাড়ী পুড়ে গিয়েছিল। তার পিতা বল্লে: হেরমানের মায়ের কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু বহু চেষ্টায় সে অবস্থাপন্ন হয়েছে, নিঃসম্বল হয়ে বিয়ে করা এখন সে ভয়ের চক্ষে দেখে, সে চায় হেরমানের বিয়ে হবে ধনী গৃহস্থের ঘরে। কিন্তু হেরমান এইসব ধনী গৃহস্থের উপরে চটা, তার কারণ কাছের থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম সে জানে না এই নিয়ে তারা তাকে বিদ্রূপ করেছে। তার পিতা রেগে গিয়ে বলছে: তার ত চাষা হয়ে থাকলেই চলবে না, একটু সভ্যভব্য হতে হবে; সে চাষার ঘরের মেয়েকে বউ করে' আনতে পারবে না, তার পুত্রবধূ এমন হবে যে সে পিয়ানো বাজাতে জানবে, সহরের সব সেরা সেরা লোক তাকে দেখতে আসবে। হেরমান নীরবে এখান থেকে উঠে গেল।

তৃতীয় সর্গে হেরমানের পিতা উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছে, বাপের চাইতে ছেলে যদি পদমর্যাদায় আরো বড় না হয় তবে পরিবার কেমন করে' উন্নত হবে, জাতিই বা কেমনকরে' বড় হবে। হেরমানের মা বলছে: ছেলে সম্বন্ধে তুমি কেবলই অন্যায় করছ, ফলে তোমার কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। ছেলেমেয়েরা যে আমরা যেমনটি চাই তেমনটি হবে এ আশা করা অন্যায়। ছেলেপিলে দিয়েছেন ভগবান, আমরা তাদের ভালবাসবো সাধ্যমতো ভাল' ভাবে মানুষ করবো, তার পর তারা যেমন হয় হবে। সবাইত একরকমের হয় না, পছন্দও সবার এক নয়। তুমি যে

হেরমানকে বকাঝকা করবে এ আমি সইতে পারবো না। সে আমার কত ভাল ছেলে। রোজ রোজ তার সঙ্গে খিটিমিটি করে' তুমি তাকে মরমরা করে' দিচ্ছ।—এই বলে' সে চলে গেল ছেলের খোঁজে। সে চলে গেলে মোড়ল হেসে বল্লে: মেয়েলোক এক অদ্ভুত জাত, ঠিক যেন ছেলেমানুষ; তাদের যা খুশী তারা সেই ভাবেই চলবে, কিন্তু প্রশংসা আদর এসবও তাদের চাই-ই। মোড়লের যে মত যে মানুষের পদমর্যাদা দিন দিন বেড়ে যাওয়া চাই বৈদ্য তা সমর্থন করলে আর বল্লে, সেও তার ঘরদোরের চেহারা আর একটু ভাল করবার কথা বহুবার ভেবেছে কিন্তু খরচ বেশী লাগে, সেই জন্য কিছু আর করে উঠ্‌তে পারে নি।—বৈদ্যের কৃপণতা ও সাবধানী প্রকৃতি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

চতুর্থ সর্গে হেরমানের মা হেরমানকে খুঁজে পেয়েছে। প্রথমে সে গেল অশ্বশালায় কিন্তু সেখানে হেরমান নেই। তারপর গেল বাগানে, সেখানে বাগানের তরিতরকারির উপর থেকে কিছু কিছু পোকা ছাড়িয়ে ফেলে সে গেল আঙুরলতার কেয়ারিতে। সেখানেও হেরমান নেই। খুঁজতে খুঁজতে সে তাকে পেলো এক নাসপাতি গাছের নীচে—চুপচাপ সে বসে আছে, তার চোখে জল। মাকে দেখে তার চমক ভাঙলো। সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেল্‌লো। মা জানার জন্য ব্যগ্র হলো কেন সে এমন একলা বসে' কেনই বা তার চোখে জল। হেরমান বল্লে, সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে সেও যাবে, দেশের জন্য তারও রক্ত দান করা চাই। তার মা বল্লে: তার ভাল ভাবেই জানা আছে যুদ্ধের বাজনায় মেতে ওঠার ছেলে হেরমান নয়, সৈন্যের সাজসজ্জা পরে' কুমারীদের হৃদয় জয় করবার খেয়ালও তার নেই, সে সৎ ও শক্তিমান, শান্ত মনে ক্ষেতের যত্ন আর পরিবারের পোষণের দিকেই তার নজর। তার সন্দেহ হচ্ছিল হয়ত যে মেয়েটিকে হেরমান দেখে এসেছে তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। শেষ পর্যন্ত হেরমান মাকে সব কথা বল্লে, বল্লে সে যুদ্ধে যাবে কেননা তার বাপ তার এ বিয়ে দেবে না—সে চায় বড়লোকের মেয়ে।—বহু বুঝিয়ে মা হেরমানকে নিয়ে এল।

পঞ্চম সর্গে গৃহিণী এসে মোড়লকে বলছে, হেরমানের বিয়ের কথা তারা কিছু কাল ধরে' ভাবছে, হেরমান যে-মেয়ে দেখে এসেছে তাকে বিয়ে করতে চায়, সেই বিয়েই দিতে হবে। মোড়ল গম্ভীর হয়ে রইল। যাজক বল্লে, হেরমানের মতো সৎ ছেলের যখন এই বিয়েতে এত আগ্রহ হয়েছে তখন বুঝতে হবে এই বিয়েই ভগবানের ইচ্ছা। বৈদ্য বল্লে, জেনে আসা যাক মেয়েটি কেমন, মেয়েটি ভাল হলে এই বিয়েই দেওয়া হবে। হেরমান তাদের গাড়ীতে করে' নিয়ে চললো ও শীগগিরই সেই প্রবাসীদের ধরে' ফেললো। সে পেছনে রইল, যাজক আর বৈদ্য গেল মেয়েটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে। মেয়েটি যে বাস্তবিকই ভাল যে সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে এল, মেয়েটির চেহারা দেখেও তারা খুশী হয়েছিল—অমন উন্নত দেহে যে-আত্মার

অধিবাস তা নিষ্পাপ হওয়াই স্বাভাবিক †। কিন্তু হেরমানের মনে স্বস্তি আসছিল না এই ভাবনায় যে মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে রাজী নাও হতে পারে—সে বয়স্থা কাজেই মন তার অন্য কোনোখানে বাঁধাও পড়ে থাকতে পারে।

এই মেয়েটি এর পূর্বে বাগ্‌দত্তা হয়েছিল, কিন্তু তার সেই প্রিয় পাণিপ্রার্থী বিপ্লবে মারা পড়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে হেরমান ধীরে ধীরে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে ও তাকে তাদের গৃহে আনছে। এই পরিচয়-লাভ চমৎকার: হেরমানের হৃদয়ে অনুরাগ গাঢ়তর হচ্ছে কিন্তু বাইরে সে মেয়েটির সঙ্গে ব্যবহার করছে সহজ সরল ভাবে। হেরমানের ব্যবহারে মেয়েটি তার প্রতি গভীর ভাবে শ্রদ্ধান্বিতা হচ্ছে, অনুরাগিণীও হচ্ছে। হেরমান তাকে বলেছে তার বাপ মা তাকে আপন মেয়ের মতো পেতে চায়; এর বেশী সে বলতে পারে নি। মেয়েটি বুঝেছে সে হেরমানদের বাড়ীতে যাচ্ছে চাকরি করতে। কিন্তু এসে সে যখন নিঃসন্দেহে জানলো তাকে এই গৃহের বধূ হতে হবে তখন সে আনন্দে অভিভূত হলো। হেরমান তাকে লাভ করে' নিজেকে ধন্য মনে করলে, সে বল্লে: তাকে পত্নীরূপে পেয়ে গৃহের শান্তি-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দে দেশের ও সভ্যতার শত্রুদের সম্মুখীন হতে পারবে।

এই কাব্যে গ্রাম্য পরিবেষ্টন অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে। চরিত্রাঙ্কনে গ্যেটে সিদ্ধহস্ত। এই কাব্যের প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন বিশিষ্ট তেম্‌নি জীবন্ত। তাঁর বর্ণনা আশ্চর্যভাবে অলঙ্কারবর্জিত, উপমা উৎপ্রেক্ষা তাঁর অবলম্বন নয় আদৌ। তাঁর লেখনী-মুখে সব-কিছু অনাবৃত হচ্ছে যেন দিনের আলোকে অপরিসীম বৈচিত্র্য নিয়ে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গ্যেটে চিরদিন মিশতেন, দয়াপরবশ হয়ে নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাদের তিনি ভাবতেন "ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ—সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সৌভাগ্যে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্তকষ্টসহিষ্ণুতা এই সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান।" গ্যেটের পুত্রবধূ লুইসের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে' যে অতবড় জ্ঞানী সামান্য লোকদের সঙ্গে যে কি করে' প্রাণভরে' আলাপ করতেন তা তাঁর ধারণার অতীত।—তাঁর এইসব অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এই কাব্য।

লুইস বলেছেন:

> স্বাধীনতা বলতে গ্যেটে রাজনৈতিক শাসন-প্রণালীর অদল-বদল বুঝতেন না, স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝতেন মানুষের স্বভাবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।... "হেরমান ও ডোরোতেয়া" কাব্যকে গ্রহণ করা যেতে পারে চিরন্তন পারিবারিক-জীবনের মহিমা-কীর্তন।

† এই ডোরোতেয়া-র উপরে বাকি পড়েছে লিলির ছায়া।

ফরাসী বিপ্লবের দাবির প্রতি গ্যেটের এই যে উত্তর আজকার জগতে আমরা বুঝতে পারি এটি অংশিকভাবে সত্য। পরিবার মানুষের জন্য যত সত্য রাষ্ট্র যে তার চাইতে একটুও কম সত্য নয় আজ আমরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আজ যে মানুষ ব্যক্তি ও পরিবারের দাবিকে উপেক্ষা করে' ঝুঁকতে চাচ্ছে রাষ্ট্রের দিকে সেখানে গ্যেটের 'হেরমান ও ডোরোতেয়া'কে জ্ঞান করা যেতে পারে তাঁর এক নীরব সতর্ক-বাণী। মানুষের অন্তরের সমৃদ্ধি ভিন্ন কোনো সমৃদ্ধিই যে তার জন্য সত্যকার সমৃদ্ধি নয় এ কথা ভোলা মানুষের জন্য বিপজ্জনক—রাষ্ট্রের, অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনের, দাবি সম্বন্ধে গ্যেটে যে কালে কালে আরো সচেতন হন পরে তা আমরা দেখ্‌বো।

লুইস এটিকে একটি পরমউপভোগ্য কাব্য বলেছেন, তবে এটা ক্লাসিক রীতির মহাকাব্য কিনা সে বিচারে অগ্রসর হন নি। ক্রোচেও এটিকে উপভোগ্য কাব্য বলেছেন, আর মন্তব্য করেছেন: এটি মোটের উপর প্রাচীন ছন্দ নিয়ে মহাকবির এক খেলা। ব্রাণ্ডেস ও রবার্টসন এই কাব্যে দেখেছেন গ্যেটের Type (প্রতীক) সৃষ্টির ঝোঁক মুখ্যতঃ ক্লাসিক আদর্শের বশীভূত হয়ে; তাঁদের বিচারে, 'হেরমান' 'ডোরোতেয়া' এই সব চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি তেমন নয় যেমন জার্মান তরুণ তরুণী। "শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৃষ্টি একই সঙ্গে বিশিষ্ট ও Typical (প্রতীকধর্মী)", কিন্তু বিশিষ্টের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে' গ্যেটে যে এই কাব্যে Type (প্রতীক) সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন লুইসের মতো আমরাও তা মেনে নিতে পারি নি। ক্রোচে এর যে মর্যাদা দিয়েছেন, আমাদের মনে হয়েছে, এর মর্যাদা তার চাইতে বেশী কেননা এর নায়ক-নায়িকারা তাদের অনাড়ম্বর জগতে যথেষ্ট প্রাণবন্ত—প্রমূর্ত। এটি যদি মহাকাব্যের, অর্থাৎ মহত্তর কাব্যের, মর্যাদা না পেয়ে থাকে তবে তার কারণ মনে হয় এর সংকীর্ণ আত্মসম্পূর্ণতা। রাষ্ট্রের, অর্থাৎ বৃহত্তর মানবসমাজের, দাবির প্রতি উদাসীন যে পারিবারিক জীবন তা দুর্বল ও নিরানন্দ না হতে পারে কিন্তু তা মহৎ পারিবারিক-জীবনও নয়।—অবশ্য ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা মনে তেমন স্থান না দিয়েও এটি পাঠ করা যেতে পারে, আর সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে এটিকে বলা যেতে পারে সরল ঋজু দুরাকাঙ্ক্ষাবর্জিত চিরন্তন-জন-জীবনের মহাকাব্য।—কারো কারো মতে এর শিল্পচাতুর্য তুলনাহীন যেহেতু তা বেমালুম।

হের্ডরের তিরোধান

হের্ডরের প্রতি তরুণ গ্যেটের নিবিড় শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। এই শ্রদ্ধা তাঁর অন্তর থেকে কখনো বিলুপ্ত হয়নি। "মানবসমাজের বিকাশের উপরে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব" সম্বন্ধে হের্ডরের বিখ্যাত গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন গ্যেটে ইতালিতে,—তিনি হের্ডরের এই সাহিত্যিক সাফল্যে উল্লসিত হন।—

হের্ডর কিন্তু তীব্র মন্তব্যে গ্যেটেকে বিদ্ধ করতে কোনোদিন ইতস্তত: করেন নি যদিও গোটের মনুষ্যত্ব ও ঔদার্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পল কেরাস বলেন, হের্ডরের প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা আর অকরুণতা গ্যেটেকে সাহায্য করেছিল তাঁর মেফিস্টোফিলিসের পরিকল্পনায়।

গ্যেটের চেষ্টায় হের্ডর অভিজাত-শ্রেণী-ভুক্ত হন। কিন্তু হের্ডর তাঁর পুত্রদের শিক্ষার জন্য যত বেশী রাজকীয় সাহায্য আশা করেছিলেন গ্যেটে সে-অনুপাতে তাঁকে খুশী করতে অক্ষম হন যদিও হের্ডর-পরিবারের প্রতি সহৃদয়তার অভাব তাঁতে কখনো দেখা দেয় নি। তাঁর এই অক্ষমতা হের্ডর-পরিবারের বিরক্তির কারণ হয়। হের্ডর জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর শেষ বয়সের বিরাট গ্রন্থে গ্যেটের প্রতিভাকে বিশেষিত করেন এই ভাবে :

সমবেদনাহীন, প্রত্যক্ষের নিপুণ বর্ণনশক্তি।

হের্ডরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে গ্যেটের "স্বভাবজ কন্যা" নামক নাটকখানি প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর একটি অপ্রধান রচনা। এই নাটকখানি কিন্তু হের্ডরের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। গ্যেটে বলেছেন, হের্ডরের বিশ্লেষণ শুনে তাঁর মনে হলো তিনি নিজেও যেন তাঁর এই সৃষ্টির মর্ম এমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু সহসা হের্ডর এই মন্তব্য করলেন :

তোমার স্বভাবজ পুত্রের চাইতে তোমার স্বভাবজ কন্যা আমার বেশী প্রিয়।

এই নির্মম আঘাতে গ্যেটে মর্মাহত হন, তিনি লিখেছেন :

এই অতিশয় অপ্রত্যাশিত মন্তব্যের ফল আমার উপরে হলো নিদারুণ। আমি তাঁর মুখের পানে চাইলাম কিন্তু বললাম না কিছু। আমাদের সুদীর্ঘ কালের সংস্রবের এই রূপ মনে হলো ভয়াবহ। চলে এলাম, এর পরে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করি নি।

এ সম্বন্ধে গ্যেটের অপর মন্তব্যটি এই :

তরুণ বয়সের ত্রুটি আমরা উপেক্ষা করতে পারি, সে-সবকে জ্ঞান করতে পারি কাঁচা ফলের অস্থায়ী অম্লত্বের মতো। কিন্তু এই ধরণের ত্রুটি যদি না শোধরায় পরিণত বয়সেও তখন আমাদের হতে হয় নিরাশ।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হের্ডর পরলোক গমন করেন। †

† হের্ডরের জাতীয়তা-বোধ সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁর বহু গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

ভিঙ্কল্‌মানের জীবনচরিত

অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর যে প্রাচীন-শিল্প-গৌরবের নূতন বোধ—Classicism—তার প্রথম খ্যাতনামা প্রবর্তয়িতা ভিঙ্কল্‌মান—দরিদ্র চর্মকারের সন্তান—জন্ম ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে, দস্যুহস্তে নিধন ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে। "শিল্পকলার ইতিহাস" নামে তাঁর ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ আজও পণ্ডিতদের শ্রদ্ধার সামগ্রী। লেসিঙ্-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'লাওকোওন' এর প্রভাবের ফল। Walter Pater-এর Renaissance গ্রন্থে এঁর সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে।

তরুণ বয়সেই গ্যেটে এঁর প্রাচীনশিল্পানুরাগের প্রভাবাধীন হন আর ইতালি-বাসকালে নূতন করে' এঁর সম্বন্ধে কৌতূহলী হন—আমরা জানি। এঁর এই জীবন-চরিত তিনি প্রকাশ করেন ১৮০৪ থেকে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। খৃষ্টান শিল্প ও প্রাচীন শিল্প বলতে যে পার্থক্য তিনি সারা জীবন বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তা এক বিশেষ রূপ লাভ করেছে এই গ্রন্থে। ব্রাণ্ডেস বলেছেন এটি গ্যেটের গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়, সেই সঙ্গে তিনি উদ্ধৃত করেছেন সমালোচক গ্রেভিনাস-এর এই মত যে এটি জার্মান সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত-গ্রন্থ—প্রচলিত চরিত-গ্রন্থ যে ভাবে লেখা হয় এটি তা নয়, এটি বরং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভিঙ্কল্‌মানের অবদান সম্পর্কে বিচারপূর্ণ প্রশস্তি। এর কয়েকটি পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়েছে এই ভাবে: প্রকৃতি-পন্থা (paganism), বন্ধুত্ব, সৌন্দর্য, ক্যাথলিক-ধর্ম ইত্যাদি। ভিঙ্কল্‌মানের প্রকৃতিপন্থা সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন:

> ইহজগৎ ও ইহজগতের প্রতি প্রাচীনদের যে প্রীতি তার বর্ণনা দিতে গেলেই বুঝতে দেরী হয় না, প্রাচীনদের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে তাঁদের এই প্রকৃতি-রসিক চিত্ত। আত্ম-বিশ্বাস যা ব্যাপৃত নিকটের বস্তু নিয়ে; পিতৃপুরুষ জ্ঞানে দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার প্রকাশ মুখ্যতঃ শিল্পে; সর্বশক্তিমান ভাগ্যের সম্মুখে আত্মসমর্পণ; যশের আশা শুধু সংসার-ক্ষেত্রে;—এসব পরস্পরের সঙ্গে এমন সম্বদ্ধ, এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, এমন প্রকৃতি-অনুগ জীবন-ব্যাপার, যে, এর ফলে প্রকৃতিপন্থী অচঞ্চল প্রশান্তির অধিকারী যেমন তার শ্রেষ্ঠ আনন্দের মুহূর্তে তেমনি তার ত্যাগ-স্বীকারের মুহূর্তে, এমনকি আত্মনিধনের মুহূর্তেও।

ভিঙ্কল্‌মান শেষ জীবনে ক্যাথলিক-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কোনো কোনো রোমান্টিক সাহিত্যিক ও শিল্পীও ক্যাথলিক-ধর্ম গ্রহণ করেন। ভিঙ্কল্‌মানের ধর্মান্তর গ্রহণ যে এই রোমান্টিকদের দীক্ষাগ্রহণের মতো ব্যাপার নয় সেসম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন:

> ভিঙ্কল্‌মানের সমস্ত কাজে ও লেখায় প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃতিপন্থীর রুচি।

> খৃষ্টান ভাব ও তাঁর ভাবের মধ্যে যে ব্যবধান এমনকি খৃষ্টান ভাবের প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা সেসব কথা মনে রাখতে হবে তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ ব্যাপারটি বুঝতে হলে। খৃষ্টান ধর্মের যে বিভিন্ন দল সেসব তাঁর ভাবনার সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার, তাঁর স্বধর্মের সঙ্গে এর কোনোটির যোগ ছিল না।

গোটের মতে ভিঙ্কল্মান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁর প্রতিভা-বিকাশের আনুকূল্য লাভের জন্য—(আমাদের মধুসূদনের কথা স্মরণীয়):

> তিনি বুঝতে পেরেছিলেন "রোমে যোগ্য রোমান" হবার জন্যে, তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যোগদান—এর ধর্মমত, রীতিনীতি, সবই বরণ করা, যে সিদ্ধি তিনি লাভ করেছিলেন তা'থেকেও বোঝা যায় তাঁর এই ধর্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন। এই ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল, কেননা (প্রথম জীবনে) প্রোটেস্‌টান্ট মতে দীক্ষিত হয়েও তিনি খৃষ্টান হন নি। তিনি আজীবন ছিলেন অকৃত্রিম প্রকৃতিপন্থী।

ধর্মান্তর গ্রহণ যে দুর্বলতার পরিচায়ক সে কথা গোটে স্বীকার করেছেন কেননা, যার যেখানে স্থান হয়েছে তাব সেখানেই সংগ্রাম করে যাওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। কিন্তু তাঁর মতে ধর্মান্তর-গ্রহণের যেমন আছে একটি গুরুগম্ভীর দিক তেম্‌নি আছে একটি হাল্‌কা দিক। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি রোমান্টিক মতবাদের সারথিদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। ডোরোতেয়া মেন্‌ডেলসোন তাঁর পূর্ব স্বামী ত্যাগ করে' ফ্রীডরিখ শ্লেগেলকে বিবাহ করেন আর কারোলিনে মিকায়লিস তাঁর পূর্ব-স্বামী কনিষ্ঠ শ্লেগেলকে ত্যাগ করে' দার্শনিক শেলিংকে বিবাহ করেন—শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয় রোমান্টিক মতবাদের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা। গোটের মন্তব্য এই:

> যদি দৃষ্টান্তে আপত্তি না হয় তবে বলতে পারি এই ধর্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য রয়েছে শিকারের মাংসের—টাটকা না রেঁধে একটু বাসি করে রাঁধলেই ভোজনরসিকদের জন্য তা হয় বেশী মুখরোচক। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ধর্মান্তর গ্রহণ আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে⋯কিন্তু ভিঙ্‌কল্‌মানের জন্য ক্যাথলিক ধর্মের কোনো মনোহারিত্ব ছিল না, এটি তাঁর জন্য হয়েছিল একটি মুখোস মাত্র; উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কর্কশ মন্তব্যও করে গেছেন।

ভিঙ্‌কল্‌মানের চরিতকথা পড়ে ফ্রীডরিখ শ্লেগেল তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন:

> ভিঙ্‌কল্‌মান সম্বন্ধে এই বই ঈশ্বরদ্রোহে পূর্ণ। খৃষ্টানধর্মের প্রতি এমন তীব্র অবিশ্বাস্য বিতৃষ্ণা আমি গ্যেটের কাছ থেকে আশা করিনি; তবে সত্য লুকিয়েও লাভ নেই, এমন একটা ব্যাপার যে তাঁর দ্বারা ঘটবে সে কথা আমি কিছুকাল থেকে ভাবছিলাম। ভিঙ্‌কল্‌মান যে জন্ম-

প্রকৃতিপন্থী একথা আবিষ্কার করে' তাঁর কি অভব্য পৈশাচিক আনন্দ !

খৃষ্টান মতবাদের প্রতি গ্যেটের এই যে বিরূপতা এটি খৃষ্টের মত ও শিক্ষার প্রতি তেমন নয়, তাঁর এই বিরূপতা বরং খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতাদের ইহবিমুখ শিক্ষার প্রতি অর্থাৎ খৃষ্টধর্মের ঐতিহাসিক পরিচয়ের প্রতি। মূল খৃষ্টান ধর্মভাবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আমরা ভিল্‌হেলম্ মাইসটারের "সুন্দর আত্মার' আত্ম-কাহিনী"তে দেখেছি। "ভিলহেলম মাইসটারের ভ্রমণে" আর "একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপে"ও সেই শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা পাব।

রোমান্টিকদের প্রতি গ্যেটের বিরূপতা ক্রোচে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। "আলাপ"-এ আমরা দেখ্‌ব ক্লাসিক রীতিকে কবি বলেছেন স্বাস্থ্যসম্পন্ন আর রোমান্টিক রীতিকে বলেছেন রুগ্‌ণ; তাঁর দৃষ্টিতে রোমান্টিক খেয়ালিপনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের অসারতা-প্রাপ্তি ও বিনাশ।—তবে ক্লাসিক রীতি বলতে গ্যেটে বুঝতেন অবিকৃত অনুভূতি ও পরিপূর্ণ প্রকাশ—কোনো বিশেষ ঢঙ্‌ নয়।

নাট্য-পরিচালনা

গ্যেটে ও শিলারের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়েছিল তাঁদের সহকর্মিতার গুণেও; জার্মান নাট্যের উৎকর্ষ উভয়ের ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। লুইস দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে-গুণে নাটক জনপ্রিয় হতে পারে গ্যেটের নাটকে সে সবের অভাব। কিন্তু শিলারের নাটকে সে অভাব ছিল না, তাঁর নাটক জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু এই দুই বন্ধুর—বিশেষ করে' গ্যেটের—যে গ্রীকশিল্পাদর্শের প্রতি পক্ষপাত তাতে জার্মানীতে এক বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তার নাম 'রোমান্টিক' মতবাদ। এ সম্বন্ধে লুইসের মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করেছি। স্বনামধন্য শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয় এই মতের প্রধান ব্যাখ্যাতা হলেন। জ্যেষ্ঠ-শ্লেগেল সম্বন্ধে ও এই দুই মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্যেটের মত আমরা "আলাপে" পাব। রোমান্টিকদের সঙ্গে গ্যেটের এই সাহিত্যিক বিসম্বাদ দীর্ঘদিন জার্মানীর সাহিত্যিক আসর উত্তপ্ত করে' রাখে†। এই রোমান্টিক মতবাদের এক বিশেষ ফল এই হলো যে মধ্যযুগের খৃষ্টানধর্মের প্রতি এক শ্রেণীর শিল্পীর নব অনুরাগ দেখা ছিল, তাঁদের কেউ কেউ—যেমন শ্লেগেল-ভ্রাতৃদ্বয়— নূতন করে' ক্যাথলিক মতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। (একালেও এমন এক সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়া ইয়োরোপে চলেছে মনে হয়, একালের খ্যাতনামা কবি টি, এস্, এলিয়ট নতুন করে' ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করেছেন)।

† অতি-আধুনিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ স্মরণীয়।

ইয়োরোপে 'ক্লাসিক' আদর্শ আর 'রোমান্টিক' আদর্শের সংঘর্ষের ইতিহাস তেমন দীর্ঘ নয়। ফরাসীদের তথাকথিত ক্লাসিক আদর্শের প্রতি তরুণ-গ্যেটে ও তাঁর গুরুস্থানীয় লেসিঙ্‌ ও হের্ডরের প্রতিবাদ আমরা দেখেছি। কিন্তু ক্লাসিক আদর্শ গ্যেটের পরিণত প্রতিভায় নূতন জীবন লাভ করলো। তাঁর রচনারীতি হলো অতিশয় সংযমিত। তিনি নূতন করে' ভলটেয়ারের অনুরাগী হলেন—ভলটেয়ারের "মোহম্মদ" (Mahomet) নাটক অনূদিত হয়ে ভাইমারে অভিনীত হলো। অভিনয় সম্বন্ধেও কঠিন সংযম তাঁর আদর্শ হলো। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের জন্য দীর্ঘদিন তাঁর ব্যবস্থা কার্য্যকরী রইল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ যে তীব্র হয়ে উঠছিল তা বোঝা গেল কালে। সেই প্রতিবাদ হলো একই সঙ্গে অবাঞ্ছিত ও কৌতুকাবহ।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কার্‌স্‌টেন্‌স নামক এক অভিনেতা মোন্‌টারগীস-এর কুকুর (The Dog of Montargis) এই নামের এক নাটকের অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে; যে কুকুরটির সাহায্যে সে অভিনয় দেখাতো সেটি জনসাধারণের আকর্ষণ-স্থল হয়ে দাঁড়ায়। প্যারিস বার্লিন এই সব বড় বড় শহরে এই অভিনেতা জনপ্রিয় হলো। তাকে ভাইমারে আনবার চেষ্টাও চললো। কিন্তু এমন অদ্ভুত অভিনয় গ্যেটে ভাইমারের রঙ্গমঞ্চে কিছুতেই মঞ্জুর করলেন না। ভাইমারের প্রধান অভিনেত্রী কারোলিনে যাগেমান ছিলেন ডিউকের প্রিয়পাত্রী আর গ্যেটের প্রতি বিরূপ। এমন অবিমিশ্র বিরূপতা আর কোনো নারীর কাছ থেকে গ্যেটের লাভ হয়নি। প্রধানত এই অভিনেত্রীর প্ররোচনায় কারস্‌টেন্‌স্‌কে তার কুকুর-সহ ভাইমারে আনা ঠিক হলো। রঙ্গমঞ্চের এমন লাঞ্ছনা দেখে গ্যেটে য়েনায় চলে গেলেন এই অভিমত প্রকাশ করে' যে এমন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তিনি সংস্রব রাখতে চান না। (হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনাবশে) ডিউক এই আদেশ দিলেন :

> হের গেহাইমরাট ফন গ্যেটে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আর সংস্রব রাখতে চান না এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ সংবাদ পেয়ে নাট্যপরিচালনার সঙ্গে তাঁর সংস্রব-ত্যাগ আমি সমর্থন করছি।

সহসা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। গ্যেটে মর্মাহত হলেন। গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বল্লেন : কার্ল আউগুস্ট্‌ কোনোদিন আমাকে বুঝলেন না। ভিয়েনা থেকে কবির প্রতি সাদর আমন্ত্রণ এলো। কবি দোলায়িতচিত্ত হলেন। কিন্তু ডিউক তাঁর ভুল বুঝতে পেরে অচিরে এই চিঠিখানি কবিকে লিখলেন :

> বন্ধু, তোমার যেসব মন্তব্য আমার কানে এসেছে তা থেকে বুঝেছি নাট্যপরিচালনার বিরক্তিকর কাজ থেকে অব্যাহতি পেলে তুমি খুশী হবে, অবশ্য দরকার হলেই ম্যানেজার তোমার উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করবে আর ততটুকু সাহায্য দিতে তুমি আপত্তি করবে না, তোমার এই

অভিমত জেনে আমি তা সানন্দে সমর্থন করছি,—সেই সঙ্গে জানাচ্ছি এই শ্রমসাধ্য ব্যাপারে তুমি যা করতে পেরেছ তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আর আমার এই অনুরোধ যে এর উত্তরোত্তর শিল্পগত উৎকর্ষে তোমার যত্ন শিথিল না হোক। এই পরিবর্তন ঘোষণা করে' আমি এক সরকারি পত্র দিচ্ছি। তোমার স্বাস্থ্য কামনা করি।

গ্যেটের মনের ভার লাঘব হলো, কিন্তু ডিউকের বহু অনুরোধেও আর তিনি রঙ্গমঞ্চের সংস্রবে গেলেন না।

বিজ্ঞান-সাধনা

গ্যেটেকে বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিক কবি ও কবি-বৈজ্ঞানিক; অর্থাৎ কবিদের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক আর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনি কবি। এ উক্তি অতি যথার্থ। প্রকৃতিতে যেটি যেমন তাকে সেই ভ'বেই বুঝবার জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত নেই; তাঁর যে বিখ্যাত উক্তি—আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব মন্দ হব, তোমাদের যত আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবেনা—এটিকে বলা যেতে পারে তাঁর জীবন-সাধনার ও জ্ঞান-সাধনার বীজমন্ত্র। তাই তাঁর কবিতা ভাবোচ্ছ্বাস বা ভাব-রূপ মাত্র নয়—তাঁর জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা সেসবের মূলে; আর তাঁর এই বাস্তব-নিষ্ঠার গতি যে হবে বিজ্ঞান অনুশীলনের দিকে তাও অপরিহার্য। কিন্তু সেই বাস্তব-নিষ্ঠায় বা বিজ্ঞান-অনুশীলনে তিনি শুধু বিশিষ্টের দ্রষ্টা মাত্র নন, তিনি সেই বিশিষ্টকে সাজিয়ে দেখতে চান সমগ্রের সঙ্গে।

তাঁর ঊর্ধ্ব-হনু-সংযোগ-অস্থি আবিষ্কার, তাঁর "বৃক্ষের রূপান্তর" এসব শুধু বিশেষ বিশেষ আবিষ্কার নয় বরং জগতের জড় ও জীবের যোগাযোগের তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর ভাবনা, তা আমরা জানি। তাঁর বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায়ও রয়েছে তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের পরিমাণ সামান্য।

নিউটনের বর্ণতত্ত্বের মূল কথা এই যে সাদা রং সাত রঙের সমষ্টি। কিন্তু গ্যেটে দেখাতে প্রয়াস পান, সাদা রং মিশ্র পদার্থ আদৌ নয় এক অকৃত্রিম আদি পদার্থ, কারণ, অন্য যে কোনো রঙ সাদা রঙের তুলনায় গাঢ় বা ঘোর—কাজেই সেই সব ঘোর বর্ণের সমষ্টি কখনো সাদা হতে পারে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি দীর্ঘকাল বর্ণ সম্বন্ধে বহু রকমের গবেষণা করেন ও শেষে "বর্ণতত্ত্ব" নাম দিয়ে এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু ভূয়োদর্শনের সাহায্যে বহু প্রকারের যুক্তি তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন †। সেই দিনে হেগেল প্রমুখ

† অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্য পণ্ডিতদের মতে মহামূল্য: অঙ্কশাস্ত্র আমাদের সত্যের (Reality) ধারণা দেয় না, এর যে যাথার্থ্য তা এর নিজেরই যাথার্থ্য, এ এক ধরণের "ফরাসী বুলি" এতে সবই একই সঙ্গে পরিচ্ছন্নতর ও নিঃস্বতর হয়, হারিয়ে ফেলে আপন সত্তা ও বৈশিষ্ট্য।

বড় বড় দার্শনিক তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকও তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁর মত স্বীকার করেন কি। এই বর্ণতত্ত্ব নিয়ে গ্যেটে এত মেতে ওঠেন যে তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্য বিস্মৃত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি কটূক্তি করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। একেরমানের সঙ্গে কথোপকথনে বহুবার তিনি বলেন :

> কবি হিসাবে আমি যা করতে পেরেছি তাতে আমার কিছুমাত্র গর্ব নেই, আমার মতো ভাল কবি আমার যুগেও ছিলেন, আমার চাইতে ভাল কবি জন্মে গেছেন, আমার পরেও জন্মাবেন। কিন্তু আমার শতাব্দীতে দুরূহ বর্ণবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেবল মাত্র আমিই যে অভিজ্ঞ এ আমার কম গর্বের বিষয় নয়, এক্ষেত্রে অনেকের চাইতে আমার স্থান উর্ধ্বে।

কিন্তু বর্ণসম্বন্ধে তাঁর এই নিউটন-বিরোধী সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হলেও তাঁর গ্রন্থে তিনি যে বর্ণকে শারীর (Physiological) ভৌতিক (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical) এই তিন ভাগে ভাগ করেন সেটি পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট দান বলে' স্বীকার করেন।

গ্যেটের বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ য়োহানেস্ ম্যুলর-এর এই উক্তি ব্রাণ্ডেস উদ্ধৃত করেছেন—এটি গ্যেটেকে লেখা তাঁর এক পত্রের অংশ :

> আপনার গবেষণা শুধু আমার অনুসন্ধান-পদ্ধতিতে নয় জীবজগৎ সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধানের প্রকৃতিতেও দীর্ঘ দিন প্রেরণা সঞ্চার করে এসেছে ; আজ প্রকাশ্য ভাবে একথা ঘোষণা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে যে, যে-বীজ আপনি বপন করেছিলেন তা থেকে যেমন অতীতে বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে ফল লাভ হয়েছে, ভবিষ্যতেও তেমনি হবে, আর বিশেষ ভাবে আমার জীবনে তা সুফলপ্রসূ হয়েছে। আমার যা কিছু লাভ হয়েছে সব আপনার গভীর শিক্ষার ফল। আপনার মহানুভবতার সামনে আজ আমার এই গ্রন্থ স্থাপন করছি এই আশায় যে এ-পর্য্যন্ত-খ্যাতিপরিচয়হীন আপনার এই শিষ্যের এই উপহার আপনি কিঞ্চিৎ যত্ন-সহকারে অধ্যয়ন করবেন।

গ্যেটের বিজ্ঞান-সাধনা আজো বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহলের বিষয়। সম্প্রতি স্যর চার্ল্‌স্ শেরিংটন Goethe on Nature and on Science নাম দিয়ে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাতে গ্যেটের বিজ্ঞান-চর্চার তেমন বৈজ্ঞানিক সার্থকতা তিনি দেখেন নি, তবে প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর বোধে তিনি দেখেছেন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়—প্রকৃতি তাঁর চোখে কতকগুলো ভৌতিক শক্তির নিয়ম-শৃঙ্খলা নয়, সে বরং দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপী এক ব্যক্তি, জন্ম ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার দ্বারা।

বলা বাহুল্য এটি গ্যেটের বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে একটি মত মাত্র—বর্তমানে হয়ত প্রবল মত। কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিতদের ধারণা জন্মেছিল যে গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে গ্যেটের পরিচয় সুগভীর ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি সে-মত পরিবর্তিত হয়েছে—গ্রীক সংস্কৃতি সম্বন্ধে গ্যেটের জ্ঞান যে গভীর ছিল তা স্বীকৃত হয়েছে।

ফাউস্‌ট

প্রস্তাবনা

অতীতকাল থেকে ইয়োরোপে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে শয়তানের কাছে আত্মবিক্রয় করলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু সেই ক্ষমতা ভোগ করা যায় একটি পরিমিত কাল ধরে', তারপর সেই ক্ষমতাকামীকে হতে হয় একান্তভাবে শয়তানের অধীন অর্থাৎ চির-অভিশপ্ত নারকী। মধ্যযুগে এই ধারণা আরো প্রবল হয় কোনো কোনো খ্যাতনামা ধার্মিকের এমন অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি লোভের জন্যে—তাঁরা অবশ্য পরে অনুতপ্ত হন ও মেরী-মাতার প্রসাদে অভিশাপ থেকে করুণার রাজ্যে ফিরে আসেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মান দেশে ফাউস্‌ট নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়; ভিটেনবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বিদ্যালাভ করে, কিন্তু পরে ধর্মের পথ পরিত্যাগ করে' হয় জাদুকর; জাদু-বিদ্যার সাহায্যে সে নাকি সম্রাটের বাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করায়, প্রাচীনকালের হেলেনাকে লোকের চক্ষুগোচর করায় ও তাকে বিবাহ করে—তাদের এক পুত্র লাভ হয়; শয়তান নাকি এর সঙ্গে থাকতো একটি কালো কুকুরের রূপ ধরে'।—এই ফাউস্‌টকে ঘিরে বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভব হয়, সে-সবে অজ্ঞাতসারে রূপ পায় মধ্যযুগের রেনেসাঁস-এর নব মুক্তি ও নব বিজ্ঞানের বিস্ময়।

এই ফাউস্‌ট-কাহিনী ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে লোক-নাটকের রূপ পায়—সেকালের থিয়েটারের দল এই নাটক দেখিয়ে বেড়াতো। তারই উপর নির্ভর করে' এলিজাবেথীয় নাট্যকার মার্লো তাঁর বিখ্যাত "ডক্টর ফস্‌টাস" নাটক রচনা করেন—তাতে ফাউস্‌ট সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাই রূপ লাভ করে। মার্লোর এই নাটক গ্যেটে প'ড়েছিলেন।

গ্যেটে যখন তরুণ যুবক তখন জার্মানীতে ফাউস্‌ট-এর কাহিনী নিয়ে নাটক লিখবার যেন হিড়িক পড়ে যায়। সে-সবের মধ্যে স্বনামধন্য লেসিঙ্‌-এর প্রচেষ্টাই উল্লেখযোগ্য। ফাউস্‌ট-উপাখ্যান নিয়ে যে অতি শক্তিশালী নাটক রচনা করা যায় এই অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন, তাঁর মতে ফাউস্‌ট তার অসীম জ্ঞানতৃষ্ণার জন্যে অভিশাপ নয় মুক্তিরই অধিকারী। কিন্তু লেসিঙ্‌-এর নাটকের পাণ্ডুলিপি হারিয়া যায়। ফাউসট সম্বন্ধে এই নব ধারণার ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধি ও সবল মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ পূজারী গ্যেটের অগ্রণী। তবে মেফিসটোফিলিসের সঙ্গে ফাউস্‌টের যে ধরণের চুক্তি হয় সেটি, বিখ্যাত মার্গারেটের বা গ্রেটখেন-এর উপাখ্যান, সর্বোপরি ফাউস্‌ট-উপাখ্যানে গ্যেটে যেভাবে প্রতিবিম্বিত করান মানুষের আত্মিক ও ঐতিহাসিক জীবনের ব্যাপক ছবি, সে-সবই তাঁর নিজস্ব।

ফাউস্ট-কাহিনী নিয়ে একটি রচনা দাঁড় করাবার কথা গ্যেটে অল্প বয়সেই ভাবেন —উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সে যখন তিনি দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করেন সেই সময়ে। কিন্তু এই চিন্তা তাঁর মনেই থেকে যায়। এর পরে স্ট্রাসবুর্গে তাঁর অন্যতম গুরু হের্ডরকেও এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন না। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> ফাউস্ট কাহিনী আমার অন্তরে বহু ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। আমিও অল্প বয়সে জ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছিলাম, আর বুঝেছিলাম সবের অসারতা। জীবন আমার চালিত হয়েছিল বিচিত্র পথে—কিন্তু বারবারই লাভ হয়েছিল দুঃখ আর অতৃপ্তি।

স্ট্রাসবুর্গ থেকে ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে ফ্রীডেরিকাকে ত্যাগ করে' আসার দুঃখ গ্যেটে তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন; সেই কালেই এটি রচনায় তিনি হাত দেন; আর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ভাইমার-যাত্রার পূর্বেই এর অনেকগুলো দৃশ্য—গ্রেটখেনের কাহিনীর প্রায় সবটা —লিখে ফেলেন। তারপর এটিতে তিনি হাত দেন ইতালিতে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু সেখানে ডাকিনীদের দৃশ্যটি (ষষ্ঠ দৃশ্য) তিনি লিখতে পারেন, আর সম্ভবত বনের দৃশ্যটিও (চতুর্দশ দৃশ্য) লিখেছিলেন। ইতালি থেকে ভাইমারে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর রচনাবলীর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়, তাতে Urfaust বা আদি ফাউস্ট অসম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়। †

কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ ফাউস্ট কারো মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করে না, এমন কি শিলারেরও নয়। কিন্তু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে শিলার গ্যেটেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাঁর ফাউস্ট নাটক শেষ করতে কেননা অসম্পূর্ণ ফাউস্ট-এ তিনি সন্ধান পেয়েছেন যেন মস্তকহীন হারকিউলিস-মূর্তি (Torso of Hercules)। গ্যেটে জানান, আপাতত ফাউস্ট-এ হাত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বন্ধু শিলারের আগ্রহের ফলেই ভবিষ্যতে এতে হাত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গ্যেটে ও শিলারের সাহিত্যিক যোগ নিবিড় হয়; সেই সময়ে তাঁদের বিখ্যাত গাথা-সমূহ রচিত হয়। বিস্মৃতপ্রায় ফাউস্টও গ্যেটের মনোরাজ্যে পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে—শিলারের সাহিত্য-তত্ত্ব এই সজীবতার সহায় হয়। এই কালেই উৎসর্গ (Dedication), নান্দী (Prelude on the stage), স্বর্গে প্রস্তাবনা (Prologue in Heaven) ইত্যাদি অংশ রচিত হয় ও সমগ্র পরিকল্পনাটি নতুন রূপ গ্রহণ করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটি প্রায় এর বর্তমান রূপ পায়। তারপর গ্যেটে ও শিলারের অসুস্থতা, শিলারের মৃত্যু ও গ্যেটের শোকের কাল। অবশেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ঈস্টারে এটি প্রকাশিত হয়।

† Van Der Smischen-এর Faust-এ Urfaust-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এই জগদ্‌বিখ্যাত নাট্যকাব্যের টীকা ভাষ্য এত বিস্তৃতভাবে হয়েছে, এত ভাবুক ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যে এর পরিচয় দানের চেষ্টায় স্বতঃই কুণ্ঠিত হতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিতসমাজ গ্যেটের অন্তত এই কাব্যের সঙ্গে কিছু পরিচিত। সেই পরিচয় আরো গভীর ও ব্যাপক হবে আশা করি, কেননা সমগ্র ফাউস্ট যোগ্যভাবে বুঝতে পারা আর গ্যেটের মতো মহাকবির সৃজনী-প্রতিভা ও জীবন-সাধনা বুঝতে পারা প্রায় তুল্য মর্যাদার।—প্রধানত বেয়ার্ড টেইলর, মিস আনা সোয়ানউইক ও ফান ডের স্মিশেনের ইংরেজি অনুবাদের সহায়তায় আমরা এই পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি। মুল জার্মানের সঙ্গে আমাদের অনুবাদ যে মিলিয়ে দেখা হয়েছে 'নিবেদনে' সেকথা বলা হয়েছে।

প্রথমে **উৎসর্গ**। উৎসর্গে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর অতীত আনন্দ-ও-বেদনা-মুহূর্তসমূহের কথা, তাঁর অতীতের বন্ধুদের কথা :

অর্ধবিস্মৃত পুরাতন কাহিনীর মতো মনে হচ্ছে সে সব,—
সেইদিনের প্রথম প্রেম ও বন্ধুত্ব।
নতুন করে' জন্ম হলো বেদনার—তার আর্তস্বর
ছড়িয়ে পড়লো জীবনের সর্পিল ভগ্ন পথে পথে।
জীবন-প্রভাতে মোহন মুহূর্তে হারিয়েছি যাদের ভাগ্যের চক্রান্তে
সেই সব প্রিয় নামে আজ ভরপুর হলো স্মৃতি।
শুনছে না আর তারা আমার আজকার গান,
যাদের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল আমার প্রথম সুরতান,—
হারিয়ে গেছে তারা দিগ্‌দিগন্তে, আজকার উল্লাসধ্বনিতে
বাজবে না আর সেই প্রথম প্রশংসা-ধ্বনি।
আমার আজকার গান ধ্বনিতে হচ্ছে অপরিচিত জনতায়,
তাদের করতালিও আমার অন্তরে হানে আঘাত,
একদিন ছিল যারা আমার আনন্দিত ও বিস্মিত শ্রোতা
বেঁচে থাকলেও কোথায় রয়েছে আজ তারা।.......

সেই সব স্মৃতি আর তাঁর নব সৌন্দর্যবোধ ও সৃষ্টিশক্তি আজ তাঁতে সচেতন।

নান্দীতে সূত্রধার কবি ও বিদূষকের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে কি ধরণের নাটক দেখানো যাবে তাই নিয়ে। সূত্রধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাস্তববাদী ; জনসাধারণকে কি ভাবে আকৃষ্ট করা যায়, আয় যথেষ্ট হয়, এই তার প্রধান ভাবনা ; কবিকে সে বলছে :

...জনসাধারণকে খুশী করা যায় কি দিয়ে তা আমি জানি ;
...কিন্তু এরা আবার পড়াশুনা করেছে ঢের ;

কেমন করে' এমন জিনিষ এদের সামনে ধরা যায় যা খুব চটুল ও নতুন ?
আর সেই সঙ্গে অর্থপূর্ণও বটে রসালও বটে ?
...দেখে খুশী লাগে কেমন দলে দলে এরা আসছে,
...দুর্ভিক্ষের দিনে রুটি নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি পড়ে যায়
তেমনি মারামারি এরা লাগিয়েছে টিকিট কেনা নিয়ে।

কবি সৌন্দর্য-ধ্যানী, জনগণের আচরণে তার সেই সৌন্দর্য-বোধ আহত; সে বলছে :

ঐ রঙ-বেরঙের জনতার কথা আর আমাকে বলো না,
ওদের দেখেই আমাদের প্রাণ যায় উড়ে।
এই বিরাট জনস্রোত আবৃত করো আমার দৃষ্টি থেকে,
ওদের আবর্ত ভয়ঙ্কর ভাবে টানে আমাদেরও!
স্থান দাও বরং আমাকে স্বর্গীয় নিস্তব্ধতায়
যেখানে কবির চারপাশে ফোটে বিমল আনন্দ—
যেখানে প্রেম ও বন্ধুত্ব আজো
সম্পর্ক ও হৃদয়াবেগে দান করে দিব্য প্রভা।

সেই পরিবেশে গভীরতম অনুভূতি থেকে উত্থিত হয় অর্ধস্ফুট বাণী,
ভীরু ওষ্ঠে হয় প্রকম্পিত—
বার বার হয় ব্যর্থ, কখনো লাভ করে প্রকাশ—
উন্মত্ত মুহূর্তে আবার যায় তলিয়ে;
অথবা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে
অবশেষে লাভ হয় তার পূর্ণাঙ্গ রূপ;
যা চোখ ঝলসানো তা নিঃশেষিত হয় নিমেষে,
যা নিষ্কলুষ তা রয়ে যায় অনাগত কালের জন্য।

বিদূষকও বাস্তববাদী, কিন্তু মানুষের মহত্তর সম্ভাবনায় বিশ্বাসহীন নয়; কবির দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি সে আকর্ষণ করছে নিকটের বস্তুর দিকে :

অনাগত কাল! ও কথা শুনতে রাজি নই আমি।
যদি অনাগত কালের কথাই বলে' চলি, তবে
আজকার আনন্দ পাব কোথা থেকে?
আজ যে ওসব চাই-ই ভুল নেই তাতে।
...যে নিজের অন্তর আনন্দে ঢেলে দিতে পারে

জনসাধারণের খেয়ালিপনায় সে বিরক্ত হয় না ;
যত বেশী লোকের সংস্পর্শে সে আসে
তত ফলপ্রসূ হয় তার প্রেরণা ।
অতএব সাহসে বাঁধো বুক, দাও দামী কিছু,
কল্পনা আসুক তার সব সঙ্গী নিয়ে—
অর্থ বিচার অনুভূতি আবেগ সব হোক একত্র—
কিন্তু ভুলোনা সেই সঙ্গে নির্বুদ্ধিতারও কথা !

বিদূষকের কথায় সূত্রধার নিজের কথার সমর্থন পাচ্ছে, সে বলছে :

বেশী করে' চাই কিন্তু ঘটনা ;
ওরা আসে শুনতে, কিন্তু চায় বিস্মিত হতে ।
বহু-কিছু ছুঁড়ে দাও ওদের সামনে,
হাঁ করে' থাকুক ওরা চোখ মেলে ;
বহুবিস্তারের দ্বারাই তাহলে যাবে জিতে
আর হবে সব চাইতে জনপ্রিয় ।
বহুর মন পেতে পারো শুধু বহু কিছু দিয়ে ; কেননা
যার যেটুকুতে দরকার অবশেষে সে তা'ই নেয় বেছে ;
যে দেয় বহু কিছু সে যোগায় বহুর প্রয়োজন,
প্রত্যেকে বাড়ী যায় খুশী হয়ে সেই দৃশ্য দেখে ।
যদি টুক্‌রা-টাক্‌রা কিছু থাকে, তাই দাও,
তাতেই হবে সিদ্ধি……
পূর্ণাঙ্গ-কিছু দেবার কি প্রয়োজন ?
তোমার শ্রোতারা ত তা পেয়ে টুকরো টুকরোই করে' ফেলবে ?

কবি শিল্পের এমন অপব্যবহারের আশঙ্কায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সে বলছে :

….এমন জোড়াতাড়ার কাজ করে নকল-শিল্পী,
দেখছি তাতেই তোমার অভিরুচি ।

সূত্রধার এইবার মানুষের কদর্য রুচির দিকে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করছে :

এ তিরস্কারের ধার নেই আদৌ ;
যে কিছু করতে চায়
তাকে ব্যবহার করতে হয় যোগ্য উপকরণ ।
…ভেবে দেখো লিখছো কাদের জন্য !
তাদের কেউ এসেছে তিক্ত বিরক্ত হয়ে, কেউ পরিশ্রান্ত হয়ে,

কেউ এসেছে খানা খেয়ে আরামে,
আর কেউ এসেছে, হায় ভাগ্য,
দৈনিক কাগজ পড়া শেষ করে'……
…মহিলারা এসেছেন দেহ-সৌষ্ঠব আর সজ্জা নিয়ে
বিনি পয়সায় দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অভিনয়।
বড় বড় কবিত্বের স্বপ্ন কত দেখবে ?
বার বার ঘর ভর্তি হচ্ছে দেখে কি খুশী হও ?
যারা তোমাদের অনুগ্রাহক তাকিয়ে দেখ একবার তাদের মুখের পানে।
তাদের অর্ধেক বর্বর বাকি অর্ধেক উদ্দীপনাহীন।
অভিনয়ের শেষে তাদের কেউ যাচ্ছে তাস খেলতে ;
কেউ যাচ্ছে পিয়ারীকে নিয়ে উদ্দাম রজনী যাপন করতে।
হায় নির্বোধ কবিদল, কেন এরি জন্য
উত্যক্ত করো করুণাময়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীদের ?
আমি বরং বলি বেশী দাও, যত পারো বেশী দাও—
তাতেই লাভ হবে অর্থ আর প্রতিপত্তি।
বিহ্বল করে' দাও তোমার দর্শকদের !
তাদের খুশী করা কঠিন কাজ।—
অস্বস্তি বোধ করছ বড় ? দুঃখে, না সুখে ?

কবি বুঝে নিলে সূত্রধারের পথ তার পথ নয় ; সে অবলম্বন করছে কবিত্বের ধ্যান :

খুঁজে নাও বরং অনুগততর দাস !
কবি প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছ
শ্রেষ্ঠ মানবতা, পরম অধিকার—
সেই অধিকার এমনভাবে নিয়োজিত হবে তোমাকে খুশী করতে ?
কোন্ শক্তি-বলে জয় করে সে মানুষের অন্তর ?
কেমন করে' জয় করে সে সব শক্তি ?
তার অন্তরের সংহতি-বোধ চায় জগতে দূরে দুরান্তে ও নিকটে যা-কিছু আছে
সব এক ঐক্যসূত্রে বাঁধতে—শুধু সেই আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নয় কি ?
…জগৎ ও জীবন-যন্ত্রে যে বেসুর বাজে
কে সেই বেসুরে এনে দেয় সুর-সুষমা ?
প্রতি খণ্ড-সুরকে তুলে ধরে সমগ্রতার বিরাট গৌরবে ?

ঝড়ে কে দেখে হৃদয়াবেগের উদ্দামতা ?
সন্ধ্যার লালিমায় কে দেখে একাগ্র চিন্তার দীপ্তি ?
বসন্তে কে সব চাইতে সুন্দর ফুল
ছড়ায় প্রিয়ার পদচারণার পথে ?
পথের পাশের সবুজ পাতা দিয়ে কে তৈরি করে
প্রতি কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের শিরে গৌরব-মুকুট ?
স্বর্গকে করে ধ্রুব, দেবতাদের করে ঐক্যবদ্ধ ?
মানুষের মহিমা যেন মূর্ত কবিরূপে !

বিদূষক কবির এই সৌন্দর্য-বোধ প্রয়োগ করতে চাচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে :

তাহলে তোমার এই সব মনোরম ক্ষমতার সম্মেলন হোক
মহৎ কাব্য-সৃষ্টিতে,
যেমন ঘটে প্রেমের ব্যাপারে !
দুজনে দেখা হলো দৈবক্রমে, লাগলো ভাল, এক সঙ্গে কাটলো কিছুক্ষণ,
অজ্ঞাতসারে মন পড়লো বাঁধা, এলো জটিলতা,
এই স্বর্গসুখ, এই যন্ত্রণা—
প্রেম হলো পূর্ণাঙ্গ কেমন করে' হলো তা জানবার পূর্বেই।
অভিনয় করা যাক তেমনি একটি নাটক !
সাহসে ঝাঁপ দাও জীবন-সমুদ্রে—সন্ধান কর এর তলকূল ;
জীবন অতিবাহিত করে সবাই, কিন্তু বোঝে একে কম লোকেই ;
এর যেখানেই স্পর্শ করবে বোধ করবে অসীম কৌতূহল।
ছবিগুলো বিচিত্রবর্ণ, অর্থ অস্পষ্ট,
ভুলের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সত্যের ঈষৎ রশ্মি
—এই ভাবেই তৈরি হয় শ্রেষ্ঠ রস-মদিরা,
তাতেই উল্লসিত হয় উন্নীত হয় জগতের লোক।
তোমার নাটক দেখতে আসবে সুদর্শন তরুণ-তরুণী,
জ্ঞান করবে একে যেন দৈববাণী।
তাদের কচি কোমল মন,
তোমার রসচক্রে তারা পান করবে বেদনা-মধু ;
এই এখন একজন তখন আর একজন মর্মস্পৃষ্ট হবে তোমার দ্বারা,
প্রত্যেকেই তোমার লেখায় দেখবে তার অন্তরের ছবি।

হাসাবে কাঁদাবে তুমি তাদের অবলীলাক্রমে,
যা মহৎ তা জাগাবে তাদের বিস্ময়, যা রহস্যময় বাসবে তাকে তারা ভাল ;
যারা পরিপক্ক তাদের পারবে না তুমি বদলাতে ;
যারা বিকাশোন্মুখ তারা হবে তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

কবি এতে উৎসাহিত হচ্ছে, সে বলছে :

তাহলে ফিরিয়ে দাও আমাকে সেই দিন,
যে-দিনে আমাতেও চলেছিল বিকাশ ;
যে-দিনে ছন্দ আমার অন্তর থেকে উৎসারিত হতো
নৃত্যপরা ঝরণা-ধারার মতো !
জগৎ সেদিন আমার চোখে ছিল স্বপ্ন বাষ্পে ঘেরা,
প্রতি ফুটন্ত কুঁড়ি ছিল বিস্ময়পূরিত,
অজস্র কুসুম চয়ন করেছি উপত্যকায় উপত্যকায় !
ছিল না আমার কিছুই, তবু ছিলাম সমৃদ্ধ—
ছিল মোহে আনন্দ, ছিল সত্যের দুর্জয় তৃষ্ণা।
দাও ফিরিয়ে দাও আমার সেই দিনের অনুভূতি,
সেই দিনের ব্যথা-ছোঁওয়া আনন্দ,
ঘৃণার তীব্রতা আর প্রেমের তন্ময়তা,—
দাও, ফিরিয়ে দাও আমার সেই যৌবন !

বিগতযৌবন কবির এই যৌবন ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় বিদূষক প্রথমে রসিকতা করছে :

বন্ধু, যৌবনে তোমার নিশ্চয়ই প্রয়োজন
যখন যুদ্ধে পড়েছ শত্রুর হাতে,
কিংবা যখন তরুণীরা তোমার প্রতি হয়েছেন প্রীতিমতী।···

কিন্তু পরে কাজের কথা তুলছে :

কিন্তু তোমার পরিচিত বাঁশী যদি বাজাতে চাও
সমস্ত প্রাণ দিয়ে—নৈপুণ্য দিয়ে উৎসাহ দিয়ে,
সেই সঙ্গে ছন্দ চলেছে সাবলীল ভঙ্গিতে বহু ঘুরে ফিরে
নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে—
তবে, বৃদ্ধ কবিদল, তোমাদেরই তা সাজে ভাল ;
তোমাদের মর্যাদা তাতে কমে না আদৌ ;

কথায় বলে বুড়ো হলে লোকে হয় শিশু, কিন্তু তা সত্য নয় ;
খাঁটি শিশুই আমরা থেকে যাই বুড়োকালেও।

সূত্রধার এইবার আরম্ভ করতে চাচ্ছে তার অভিনয় :

…কথায় তোমরা দু'জনেই দড়, চেষ্টা কর বরং কাজে লাগতে।
প্রেরণার কথা কি বলছো ? প্রেরণা দ্বিধার সহচরী নয় কখনো।
যদি কাব্যই হয়ে থাকে তোমার পেশা,
তবে মানুক কাব্য তোমার হুকুম !…
….আজ যা করা হলো না, কাল আর তা হবে না।
এগোও সামনের দিকে ক্লান্ত না হয়ে,—
…যা সম্ভবপর তাকে অবিচলিত প্রত্যয়ে
দৃঢ় মুষ্টিতে ধরুক সংকল্প, তাহলে আর শিথিল হবে না সেই মুষ্টি ;
কাজ তখন চলবে কেননা চালানো চাই-ই।
আমাদের এই জার্মান রঙ্গমঞ্চে, জানো তুমি,
করে' যায় যার যা খুশী ; চিত্রপট, কারিকুরি, যত খুশী খাটাও,
দেখিয়ে যাও যা হাতের কাছে পাও !
সূর্য চন্দ্র তারা, গাছ পাখী পাহাড়,
আগুন জল অন্ধকার, দিন আর রাত !
আমাদের এই পরিমিত রঙ্গমঞ্চে আসুক সব,
দেখানো হোক সৃষ্টির চক্র, চলুক কল্পনার বলে, বেগে,
স্বর্গ থেকে, মর্ত্যের ভিতর দিয়ে, রসাতলে !

এই শেষ ছত্রে রয়েছে যে নাটক দেখানো হচ্ছে তার পূর্বাভাস।

ব্রাণ্ডেস ও ক্রোচে বলেছেন সম্ভবত কালিদাসের শকুন্তলার নান্দীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে গ্যেটের নান্দী। শকুন্তলার আরো প্রভাব যে গ্যেটের ফাউস্‌টের উপরে পড়েছে পরে পরে তা বোঝা যাবে।

কবি, কাব্য, কাব্যের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গভীর কথা, অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব, এই নান্দীতে প্রকাশ পেয়েছে। অবতরণিকায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। 'একেরমান ও সোরের সঙ্গে আলাপ' অধ্যায়েও অনেক কথা পাওয়া যাবে।

এর পরে **স্বর্গে প্রস্তাবনা**। বিশ্বপ্রভু ও দেবদূতদের সভা—সেখানে উপস্থিত হলো মেফিসটোফিলিস (শয়তান)। রাফায়েল গাব্রিয়েল ও মিকায়েল পদমর্যাদা অনুসারে প্রথমে এই তিন দেবদূতের স্তুতি-নিবেদন—মিকায়েল এঁদের মধ্যে মর্যাদায়

শ্রেষ্ঠ। রাফায়েল গাইলেন জ্যোতিষ্ক ও আলোকের মহিমার গান—সৃষ্টির প্রভাতে তারা যেমন উজ্জ্বল ছিল, আজো তেম্‌নি উজ্জ্বল :

সূর্য গায় তার অনাদি গান
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে প্রতিযোগী হ'য়ে :
বিশ্বচরাচরে তার নির্ধারিত পন্থায়
পদক্ষেপ করে' চলে বজ্র-বিক্রমে।
দেবদূতগণ তার দিব্য আনন থেকে
লাভ করে বীর্য অন্তহীন,
জ্ঞান-অগম্য মহাসৃষ্টি
তেম্‌নি দীপ্ত যেমন আদিম প্রভাতে।

গাব্রিয়েল গাইলেন ধরণীর তূর্ণগতি, দিবারাত্রির সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য, সফেন সমুদ্রের কল্লোল ও পর্বতের স্থৈর্যের গান :

ধারণার অতীত তূর্ণ ছন্দে
আবর্তিত হয়ে চলে ধরিত্রীর প্রভা :
দিনের দিব্য-দ্যুতি আজো করে হরণ
রজনীর গহন ভয়াল অন্ধকার ঃ
সমুদ্র বিপুল ভঙ্গে হয় ফেনায়িত,
আঘাত হেনে চলে দৃঢ়মূল পর্বতে,—
ক্ষিপ্র অন্তহীন বিশ্ব-গতি চক্রে
উভয়ে ঘূর্ণিত হয় ত্বরিতে।

আর মিকায়েল গাইলেন বিচিত্র ঝঞ্ঝা ও জগদ্‌ব্যাপী ধ্বংসের তাণ্ডবের গান—এই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টি দেখতে কত শান্ত !

গর্জন করে' চলে বিচিত্র ঝঞ্ঝা
সমুদ্র থেকে স্থলে স্থল থেকে সমুদ্রে,
রচনা করে' চলে গহন শৃঙ্খল
চরাচরে বন্দী করে ভয়াল বীর্যে।
ধূ-ধূ ধূ জ্বলে সব দীপ্ত শিখায়
ছোটে যখন বজ্র সর্বধ্বংসী ;
তবু হে মহান্‌, তোমার সকল বার্তাবহ
ঘোষণা করে তোমার দিনের শান্তি।

আর এই তিন দেবদূত সমস্বরে গাইলেন :

বোঝে না আজো তোমায় তবু দেবদূতগণ

বীর্য লাভ করে তোমা থেকে ;
তোমার সৃষ্টি আজো তেমনি দীপ্ত
যেমন দীপ্ত ছিল সৃষ্টির প্রভাতে।

ভাব গাম্ভীর্যে এই দেবদূতদের স্তব বিশ্বসাহিত্যে বিখ্যাত। কবি শেলী এর যে ইংরেজি অনুবাদ করেছেন সেটিও প্রসিদ্ধ।

দেবদূতদের স্তবের পরে মেফিস্‌টোফিলিসের উক্তি ; প্রথম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে তার বক্র ভঙ্গি :

প্রভু, তুমি আবার অনুগ্রহ করে'
জানতে চেয়েছ আমাদের দিন কেমন কাটছে,
আবার আমাকে ডেকেছ,
তাই উপস্থিত হয়েছি তোমার দাসদের মধ্যে।
মাফ কোরো, এঁদের উদাত্ত গম্ভীর সুরে সুর মেলানো
আমার সাধ্য নয়, সেজন্যে আমি অবশ্য এঁদের দ্বারা তিরস্কৃত।
আমার করুণ দশা নিশ্চয় তোমার করুণার উদ্রেক করতো
যদি হাসি তামাসা বহুপূর্বে তোমাতে লোপ না পেত।
সূর্য,নক্ষত্র,রকম-বেরকমের জগৎ, এদের সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার নেই,
মানুষ নিজেকে কত অসুখী করেছে—আমি ভাবি শুধু সেই কথা।
এই ক্ষুদ্র ভুবনেশ্বরটি আজো চলেছে তার প্রাচীন পথে,
আজো তেম্‌নি খেয়ালী সে যেমন ছিল সৃষ্টির প্রভাতে।
জীবনে হয়ত আর একটু সুখ সে পেতো
যদি তোমার দেওয়া স্বর্গীয় জ্যোতি তার ভাগ্যে না জুটতো।
এর নাম সে দিয়েছে বিচার-বুদ্ধি—এর থেকেই বেড়েছে তার ক্ষমতা
যে কোনো পশুর চাইতে আরো বড় দরের পশু হবার।
আমার শতকোটি নমস্কার তোমার সামনে—এই জীবটিকে মনে হয়
এক লম্বাঠ্যাং ফড়িং,
লাফিয়ে সে ওড়ে, আর উড়ে সে লাফায়,
ঘাসের দলে পড়ে ভাঁজে সেই একই সুর।
যদি সেই ঘাসের মধ্যেই মুখ গুঁজে সে পড়ে থাকতো।
যেখানে যে গোবরের তাল পায় তাতেই ঢুকিয়ে দেয় তার নাক।

বিশ্বপ্রভু পরম মোহন ভঙ্গিতে বল্লেন :

তাহলে এর চাইতে আর বেশী কিছু তোমার বলবার নেই ?

এসেছ চিরদিনের মতো শুধু অভিযোগ জানাতে ?
পৃথিবীতে কোনো দিনই ভাল কিছু পড়বে না তোমার চোখে ?

মেফিসটো বল্লে—ভাল কিছুই তার চোখে পড়ে না ; মানুষের যা দশা তাতে তাকে আরো দুঃখ দিতে তারো মনে বাধে। বিশ্বপ্রভু তখন তাকে ফাউসটের কথা বল্লেন, বল্লেন সে তাঁর অনুগত সেবক। মেফিসটো বল্লে :

তা বটে ! তোমার সেবা সে করে' চলেছে কিছু অদ্ভুত ভাবেই।
মর্ত্যের খাদ্য ও পানীয় এই নির্বোধের রুচিকর নয়,
তার খেয়াল ছুটেছে দূরে দূরান্তে ;
অর্ধসচেতন সে তার এই পাগলামি এই অতৃপ্তি সম্বন্ধে ;
আকাশ থেকে সে চায় উজ্জ্বলতম তারকা,
মর্ত্য থেকে চায় নিবিড়তম উন্মাদনা,
নিকট ও দূরের যত কাম্য
কিছুর দ্বারাই প্রশমিত হয় না তার বুকের বিক্ষোভ।

বিশ্বপ্রভু বল্লেন :

তার সেবা যদিও আজো দিশাহারা
ত্বরিতে নিয়ে যাব আমি তাকে নির্মল আলোকে :
গাছে নতুন পাতা দেখা দিলেই মালীর চোখে ভাসে
ভবিষ্যতের ফুল ও ফলের ছবি।

মেফিসটোফিলিস নিজের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, বল্লে—

কি বাজি রাখবে বল ? তোমার পথ থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া
এখনো সম্ভবপর, যদি আমাকে পুরোপুরি অনুমতি দাও
ধীরে সুস্থে তাকে নিয়ে আসতে আমার পথে।

বিশ্বপ্রভু বল্লেন :

যতদিন সংসারে সে আছে
ততদিন নিষেধ নেই তোমার ;
মানুষ ভুল করবেই যতদিন চলবে তার চেষ্টা।

মেফিসটোর ধারণা বদলালো না। সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে তাকে এমন সুযোগ দেবার জন্যে। বিশ্বপ্রভু তখন বল্লেন—

তাকে রসাতলে নেবার যত চেষ্টা পার কর,
কিন্তু শেষে লজ্জিত হয়ে তোমাকে বলতে হবে—
সৎলোক তার দিশাহারা দশায়ও
অন্তরে অন্তরে অনুভব করে সত্য পথ।

বিশ্বপ্রভু মেফিসটোকে বল্লেন—অস্বীকৃতি-পরায়ণ আত্মা—the spirit that denies—অর্থাৎ মানুষ বা জগতের মহত্তর সম্ভাবনায় সে অবিশ্বাসী, সে শুধু পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি; বল্লেন, তার মতো বাচাল পাপীর প্রতি তাঁর কখনো ঘৃণার উদ্রেক হয় না; মানুষ সম্বন্ধে বললেন:

মানুষের কর্ম্মের উদ্দীপনা সহজেই আসে মন্থর হয়ে,
খোঁজে সে নির্বাধ বিশ্রাম;
সেজন্যে ইচ্ছা করে'—দিই তাকে এমন সঙ্গী
যে অস্থির করে, উত্তেজিত করে, সৃষ্টি করে চলে—শয়তানের মতো।

আর দেবদূতদের লক্ষ্য করে' বল্লেন:

সত্যপরায়ণ ঈশ্বরের পুত্রগণ! তোমরা হও কর্তব্যরত,
ভোগ কর মহৈশ্বর্যময় চিরজাগ্রত সৌন্দর্য!
যে বিকাশ-ধর্ম্ম রয়েছে চির-সক্রিয়,
তার অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে হও বন্দী,
যে সব চপল রূপের উদয় বিলয় হচ্ছে তোমাদের চতুর্দিকে
যে-সবকে দান কর স্থায়ী রূপ অবিনশ্বর ভাবের সহায়তায়।

এর পর স্বর্গের দৃশ্যের উপরে যবনিকা পতন হলো; দেবদূতগণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। মেফিসটোফিলিস একা একা বল্লে—

বুড়োর কথা শুনতে সময় সময় মন্দ লাগে না,
তখন চলিও খুব সভ্যভব্য হয়ে;
এত বড় কর্তার পক্ষে এ খুব সৌজন্যের পরিচয়
যে শয়তানের সঙ্গে এমন সহৃদয় বাক্যালাপ তিনি করেন।

এই স্বর্গে প্রস্তাবনা সম্পর্কে বাইবেলের Jobএর (আইয়ুব নবীর) কাহিনী সহজেই মনে পড়ে।—এর বিরুদ্ধে কোনো কোনো বড় সাহিত্যিক—কোলরীজ তাঁদের অন্যতম—এই অদ্ভুত অভিযোগ এনেছিলেন যে এতে ভগবানের সামনে শয়তানের এমন ঔদ্ধত্য দেখিয়ে ধর্মভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। লুইস দেখাতে চেষ্টা করেছেন, মধ্যযুগের লোক-নাট্যের মধ্যেও ভগবানকে নিয়ে এমন ব্যঙ্গবিদ্রূপ অপ্রচলিত ছিল না—(কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার মতো)। বলা বাহুল্য গোটে এখানে তাঁর কাহিনীর পৌরাণিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছেন মুখ্যত।

বিশ্বপ্রভুর উক্তির শেষ ক'টি ছত্রে সত্য ও সৌন্দর্যের যে অপূর্ব ধ্যান প্রকাশ পেয়েছে তা এক হিসাবে গোটের জ্ঞানবত্তার চরম কথা। ফাউস্ট দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে আবার এই ধরণের চিন্তার সাক্ষাৎ আমরা পাব। এই সদাসক্রিয় বিকাশ-ধর্মের দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল যেমন তাঁর সাহিত্য, তেমনি তাঁর ব্যক্তিত্ব।

লুইস বলেন, নান্দীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে বিরাট সংসার-যাত্রার ছবি, আর স্বর্গে প্রস্তাবনার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে এতে রূপায়িত হয়েছে মানুষের আত্মিক সংগ্রাম। এই স্বর্গে প্রস্তাবনার দ্বারা ফাউস্ট প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে—যদিও এই দুয়ের রচনা ও প্রকাশের মধ্যে কালের ব্যবধান সুদীর্ঘ। ফাউস্ট যে মূলত বিরাট সংসার-জীবনের আলেখ্য, তারই মধ্যে স্থান পেয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের বিশ্লেষণ, এই বড় কথাটা মনে না রাখলে ফাউস্টের মর্যাদা উপলব্ধি সম্ভবপর নয়।

এর পর মূল নাটক আরম্ভ হচ্ছে। এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কালে রচিত। বিশেষ করে' প্রথমে ফাউস্ট-পরিকল্পনার মূলে ছিল জ্ঞানের স্বল্পতায় অসন্তোষ ও মধ্যযুগের জাদুবিদ্যার সহায়তায় প্রকৃতির রহস্যের পূর্ণ উপলব্ধি ও জীবনে পূর্ণ উপভোগ; কিন্তু পরে এর উপজীব্য হয়েছে মানুষের অন্তর-প্রকৃতির অনন্ত অতৃপ্তি ও সীমাহীন অগ্রগতি—যা রূপ পেয়েছে চতুর্থ দৃশ্যে ফাউসট ও মেফিসটোর মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তিতে। এই দুই ভাবের অসঙ্গতি যে কোনো কোনো ছত্রে বিদ্যমান সমালোচকরা তা দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন। তবে এর বিভিন্ন-কালে-রচিত অংশসমূহের সমবায়ে কবি যে মোটের উপর একটি অখণ্ড কাব্য দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছেন, তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। ক্রোচে এর বিভিন্ন অংশের মনোহারিত্ব দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন বেশী। তাঁর কাব্য-বিচারের একটি মূল সূত্র হচ্ছে All art is lyrical সমস্ত শিল্পই মূলত সঙ্গীতধর্মী, তাই ভাবের নিবিড়তা ও শ্রেষ্ঠ রূপ-সৃষ্টির সন্ধান তিনি করেন সমগ্র কাব্যে তত নয় যত এর বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন ভাব-মুহূর্তে। ক্রোচের এই মত অবশ্য সর্ববাদিসম্মত নয়, তবে এতে সত্যের পরিমাণ যে যথেষ্ট, অনেকের মতো আমাদেরও ধারণা তাই; সেই সঙ্গে কাব্যের সমগ্রতার দিকে ক্রোচের চাইতে আর একটু বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। কিন্তু এসব আলোচনা পরে হবে।

প্রথম দৃশ্য

ফাউসট প্রথম খণ্ড অঙ্কে বিভক্ত নয়, পঁচিশটি দৃশ্যের সমষ্টি। প্রথম দৃশ্য ফাউসটের পাঠাগার—উচ্চছাদবিশিষ্ট অপ্রসর 'গথিক' কক্ষ, ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত মধ্যযুগের বিচিত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, সে-সবের মধ্যে রয়েছে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পুরোনো হাড়। ফাউসট তার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে'—তাকে দেখাচ্ছে অস্থির। তার বিখ্যাত স্বগতোক্তি আরম্ভ হ'লো:

অধ্যয়ন সাঙ্গ করেছি—হায়—দর্শন,
আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যা,
হায় ভাগ্য—ধর্মশাস্ত্রও—

এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একান্ত যত্নে !
কিন্তু এত বিদ্যা আয়ত্ত করেও হয়ে আছি অধম নির্বোধ,
জ্ঞান বাড়লো না কণামাত্রও।
নাম পেয়েছি আমি—আচার্য—অধ্যক্ষ,—
এই দশ বৎসর ধরে', বহু দুঃখে,
উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে যথা ইচ্ছা,
নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে এসেছি আমার শিষ্যদের,—কিন্তু বুঝেছি
আসলে জানা যায় না কিছুই !
এই জ্ঞানে দগ্ধ হচ্ছে আমার অন্তর।
নিঃসন্দেহ আমি বেশী তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেই স্থূলবুদ্ধি দলের চাইতে
যাদের বলা হয় আচার্য, অধ্যক্ষ, ব্যাখ্যাতা, প্রচারক ;
সঙ্কোচ ও দ্বিধা আর দুর্বল করে না আমার মন,
নরক ও শয়তান আর কম্পিত করে না আমার বুক ;
কিন্তু তাতে আনন্দহীন হয়ে পড়েছে আমার হৃদয়।
আশা করতে পারিনা আর যে বাস্তবিকই কিছু জানা যায়।
আশা করতে পারি না আর যে শিক্ষার সাহায্যে
মানুষকে কর' যায় উন্নত, করা যায় পরিবর্তিত।
ভূমি ও বিত্তেরও অধিকারী নই আমি,
সংসারে নেই আমার কোনো সমারোহ, কোনো কর্তৃত্ব,—
এমন দগ্ধ অদৃষ্ট দুর্বহ কুকুরের জন্যও।
তাই আশ্রয় নিচ্ছি জাদু-বিদ্যার,—
হয়ত সন্ধান পেয়ে যাব বহু রহস্যের
দেবযোনিদের শক্তিতে অথবা বাণীতে :
রক্ষা পাব তাহলে যা বুঝি না তার আবৃত্তি থেকে,—
হয়ত তাহলে পাব সেই গূঢ়তম শক্তির সন্ধান
যার দ্বারা বিধৃত ও চালিত বিশ্বজগৎ ;
সন্ধান পাব বিশ্বজগতের বীজ-কারণের, তার সৃষ্টিধর্মের ;
ফাঁকা কথার ব্যবসায় তাহলে পারবো পরিহার করতে।

এমন সময়ে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো আকাশের চাঁদের দিকে, সে বল্লে—

…তোমার বিষণ্ণ আঁখি , ওগো বন্ধু,
দেখেছে আমাকে গ্রন্থ পাঠে নিবদ্ধ ;
তার চাইতে যদি তোমার দিব্য আলোকে

দাঁড়াতে পারতাম গিরিমালার শীর্ষে,
পর্বতের কন্দরে কন্দরে ফিরতাম দেবযোনিদের সঙ্গে,
তোমার ধূসর আলোকে ভাসতে পারতাম মাঠে মাঠে,
পূতিগন্ধ জ্ঞান-বাষ্প থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে
যদি নবীভূত হতে পারতাম তোমার শিশির-স্নানে!

কিন্তু এই উন্মুক্ত জগতের পরিবর্তে ফাউস্ট বন্দী তার বহু শতাব্দীর পাঠাগারে; তার বহুচিত্রিত শার্সির ভিতর দিয়ে আলোক প্রবেশ করে কষ্টে, কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথির স্তূপ জমেছে সেখানে ছাদ পর্যন্ত, তারই সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে পুরুষপরম্পরা-সংগৃহীত বিচিত্র আকৃতির যন্ত্রপাতি। ফাউস্ট বলছে—

হায়, এই আমার জগৎ!

অধীর হয়ে সে খুললে মধ্যযুগের বিখ্যাত জ্যোতিষী নোসত্রাদামুস-এর (১৫০৩-১৫৬১) গ্রন্থ। নোসত্রাদামুস ও তাঁর পূর্বে মধ্যযুগের আরো অনেক জ্ঞানী বিশ্বজগতকে ভাগ করেছিলেন তিন স্তরে—মর্ত্য, স্বর্গ, অতি-স্বর্গ, (ভারতীয় ভূর্ভুবঃ স্বঃ তুলনীয়)। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের কক্ষ পর্যন্ত মর্ত্য-লোক, সূর্য ও নক্ষত্রের জগৎ হচ্ছে স্বর্গলোক, আর তার ঊর্ধ্বে অতি-স্বর্গ বা দিব্য লোক। ইতালীয় ভাবুক Pico Di Mirandalo (১৪৬৩-১৪৯৪) এই তিন জগতের নাম দেন Macrocosm (বৃহৎ জগৎ) আর মানুষ সম্বন্ধে বলেন:

"এই তিন জগতের সঙ্গে আছে আর একটি জগৎ, নাম Microcosm (ক্ষুদ্র জগৎ), তার মধ্যে আছে এই তিন জগতের সব কিছু। এই জগৎ হচ্ছে মানুষ, তাতে আছে—ভৌতিক উপাদানে নির্মিত দেহ, স্বর্গীয় চেতনা, বিচারবুদ্ধি, পরম নির্মল আত্মা, আর ঈশ্বরের সাদৃশ্য।" নোসত্রাদামুসের বই খুলে ফাউস্ট দেখলে Macrocosm (বৃহৎ জগতের) চিহ্ন; বিশ্বরহস্যের এমন ব্যাখ্যায় সে অন্তরে অনুভব করলে অপরিসীম আবেগ ও উদ্দীপনা, পড়লে নোসত্রাদামুসের এই চার ছত্র:

সূক্ষ্ম জগৎ পড়ে আছে নির্মুক্ত;
তোমার চেতনা অর্গলবদ্ধ, তোমার হৃদয় মৃত;
ওঠো জাগো হে জ্ঞানার্থী, ছুটে চল,
ধৌত কর তোমার মাটিমাখা অন্তর প্রভাত লালিমায়।

কিন্তু "ক্ষুদ্র" ও "বৃহৎ"-এর এই সব বিচিত্র তত্ত্ব সম্বন্ধে সে মন্তব্যও করলে—
কি মহিম দৃশ্য! কিন্তু হায় শুধু দৃশ্য।
বিশ্বপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করে' সে বল্লে—

ওগো অসীমা প্রকৃতি, তোমাকে কেমন করে' নেব আপনার করে'?
ওগো স্তন্যধারা, ওগো অস্তিত্বের আদি উৎস,

স্বর্গ ও মর্ত্যের নির্ভর,
তোমাকে মিনতি জানায় বিশীর্ণ চিত্ত,—
প্রবাহিত হচ্ছ তুমি, পোষণ করছ তুমি ; আর আমি মরবো দুঃখে ?

অধীর আগ্রহে বইখানির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফাউস্টের চোখ পড়লো ভূমি-দেবতার চিহ্নের উপরে। তাকে সে জ্ঞান করলে মানুষের নিকটতর শক্তি। তার মতো মহিমময় হবার আকাঙ্ক্ষা তার অন্তর অধিকার করলো। পরম আগ্রহে এই দেবতাকে স্মরণ করে' সে মন্ত্র উচ্চারণ করলে। এক উজ্জ্বল শিখা জ্বলে উঠ্‌লো, সেই শিখায় দেখা দিল দেবতা।

কিন্তু দেবতার ভয়াবহ মূর্তি দেখে ফাউস্টের শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার এমন দশা দেখে দেবতা তাকে বিদ্রূপ করে' বল্লে—

....তুমি সেই (মহিমাকাঙ্ক্ষী) আমার সামনে
কাঁপচে যার অস্তিত্বের তলদেশ পর্যন্ত,
এক কুণ্ডলীবদ্ধ কৃমি ?

তখন খুব সাহসের সঙ্গে ফাউস্ট বল্লে—

অগ্নিমূর্তি, তোমাকে ভয় করবো আমি ?
আমি ফাউস্ট, তোমার সমকক্ষ।

দেবতা তার পরিচয় দিয়ে বল্লে, সে জীবন-প্রবাহ—অনন্ত পরিবর্তন অনন্ত প্রয়াস তার রূপ—সেই পরিচ্ছদ ধারণ করে' শোভা পান বিধাতা। ফাউস্ট বল্লে, সেও তারই মতো চির-প্রয়াসী। তখন দেবতা বল্লে :

তুমি তার মতো যাকে বোঝো,
আমার মতো নও।

এই বলে' দেবতা অন্তর্হিত হলো। ফাউসট বিহ্বল হয়ে বল্লে :

তোমার মতো নই !
কার মতো তবে ?
আমি, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
তোমার মতনও নই !

এমন সময়ে দরজায় ঘা দিলে ভাগ্‌নার—ফাউস্টের সেবক ও শিষ্য। ফাউস্ট তার পরম উদ্দীপনার ক্ষণে এমন বাধা পেয়ে একান্ত বিরক্তি বোধ করলে। ভাগ্‌নার প্রবেশ করলে মধ্যযুগীয় বিদ্যার্থীর চোগা-চাপকান পরে', তার মাথায় নৈশ শিরস্ত্রাণ, হাতে প্রদীপ।—ভাগনার গ্যেটের এক বিখ্যাত সৃষ্টি। সে একান্ত দীপ্তিহীন—কেতাবকীট ; সাধুসংকল্প, শ্রদ্ধাবান্‌, কঠোর পরিশ্রমী সে—পুরোনো পুঁথি ঘাঁটা যেন তার

জীবনের পরমার্থ। জ্ঞানে ফাউস্টের একান্ত অবিশ্বাস, কিন্তু পুস্তকগত জ্ঞানে ভাগনারের সংশয়মাত্র নেই। সে বল্লে—

অপরাধ নেবেন না—আপনার আবৃত্তি শুনলাম,
আপনি নিশ্চয়ই গ্রীক নাটক আবৃত্তি করছিলেন ?
আমার বাসনা এ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করি
কেননা বর্তমানে এর চাহিদা হয়েছে।
অনেকের মুখে শুনেছি, ধর্মপ্রচারকের
নটের কাছ থেকে শিখবার আছে।

ফাউস্ট বল্লে—

হাঁ, যখন ধর্মপ্রচারক স্বভাবত নট,
কখনো কখনো এমন ঘটে।

ফাউস্টের বিদ্রূপ ভাগনারের অবোধ্য। সে বল্লে—

সারা বৎসর ধরে' পড়তে পড়তে মনে হয় একান্ত বন্দী আমি,
ছুটির দিনেও নেই মুক্তি,
জগৎকে দেখি যেন কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে,—
কেমন করে' সেই জগৎকে জয় করা যাবে বাগ্মিতার দ্বারা ?

ফাউস্ট বল্লে—

সেই জয় কখনো ঘটবে না তোমার ভাগ্যে যদি অনুভূতি না জাগে,
যদি অন্তরাত্মা থেকে উৎসারিত না হয় সেই অনুভূতি –
আদিম, অকৃত্রিম,—বলের দ্বারা
যা জয় করে নেয় শ্রোতার মন।
চলতে পার জোড়াতালি দিয়ে,
এখানকার খোসা ওখানকার টুক্‌রা কুড়িয়ে আয়োজন
করতে পার ব্যঞ্জনের,
ভস্মস্তূপে ফুৎকার দিয়ে
চেষ্টা করতে পার আগুন জ্বালাতে !
তাতে তাক লাগাতে পারবে শিশুর দলের, বাঁদরের দলের ;
যদি তাতে খুশী হতে চাও—ভাল।
কিন্তু কখনো অন্তর দিয়ে অন্তর স্পর্শ করতে পারবে না
যদি তোমার নিজের অন্তর না হয় প্রদীপ্ত।

অন্তরের আবেগ, উদ্দীপনা, এ সব ভাগনারের জন্য দুর্বোধ্য। সে বোঝে কঠোর পরিশ্রমে প্রাচীন পুঁথির অর্থ উদ্ধার করা, আর তা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাই ;

তার দুঃখ, এজন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না—আয়ু স্বল্প। তার কথায় ফাউসট বল্লে—

তাহলে পুঁথির পাতাই তোমার জন্য পূত উৎস-ধারা,
তার বারি পান করে' মেটে তোমার পিপাসা!
অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে ধারা উৎসারিত না হয়
তা ত নয় জীবনদায়িনী সুধা।

ভাগনার বিনীত হয়ে বল্লে—

অপরাধ নেবেন না, বড় আনন্দ বোধ হয়
অতীতের ভাব-জগতে নিজেকে নিয়ে যেতে,
বুঝে দেখতে আমাদের বহু পূর্বে কোনো জ্ঞানী কি কথা ভেবেছেন,
আর তাঁর সেই চিন্তাধারা আজ কি মহৎ উৎকর্ষ লাভ করেছে।

ফাউসট বিদ্রূপ করে' বল্লে—

উৎকর্ষ লাভ করে' আকাশের তারা পর্যন্ত উঠেছে।

তারপর সে ভাগনারকে বোঝাতে চেষ্টা করলে—

শোনো বন্ধু, যে সব যুগ গত হয়ে গেছে
সে সব হচ্ছে সাত সিল মেরে' বন্ধ করা বইয়ের মতো;
যার নাম দিচ্ছ অতীতের ভাবরাজি
সে-সব আলোচকদের ভাব ভিন্ন আর কিছু নয়,
অতীত হয় তাতে প্রতিবিম্বিত।
কখনো কখনো সেইসব দৃশ্যে ব্যথিত হয় অন্তরাত্মা।
দেখেই যেতে হয় পালিয়ে;
যেন জঞ্জাল ও আবর্জনার স্তূপ;
বড়জোর তাকে বলতে পার এক খেলা—
কথা উপদেশ সব গুরুগম্ভীর,
শোভা পায় পুতুল-নটেরই মুখে।

ফাউসটের কথায় ভাগনার কেবলই দিশাহারা হচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধায় তার কমতি নেই, সে বল্লে—

কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, মানুষ, মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক!
এ সবের কথা একটু আধটু বুঝতে চায় সবাই।

ফাউসট বল্লে—

হাঁ বুঝতে চায় মানুষের সমাজে যা জ্ঞান নামে
প্রচলিত সেই চিজ।

ছেলের আসল নাম কে প্রকাশ করে সদরে ?
দুইচার জন যারা বাস্তবিকই কিছু বুঝেছিল,
চায়নি কিছু গোপন করতে, নির্বুদ্ধির মতো অকপটে
সবাইকে ডেকে বলেছিল মনের কথা
তাদের চড়ানো হয়েছে ক্রুশে আর পোড়ানো হয়েছে আগুনে।
তাহলে বন্ধু, রাত হয়ে গেছে অনেক,
এইবার শেষ হোক আমাদের আলাপ।

ভাগনার খুশী হয়ে বল্লে—

আপনার সঙ্গে আনন্দে রাত জেগে
জ্ঞানগর্ভ আলাপ করতে কত আনন্দ পাই !
কাল ঈস্টারের দিন—ছুটি,
আমি কিন্তু অনুমতি প্রার্থনা করে' রাখছি দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার।
একান্ত বাসনা আমার পণ্ডিত হব,
জেনেছি বহু, কিন্তু, জানতে চাই সব।

ভাগনার চলে গেলে ফাউস্টের দীর্ঘ স্বগতোক্তি আরম্ভ হলো—

তাকেই কখনো ত্যাগ করে না সব আশা
অসার বস্তু প্রাণপণে আঁকড়ে থাকায় যার আনন্দ।
লুব্ধ হয়ে হাৎড়ে সে ফেরে গুপ্ত ধন,
আর হাতে কেঁচো ঠেকলে লাফিয়ে ওঠে স্ফূর্তিতে।

কিন্তু ধরিত্রীর এই "দীনতম নির্বুদ্ধিতম সন্তানে"র প্রতি সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে—কেননা ভূমি-দেবতার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে যখন তার বুদ্ধি বিহ্বল ও অন্তরাত্মা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল তখন ভাগনারের আগমনের ফলে সে ফিরে পেয়েছিল আপন সম্বিৎ। তার এখনকার নূতন চেতনা সম্বন্ধে সে বলছে—

নিজেকে জ্ঞান করেছিলাম ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
—যেন আয়ত্ত করেছি সত্যের স্বরূপ—
হচ্ছিলাম দিব্য আলোকে ও ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর,
হেলায় চেয়েছিলাম (আমার মধ্যেকার) মাটির মানুষের প্রতি ;
আমি যেন মহত্তর দেবদূতের চাইতেও, আমার নির্বারিত শক্তি
আনন্দে সঞ্চরণ করে' ফিরবে প্রকৃতির শিরায় শিরায়,
আনন্দময় সৃষ্টিতে উপভোগ করবো
দেবসত্তা—সেই আমার দশা দেখ !
একটি বজ্রবাণী ছিন্ন করেছে আমাকে আপন স্থান থেকে !

আর আমার সাহস নেই তোমার সঙ্গে নিজের তুলনা করি।
লাভ করেছিলাম তোমাকে নিকটে আকর্ষণ করবার শক্তি
কিন্তু তোমাকে আয়ত্ত করবার শক্তি নয়।
সেই পরম উদ্দীপনার মুহূর্তে
নিজেকে জ্ঞান করেছিলাম কত ক্ষুদ্র কত মহান্;
কিন্তু তুমি সবলে নিক্ষেপ করেছ আমাকে
পুনরায় মানুষের অনিশ্চিত ভাগ্যের 'পরে।
কোন্ পথ করবো বর্জন? কার নির্দেশ করবো গ্রহণ?
অবলম্বন করবো কি সেই (পুরাতন) দ্বন্দ্ব-সংঘাত?
হায়, যেমন প্রতি দুঃখ তেম্নি প্রতি কর্ম
ব্যাহত করে জীবনের গতি। *

অন্তরাত্মার যা মহত্তম ভাবনা
তারো সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হীন চিন্তা
সংসারে যাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ তা যখন লাভ হয়
তখন শ্রেষ্ঠতরকে মনে হয় প্রতারণা ও মিথ্যা।
আমাদের সুমহৎ ভাবনা, জীবনের সম্পদ ও শোভা—
সংসারের দ্বন্দ্ব-কোলাহলে হয় মূক, নিষ্প্রাণ।
আশাময়ী কল্পনা হয়ত একদা দুঃসাহসে ভর করে'
তার কামনাকে করেছিল অনন্ত-অভিসারী,
কিন্তু আজ সে পরিতুষ্ট সংকীর্ণ পরিসরে—
যেহেতু সময়ের আবর্তে বিধ্বস্ত হয়েছে বহু সৌভাগ্য।
দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছে আমাদের মর্মমূলে:
তা দিয়ে চলেছে সে গোপন দুঃখরাজী,
অস্থিরচিত্ত সে; পাশমোড়া দিচ্ছে, আন্দোলিত করছে আনন্দ ও শান্তি।
নতুন নতুন মুখোস পরে' আসছে সে—
আসছে গৃহ বিত্ত স্ত্রী সন্ততির রূপে,
আসছে প্লাবন অগ্নি বিষ ঘাতকের অস্ত্রের রূপে;
বেশী ভয় আমাদের সেই সব বিপদের যা ঘটে না কখনো
হারাবো না যা কোনোদিন মরি তার শোকে কেঁদে!
দেবতার মতো নই আমি! বুঝেছি সে কথা মর্মে মর্মে;
আমি বরং কৃমি কীট—ধূলায় যে আছে লুটিয়ে,

ধূলায় কাটাচ্ছে জীবন, ধূলায় লাভ করছে জীবিকা,
ধূলায় হচ্ছে পিষ্ট সমাহিত পথিকের পাদস্পর্শে।

মানব-জীবনের ও মানব-প্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরতার চিন্তায় ফাউস্ট একান্ত দগ্ধ হলো। চারদিকেই সে দেখলে ব্যর্থতার চিহ্ন। বহু শতাব্দীর পুঁথিপত্র ত তাকে কেবল শিক্ষা দিচ্ছে, নিজের দুঃখ বাড়িয়ে চলাই মানুষের ভাগ্য, তারই মধ্যে কচিৎ কখনো নিঃসঙ্গ এমন কাউকে পাওয়া যায় যাকে বলা যায় সুখী। মড়ার মাথার খুলিকে লক্ষ্য করে' সে বল্লে—

ওগো শূন্যগর্ভ করোটি, কটমট করে' তাকিয়ে ত বলতে চাও—
তোমারও মস্তিষ্ক ছিল আমারই মতো অপরিচ্ছন্ন,
চেয়েছিল সে আলোকিত দিন, কিন্তু পেয়েছিল নিরানন্দ আলো-আঁধার,
জেগেছিল তাতে সত্যের তৃষ্ণা, কিন্তু গতি হয়েছিল তার ভুলের গহনে!

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও তার মনে হলো ব্যর্থতার চিহ্ন—

মধ্যদিনেও রহস্যময়ী
প্রকৃতি আছে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে যতই কর অভিযোগ;
তোমার মনের চক্ষে যদি না দেয় সে ধরা—
বৃথা তবে যত কল কব্জা ও হাতুড়ি।

তার মনে হলো তার পিতার আমলের যতসব যন্ত্রপাতি ও পুঁথিপত্র সে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছে অথচ সে-সবের ব্যবহার সে জানেনা বা করে না, সে-সবের ভার তাকে বহন করতে না হলেই হতো ভাল—

পূর্ব্বপুরুষ থেকে যা পেয়েছ
তাকে নতুন করে' অর্জন কর প্রকৃতই পেতে হলে।
যাতে কাজ দেয় না তা দুঃসহ বোঝা,
যে কাল যা সৃষ্টি করে তাতে মেটে সেই কালেরই প্রয়োজন।

এমন সময়ে তার চোখ পড়লো বিষের শিশির উপরে। তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। বুঝলে সে এর সাহায্যে মিটবে তার মনের যত জ্বালা। মনে হলো তার মৃত্যুর পরে সে জীবন সুরু করতে পারবে মহত্তর নির্মলতর ক্ষেত্রে। কিন্তু সে নিজেকে প্রশ্নও করলে—

এই দেবভোগ্য আনন্দ, এই মহৎ অস্তিত্ব,
লভ্য কি তোমার মতো কৃমির ভাগ্যে?

সে নিজের মনকে আরো সবল করলে—

হাঁ, উজ্জ্বলতর লোকে যাত্রার অভিপ্রায়ে
আমি পিঠ ফেরাচ্ছি পৃথিবীর মোহন সূর্য্যের পানে।

আমি ভেঙে খান খান করবো সেই দুয়ার,
আর সবাই যার পাশ কাটিয়ে চলে ভয়ে ভয়ে !
মানুষের মহিমা দেবতার উত্তুঙ্গ মহিমার স্পর্ধী
সময় হয়েছে এই বজ্রবাণী কাজ দিয়ে ঘোষণা করবার ;—
ভয় নেই সেই আঁধার অতলে ঝাঁপ দিতে
কল্পনা যাকে নিয়ে রচনা করে বিভীষিকা ;—
ভয় নেই সেই সঙ্কটের পানে অগ্রসর হতে
যার সংকীর্ণ পরিসর ঘিরে দাউ দাউ করে' জলে নরকের আগুন ;
সময় হয়েছে হাসিমুখে পা বাড়িয়ে দিতে
যদিও তাতে লাভ হয় তূর্ণ নিশ্চিত বিলয়।

সে নামিয়ে নিলে তার উজ্জ্বল কাচের পেয়ালা—যা তার বহু উৎসব-দিনের সাক্ষী ; স্মরণ করলে সেই সব বন্ধু-সম্মেলনের দিন, সেই সব সম্মেলনে পেয়ালার উপরে অঙ্কিত কারুকলার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। তারপর তাতে বিষ ঢেলে সে মুখে তুলে ধরলে। এমন সময়ে উত্থিত হলো ঈস্টারের আনন্দময় ঘটাধ্বনি ও সঙ্গীত।

দেবদূতদের সঙ্গীত—

খৃষ্ট হয়েছেন উত্থিত !
মরণপীড়িত তোমাকে নমস্কার—
ভাগ্যহীনেরা
অনুসরণকারীরা
পারবে কেন তোমাকে বন্দী না করে'।

এই পরিচিত পবিত্র সঙ্গীত তাকে স্পর্শ করলো।' মুখ থেকে সে বিষের পেয়ালা নামিয়ে নিলে। সে স্মরণ করলে খৃষ্টের দারুণ মৃত্যু-রজনীতে দেবদূতদের কণ্ঠে ভগবানের এই নূতন অঙ্গীকার।

তারপর ধ্বনিত হলো নারীদের শোক—তারা পরম যত্নে ধৌত করেছিল, সুবাসিত করেছিল, সজ্জিত করেছিল খৃষ্টের দেহ, সেই দেহ আর তারা দেখছে না !

এর পর দেবদূতদের দ্বিতীয় সঙ্গীত—

উত্থিত হয়েছেন খৃষ্ট !
জয় হোক প্রেমময়ের !
যে দুঃখ তাঁকে হেনেছিল আঘাত,

যে পরীক্ষা তাঁকে ফেলেছিল ফাঁদে,
সব অবসান হয়েছে মহিমায় !

ফাউস্‌ট বল্লে—

স্বর্গের সঙ্গীত ধ্বনি,
আমাকে কেন মুগ্ধ করতে এসেছ এই ধূলির 'পরে ?
ধ্বনিত হও বরং কোমল হৃদয়ের দেশে।
তোমাদের বাণী প্রবেশ করে আমার কর্ণে কিন্তু অন্তরে নেই ত প্রত্যয়।
প্রত্যয়ের প্রিয়তম সন্ততির নাম অঘটন।
যে দেশ থেকে আসছে এই আনন্দধ্বনি
সাহস নেই আমার মনের সেই দেশে বিচরণ করতে,
কিন্তু অভ্যস্ত হয়েছি এই ধ্বনিতে শৈশব থেকে,
নতুন করে' ডাকলো এই ধ্বনি আমাকে জীবনের পথে।

সেদিনে রবিবাসরের পূত স্তব্ধতায়
লাভ করতাম স্বর্গের চুম্বন ;
মন্থর ঘণ্টা বাজতো গম্ভীর রবে রহস্যময় শক্তি সঞ্চার করে',
প্রার্থনা ডুবিয়ে দিত আমাকে আনন্দ-সায়রে ;
অজানা পুলক
ডাক দিত কাননে কান্তারে,
বুক-ভরতো আনন্দে, অঝোরে ঝরতো উষ্ণ অশ্রু,
অনুভব করতাম অন্তরে নতুন জগতের জন্ম।
এই ধ্বনিতে সূচিত হতো তরুণ-তরুণীর আনন্দ-কৌতুক,
সূচিত হতো নব বসন্তের উৎসব ;
স্মৃতি ধরেছে আমাকে জড়িয়ে শিশুর মতো,
রোধ করছে আমাকে চরম সংকল্প থেকে।
বাজো বাজো স্বর্গের বাদ্য, এত মধুর এত কোমল।
অঝোরে ঝরছে অশ্রু—ধরণী ফিরে পেলো তার সন্তান !

এর পর খৃষ্টশিষ্যদের সঙ্গীত—

বিজয় গৌরবে
ভিন্ন করেছে সে কি কবর-বাস,
আসীন হয়েছে এখন পরম মহিমায় ?
বিকাশের আনন্দে

সমীপবর্তী সে কি স্রষ্টার আনন্দের ?
হায়, ধরণীর দুঃখ
আজো আমাদের ভাগ্য।
আমরা তোমার শিষ্যদল,
রয়ে আছি সংসারে ;
আঁখিজলে ভাসি আমরা ;
প্রভু, চাই তোমার পরম শান্তি !

এর পর দেবদূতদের তৃতীয় সঙ্গীত—

খৃষ্ট হয়েছেন উত্থিত,
গ্লানির গর্ভবাস থেকে।
ভেঙেছেন তোমার কারাগার
নিষ্ক্রান্ত হও তা থেকে !
অনুরাগে তাঁর মহিমা গাও,
কাজে দেখাও সেই প্রেম,
জ্ঞান করো সবে আপন ভাই,
ভাগ দাও সবে অন্নে,
সবার কানে দাও স্বর্গের আশ্বাস
যেখানে যে আছে দুঃখী,
প্রভু তোমার নিকটে !
দেখো তাঁকে জাগ্রত !

দ্বিতীয় দৃশ্য

শহরের ফটকের সামনে

শহর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে নরনারী ঈস্টারের দিনে। ইতস্ততঃ ছুটেছে তারা, লক্ষ্য তাদের স্ফূর্তি—মদ খাওয়া হল্লা নাচগান। সুসজ্জিত বেশে বেরিয়েছে তরুণী ঝি-রা, তাদের সঙ্গে নাচ্‌তে চাচ্ছে কলেজের ছোকরারা ; কলেজের ছোকরাদের টিটকারি দিচ্ছে মধ্যবিত্ত নাগরিক-কন্যারা তাদের এমন বিশ্রী রুচির জন্যে। ভিক্ষুক গান গেয়ে গেয়ে চাচ্ছে ভিক্ষা ; সৈন্যরা গেয়ে চলেছে—

উচ্চচূড় দুর্গ যত
প্রাচীর উঁচু যার,
উন্নাসিক কন্যা সব
শোভার বাহার,

ছুইই মোরা চাই—
লড়ি মোরা দুঃসাহসে
বেতন খাসা পাই।

....

ফাউস্‌ট্‌ বেরিয়েছে ভাগনারকে সঙ্গে নিয়ে। জনসাধারণকে এমন আনন্দরত দেখে সে বলছে—

বসন্তের প্রসন্ন দৃষ্টিতে
বরফের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে ঝরণা ও নদী ;
আশার রঙ লেগেছে উপত্যকায়,
বৃদ্ধ শীত এখন মুকুটহীন,
আশ্রয় নিয়েছে দুর্গম পর্বতে ;
...সূর্য ফোটাবে ধরণীতে তার প্রিয় রঙ,
লাল নীল হরিৎ ফুল দেখা দেয়নি এখনো,
সেই অভাব পূরণ করছে সে নরনারীর রঙ-বেরঙের পোষাকে।

তারা দাঁড়িয়েছিল এক উঁচু জায়গায়। ভাগনারের দৃষ্টি জনগণের দিকে আকৃষ্ট করে' ফাউস্‌ট্‌ বল্লে—

অন্ধকার ফটকের ভিতর দিয়ে
বেরিয়ে আসছে সুসজ্জিত জনগণ ;
আনন্দে বেরিয়ে আসছে সূর্যালোকে—
প্রভুর অভ্যুত্থানের উৎসব তাদের আজ !
অনুভব করছে তারা নিজেদেরও অভ্যুত্থান—
তাদের নীচু আঁধার বাস-অযোগ্য গৃহ থেকে ;
শ্রমের বন্ধন থেকে, দুশ্চিন্তা ও বিরক্তি থেকে ;
বদ্ধ ভবন থেকে
শহরের সংকীর্ণ গলিঘুঁজি থেকে ;
গির্জার গম্ভীর নৈশ উপাসনা থেকে
সবাই এখন উপস্থিত প্রসন্ন সূর্যালোকে।
দেখো দেখো কেমন ছুটেছে এরা
মাঠ ও বাগানের ভিতর দিয়ে দূরে দূরান্তে ;
নদীর প্রশস্ত মন্থর বুকে
ভাসছে অগণিত সুদৃশ্য খেয়াতরী,
ডুবু ডুবু বোঝাই নিয়ে

ছাড়লো শেষ নৌকা।
দূরের পাহাড়ী পথ বেয়েও
নামছে রঙ-বেরঙের পোষাক।
ঐ শোনো গ্রামের আনন্দ-কোলাহল—
এই-ই জনগণের স্বর্গ!
এখানে আনন্দনিরত ছোট বড় সবাই;
এখানেই অনুভব করি আমি মানুষ—এখানেই বটে।

ভাগনার বল্লে—

গুরুদেব, আপনার সঙ্গে পায়চারি করা সৌভাগ্য,
তা থেকে পাই সম্মান উপকার দুইই।
কিন্তু একা হলে আমি এখানে আসতাম না,
কেননা স্থূল সব-কিছুতে আমার বিতৃষ্ণা।
এই সব বেহালা-বাজনা, চীৎকার, লাফালাফি
—ইতর লোকদের এই হল্লা—আমি ঘৃণা করি;
এদের চেঁচামেচি শুনে মনে হয় এদের পেয়েছে শয়তানে;
এই সব এদের আমোদ, এদের গান!

এর পর কৃষকদের নাচ ও গান। উদ্দাম ভঙ্গিতে চল্‌লো তাদের প্রায় নির্দোষ স্ফূর্তি। নাচের শেষে একজন বৃদ্ধ কৃষক ফাউস্টের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে' বল্লে, তাঁর মতো পণ্ডিত যে তাদের উৎসবে পদার্পণ করেছেন এ তাঁর মহানুভবতার পরিচয়। সে ফাউস্টকে নিবেদন করলে তাদের সব চাইতে ভাল পাত্রে টাট্‌কা-ঢালা মদ, বল্লে—এই পাত্রে যত ফোঁটা মদ আছে তত দিনের আয়ু তাঁর লাভ হোক। ফাউস্ট ধন্যবাদ জানিয়ে ও এদের স্বাস্থ্য কামনা করে' পাত্র গ্রহণ করলে। কৃষক ফাউস্টের পিতার গুণগান করলে, কত রোগীকে তিনি রোগমুক্ত করেছিলেন সে কথা বল্লে—সেবার মড়ক লাগ্‌লে যুবক ফাউস্টও লোকদের কেমন আপ্রাণ সেবা করেছিলেন সে কথাও স্মরণ করলে, বল্লে, সেদিনে তিনি হয়েছিলেন যেন মঙ্গলদাতা ঈশ্বর। সবাই গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করলে। ফাউস্ট বল্লে—

মাথার উপরে যিনি আছেন তাঁকে নতি জানাও,
তিনিই সাহায্য করতে শেখান, সাহায্য পাঠান।

এদের পরিত্যাগ করে' কিছুদূর অগ্রসর হলে ভাগনার বল্লে—

মহাপুরুষ, আপনার মনে কি গভীর ভাবই না জেগেছে
জনগণের এই অকৃত্রিম সম্মান লাভ করে'!

কত ভাগ্যবান্ তিনি যাঁর প্রতিভা
যোগ্য করেছে তাঁকে এমন সম্মানের !
পিতা পুত্রের সসম্মান দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনার দিকে,
সবাই কৌতুহলী হয় আপনার সম্বন্ধে, ঘিরে দাঁড়ায় আপনার চারদিকে,
বেহালা থেমে যায়, নাচ আরম্ভ হয় দেরীতে,
আপনি এগোলেন তারা দাঁড়ালো সারি দিয়ে,
সবাই টুপি তুলে অভিবাদন করলে আপনাকে ;
আর একটু হলেই তেমন সম্মান দেখানো হতো
যেমন সম্মান ভক্তরা নতজানু হয়ে দেখায়
পবিত্র "দেহ ও শোণিত-সেবন" অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রার প্রতি।

আর একটু উপরে উঠে এক পাথরের উপরে তারা বসলো।

ফাউস্ট বল্লে—

চিন্তায় তন্ময় হয়ে এখানে একা একা কাটিয়েছি বহু দিন—
উপবাসে ও প্রার্থনায় তখন আমার জীবন হয়েছিল ক্লিষ্ট।
তখন ছিলাম আশায় সমৃদ্ধ ও প্রত্যয়ে বলীয়ান্,
সজল নয়নে দীর্ঘশ্বাসে কত আকুল প্রার্থনা জানিয়েছি
স্বর্গের দেবতার সমীপে
সেই দূরপ্রসারী মড়ক নিবারণের জন্যে !
জনগণের প্রশংসা এখন মনে হয় বিদ্রূপ ;
যদি দেখতে পেতে আমার মন তবে বুঝতে
এই প্রশংসার কত অযোগ্য জ্ঞান করি
পিতা পুত্র উভয়কেই
আমার সম্মানিত পিতার মস্তিষ্ক ছিল খেয়ালে ভরপুর,
সাধনায় ছিল না তাঁর ত্রুটি—কিন্তু নিজের ভঙ্গিতে।

তার পিতা ছিলেন সেইদিনের আল্‌কেমি-বিশারদ। বিচিত্রভাবে নানা বিরুদ্ধধর্মী দ্রব্যের মিশ্রণে তিনি তাঁর সহকারীদের নিয়ে কিরূপে ওষুধ তৈরী করতেন সে সব বর্ণনা করে' ফাউস্ট বলছে—

ওষুধ হতো প্রস্তুত—রোগীর সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হতো অচিরে।
"কে কে ভাল হলো"—সে প্রশ্ন করতো না কেউ।
এমনি ভাবে ভয়ানক সব ওষুধ তৈরি করে'
এই উপত্যকা আর পাহাড়ের অঞ্চলে
আমরা হয়েছিলাম মারীর চেয়ে ভয়াবহ।

আমার দেওয়া বিষে মরেছে হাজার হাজার লোক,
আর আজ আমাকে শুন্‌তে হচ্ছে যারা বেঁচে আছে তাদের মুখ থেকে
সেই নির্লজ্জ ঘাতকদের প্রশংসা।

ভাগনার বল্লে—

কেন দুঃখ পাচ্ছেন এই চিন্তায়?
নিপুণ ভাবে অবিচলিত অধ্যবসায়ে
পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে কাজে খাটানো ভিন্ন
মানুষ আর কি করতে পারে?

ফাউস্ট বল্লে—

সুখী সে যার অন্তরে আজো জাগে
ভুলের সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে ডাঙায় উঠ্‌বার আশা।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করে' সে তাকালে অস্তগামী সূর্যের মহিমার পানে—বাড়ীঘর, গাছপালা, পাহাড়ের চূড়া, সব কেমন রঞ্জিত হয়ে উঠেছে সেই দৃশ্যের দিকে। তার মনে কামনা জাগ্‌লো যদি আকাশে উড়বার পাখা তার থাকতো তাহলে এই অপূর্ব দৃশ্য তার জন্য হতো অফুরন্ত। সে বল্লে—

হায় যে পাখা মনকে ওড়ায় আকাশে
তার এমন শক্তি নেই যে দেহকে টেনে তুলবে।
তবু প্রতি আত্মায় কামনা জাগে
সুদূরের জন্যে—
যখন নিঃসীম আকাশ থেকে
ভেসে আসে চাতকের কলতান,
যখন পর্বতচূড়া ও দেওদারের মাথার উপরে
পাখা মেলে ভাসে ঈগল,
প্রান্তর হ্রদ ও দ্বীপের উপর দিয়ে
উড়ে চলে সারস দূরান্তের তীরে।

ভাগনার বল্লে:

আমার মনেও কখনো কখনো অদ্ভুত খেয়াল জাগে,
কিন্তু এমন খেয়াল জাগে নি কোনো দিন।
বন ও মাঠের দিকে তাকিয়ে শীগগিরই আসে ক্লান্তি,
পাখীর মতো পাখাতেও নেই আমার প্রয়োজন;
তা না হলে আনন্দে কেমন করে' সঞ্চরণ করতে পারি
পুঁথির পাতায় পাতায়, এক বই থেকে অন্য বইতে!

শীতের রাত্রি তখন হয় কত মধুর, তীব্র পুলক
সঞ্চারিত হয় প্রতি অঙ্গে! আর
যখন খুলে ধরি কোনো প্রাচীন ভুলট
তখন যেন স্বর্গ দেখি সামনে!

ফাউসট বল্লে—

কিছু পরিচয় পেয়েছে মনের একটি খেয়ালের,
অন্যটির কথা জানতে চেয়োনা কখনো!
হায়, আমার মধ্যে রয়েছে দুইটি মন,
একটি কেবলই বিরুদ্ধাচরণ করে অন্যটির।
একটি নিগূঢ় আসক্তিতে
জড়িয়ে ধরেছে জগৎ-সংসারকে,
অপরটি ধূলি-কুয়াসার স্তর সবলে ভেদ করে'
মাথা তুলতে চায় নির্মল আকাশে।

ফাউস্‌ট প্রার্থনা করলে নিকটে যদি আদেশপালনরত দেবযোনি থাকে তবে তারা তাকে নিয়ে যাক নূতনতর পূর্ণতর ক্ষেত্রে।—

যদি থাকতো আমার এমন মায়া-আবরণ
যার সাহায্যে যেতে পারতাম সেখানে খুশী,
তবে জগতের কোনো সম্পদের পরিবর্তে
—রাজার পোষাকের পরিবর্তেও—করতাম না তা বদল।

ভাগনার বল্লে, এমন ভাবে দেবযোনিদের ডাকা ভাল নয়, তাদের দ্বারা মানুষের নানা ব্যাধি নানা অনর্থ ঘটে। অন্ধকার হয়ে আসছিলো দেখে সে গৃহে ফিরতে চাইলে। এমন সময়ে ফাউস্‌টের চোখ পড়লা দূরের একটি কালো কুকুরের উপরে—সেটি তাদের দিকেই আসছিল। ফাউস্‌টের সন্দেহ হলো এটি কুকুর নয়, কিন্তু ভাগনার বল্লে এটি কুকুর ভিন্ন আর কিছুই নয়, শিক্ষা দিলে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

তৃতীয় দৃশ্য

ফাউস্‌টের পাঠাগার

কুকুর সঙ্গে নিয়ে ফাউস্‌ট প্রবেশ করলে।

রাত্রির বাণী-ভরা স্তব্ধতা ফাউস্‌ট অনুভব করছে, তার মনে জাগছে—

এমন সময়ে উৎকৃষ্টতর আত্মা জাগ্রত হয় আলোকের দেশে:
উদ্দাম বাসনা কামনা হয় শিথিল;

অন্তরে নতুন করে' জাগে মানব-প্রেম,
নতুন করে' জাগে ভগবৎ-প্রেম।
....আশা নতুন করে' হয় মুঞ্জরিত,
বিচার বুদ্ধি নতুন করে' হয় সবাক্;
সাধ যায় জীবন প্রবাহে ভাসতে,
জীবনের উৎস-মুখ খুঁজে পেতে।

কুকুর মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে' উঠছে তাতে ফাউস্ট বিরক্ত হচ্ছে, তাকে বলছে থামতে—এই চীৎকারে আহত হচ্ছে তার নবলব্ধ শান্তি।

কিন্তু সে দুঃখিত হয়ে অনুভব করলে তার সেই শান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সে ভাবলে অপৌরুষেয় বাণীর সহায়তায় সে ফিরে পাবে সেই শান্তি। এজন্যে খুলে নিলে নিউ টেস্টামেণ্ট আর তা থেকে অনুবাদ শুরু করলে তার মাতৃভাষা জার্মানে।

প্রথম লাইনটি নিয়েই সে মুস্কিলে পড়লো। "আদিতে ছিল শব্দ"—কিন্তু "শব্দে"র কি এত মর্যাদা! সে ভাবলে 'শব্দে'র পরিবর্তে বরং লেখা উচিত "চিন্তা"। কিন্তু আবার সে ভাবলে—চিন্তার কি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে? সে তখন ভাবলে লেখা যাক "আদিতে ছিল শক্তি।" পরক্ষণেই তার মনে হোলো হয়ত মূলের অর্থ প্রকাশ পেল না। সে নির্মলতর উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করলে আর খুশী হয়ে লিখলে—"আদিতে ছিল কর্ম।"

কুকুর আবার চীৎকার করে' উঠলো। ফাউস্ট অপ্রসন্ন হয়ে বল্লে...দরজা খোলা আছে বেরিয়ে যাও...। কিন্তু সবিস্ময়ে সে দেখলে কুকুর সিন্ধু-ঘোটকের মতো প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে—দেখতে কি ভীষণ! সে বুঝলো এ কোনো অপদেবতা। সে নানা মন্ত্র পাঠ করতে লাগলো। কুকুর ফুলতে ফুলতে হাতীর মতো প্রকাণ্ড হলো, শেষে হলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী—তা থেকে বেরিয়ে পড়লো এক ভ্রাম্যমান বিদ্যার্থী; ফাউস্টকে সে বল্লে—

এত গোল কেন? প্রভুর কি হুকুম?

এইই মেফিস্টোফিলিস।

ফাউস্ট তার নাম জিজ্ঞাসা করলে। সে বল্লে—

এ খুব নগণ্য ব্যাপার
...তার কাছে "শব্দে"র প্রতি যার এত বিতৃষ্ণা—
যে সমস্ত বাহ্য চাকচিক্য পরিহার করে'
দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে অস্তিত্বের গহনতার পানে।

ফাউস্‌ট তবু তার নাম জানতে চাইলে, সে কোন্ শ্রেণীর অপদেবতা তা জানবার জন্যে। মেফিস্‌টো বল্লে—

সে সেই দুর্বোধ্য শক্তির অংশ
যার অভিপ্রায় সব সময়ে মন্দ, কিন্তু করে সব সময়ে ভাল।

ফাউস্‌ট বল্লে—

এ হেঁয়ালির অর্থ ?

মেফিস্‌টো বল্লে :

আমি হচ্ছি সেই শক্তি যার কাজ অস্বীকার করে' চলা।
আর খুব সঙ্গত ভাবেই ; কেননা শূন্য থেকে
সবের উদ্ভব, সেই শূন্যেই মিলিয়ে দেওয়া চাই সব ;
বেশী ভাল হতো যদি সৃষ্টি আদৌ না হতো।
তোমরা যার নাম দিয়েছ পাপ—
ধ্বংস—অর্থাৎ যা কিছু মন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—
আমার অধিবাস সে-সবে।

ফাউস্‌ট বল্লে—

বলছ তুমি অংশ, কিন্তু দেখাচ্ছে ত তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ?

মেফিস্‌টো বল্লে—

যা সত্য তাই তোমাকে বলছি না বাড়িয়ে।
মানুষ—নির্বুদ্ধিতার "ক্ষুদ্র বিশ্ব"—চায় কিন্তু
নিজেকে পূর্ণাঙ্গ বলেই জানতে।
আমি অংশের অংশ, কিন্তু সেই অংশই আদিতে ছিল সব,
—আদিম রাত্রি—যা থেকে জন্মলাভ করেছিল আলোক—
সেই উদ্ধত আলোক আজ দাবি করছে সব জায়গা,
অধিকারচ্যুত করতে চাচ্ছে তার মাতা রাত্রিকে।
কিন্তু জিৎতে পারছে না যত চেষ্টাই করুক,
যুক্ত রয়েছে সে জড়দেহের সঙ্গেই :
নির্গত হচ্ছে জড়দেহ থেকে, জড়দেহকেই করছে সুন্দর,
জড়দেহই রোধ করছে তার গতি ;
তাই আমার বিশ্বাস, আর বেশী দেরী নেই,
জড়ের ধ্বংসের সঙ্গে ঘটবে তারও বিলোপ।'

ফাউস্‌ট বল্লে—

তোমার মহৎ উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারছি।

পুরো ধ্বংস ত সম্ভবপর হবে না তোমার দ্বারা,
তাই আরম্ভ করেছ অল্প দিয়ে।

মেফিসটো দুঃখিত হয়ে স্বীকার করলে এই ধ্বংসের কাজে এ পর্যন্ত সে তেমন কৃতকার্য হয়নি, বিশ্ব-সংসারের বেঁচে থাকবার শক্তি অদ্ভুত—

ভূমিকম্প ঝড় বন্যা আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস—
এ সবের পর আবার শান্তি নেমে আসে সমুদ্র ও ধরণীর পরে!
আর সেই জাহান্নামী জীবজন্তু আর মানুষের পাল!
কি হবে আর তাদের সঙ্গে খেলা করে'!
কত জনকেই না দিলাম সাবাড়!
কিন্তু আবার গজিয়ে ওঠে রক্তবীজের ঝাড়।

ফাউস্ট বল্লে

চিরন্তনী ভ াত্রী সৃজনী-শক্তির বিরুদ্ধে
নিষ্ঠুর ঘৃণায়
তুমি উত্তোলিত করেছ শয়তানী মুষ্টি,
বৃথা তোমার আস্ফালন!
বিপর্যয়ের অদ্ভুত সন্তান,
খুঁজে নাও বরং অন্য কোনো ব্যবসায়।

মেফিস্টো বল্লে—সে কথা পরে হবে, আপাতত সে চাচ্ছে বিদায়। সে বন্দী হয়েছে বুঝে ফাউস্ট তাকে ছাড়তে চাইলে না। কিন্তু মেফিস্টোর চেলারা বাইরে থেকে এক দীর্ঘ মন্ত্র আবৃত্তি করে' ফাউস্টকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে, সেই অবসরে মেফিস্টো পালিয়ে গেল। এই মন্ত্র এক দীর্ঘ ছেলেভুলানো ছড়া, এর দ্রুত ছন্দ-প্রবাহে ভেসে চলেছে ফল ফুল জল মেঘ ও আলোকিত আকাশের বিচিত্র দৃশ্য, সৌন্দর্য ও লালিত্যের বিচিত্র ইঙ্গিত—সেই সৌন্দর্য ও লালিত্য-প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে ফাউস্ট যেন ফিরে পাবে তার দেহ-মনের স্বস্তি। অনুবাদক বেয়ার্ড টেইলর বলেছেন, ছয় বৎসর ধরে' চেষ্টা করেও এর আশানুরূপ অনুবাদ তিনি দিতে পারেন নি, কেননা প্রধানত বাক্‌ভঙ্গি ও ছন্দ-লালিত্য অবলম্বন করে' ফুটেছে এর সৌন্দর্যের মায়া।

চতুর্থ দৃশ্য

ফাউটস্টের পাঠাগারে মেফিস্টো উপস্থিত হলো এক ফিটফাট ভদ্র যুবকের বেশে। ফাউস্টকে সে বল্লে—তেমনি সুসজ্জিত হয়ে এই গর্ত থেকে বেরিয়ে জগৎ দেখতে।

ফাউসট বল্লে—

বেশবিন্যাস যাই করি না কেন
জগতের দিকে তাকিয়ে পাব কেবল দুঃখ।
বিলাস-ব্যসনে যে সুখ পাব সে বয়স আমার নেই,
আর বুড়োও এত হইনি যে কামনা পেয়েছে লোপ।
জগৎ থেকে কি পাব ?
সে ত কেবল বলছে—
ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো !
... .
সংসার ত পূরণ করে না তার একটি আশ্বাসও !
... ...
আমার অন্তরে আছেন যে ঈশ্বর
তাঁর কাজ প্রতি মুহূর্তে সেই অন্তর মথিত করা,
আমার উপরে তাঁর সর্বস্বামিত্ব
কিন্তু সাধ্য নেই তাঁর প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা।
আয়ুর এই দুর্বহ ভারে পিষ্ট হয়ে
মৃত্যুকে মানি বরণীয়, জীবন অভিশপ্ত।

মেফিসটো বল্লে—

....তবু মৃত্যু পুরোপুরি কাম্য নয় কারো।

ফাউসট বল্লে —

অহো, ভাগ্যবান সে-ই জয়ের মুহূর্তে
যার ললাটে শোভা পায় শোণিতসিক্ত মাল্য।
হায়, যদি সেই মহীয়ান্ দেবযোনির সামনে
সেই পরম উদ্দীপনার মুহূর্তে নিঃশেষিত হতো আমার আয়ু !

মেফিসটো টিপ্পনী করলে—

কিন্তু সেই স্তব্ধ রাত্রিকালে
নীল-পানীয় † পান করতে চান নি কোনো মহাশয়।

ফাউসট বল্লে—

দেখছি আড়িপাতায় তোমার আনন্দ !

মেফিসটো বল্লে—

সবজান্তা নই আমি, তবে জানি অনেক কিছুই।

---

† ইংরাজীতে আছে brown

ফাউসট বল্লে—

সেদিন পরিচিত স্থরের মায়া
আকর্ষণ করেছিল আমাকে চিন্তার দিশাহারা ঘূর্ণিপাক থেকে,
শৈশব থেকে লালিত প্রত্যয়
প্রতারিত হয়েছিল মোহন প্রতিধ্বনির দ্বারা।
কিন্তু এখন ধ্বংস কামনা করি সব কিছুর—
অন্তরাত্মাকে যা জড়ায় মায়ায়,
উজ্জ্বল মধুর ছলনায়
রাখে তাকে বন্দী করে' দুঃখের কারাগারে।
প্রথমে ধ্বংস হোক উচ্চাকাঙ্ক্ষা
যা দিয়ে মন নিজেকে রাখে ভুলিয়ে!
ধ্বংস হোক যত মোহিনী মূর্তি
যারা প্রভাবিত করে সূক্ষ্ম চেতনা!
ধ্বংস হোক মিথ্যা ভাবী স্বপ্ন—
নামের খ্যাতির গৌরবের!
ধ্বংস হোক সহায়-সম্পত্তি—
স্ত্রী সন্ততি দাস কৃষি!
ধ্বংস হোক ধন
যা আনে অশান্ত কর্মের নেশা,
আয়োজন করে স্থখের পুষ্পশয্যা!
ধ্বংস হোক দ্রাক্ষার দেবভোগ্য স্থধা—
প্রণয়ের পরম প্রসাদ!
ধ্বংস হোক আশা, ধ্বংস হোক বিশ্বাস!
আর বিধ্বস্ত হোক ধৈর্য!

তখন অন্তরীক্ষে দেবযোনিরা ব্যথিত হয়ে বলে উঠ্‌লো—

হায়! হায়!
ধ্বংস করলে,
সুন্দর জগৎ,
প্রবল আঘাতে:
ছিন্নভিন্ন হলো! বিধ্বস্ত হলো!
আস্থরিক বিক্রমে!
যত সব বিক্ষিপ্ত অংশ

নিয়ে যাই শূন্যে,
শোক করি
নষ্ট সৌন্দর্যের জন্যে !
ধরণীর পুত্রদের
ওগো বরেণ্য,
সুন্দরতর করে'
আরবার কর সৃষ্টি,
সৃষ্টি কর ভেঙে-ফেলা জগৎ তোমার অন্তরে !
নব জীবন
যাত্রা সুরু করুক
নির্মলতর দৃষ্টি নিয়ে,
নব নব আনন্দ-সঙ্গীত
উঠুক কণ্ঠে কণ্ঠে
তার অভিনন্দনে !

মেফিস্টো বল্লে, এই মানসিক অস্বস্তি থেকে সে ফাউস্টকে উদ্ধার করবে, তাকে নিয়ে যাবে মানুষের সমাজে—জনতায় নয়—তাতে ঘুচবে তার মনের গ্লানি; ফাউস্ট যদি রাজি হয় তবে সে হবে তার সঙ্গী—ভৃত্য। ফাউস্ট জিজ্ঞাসা করলে—কি শর্তে? মেফিসটো বল্লে—সে কথা পরে ভেবে দেখলেই চলবে। ফাউসট বল্লে—

না না—শয়তান আত্মপরায়ণ,
তার স্বভাব নয়
"নিষ্কাম ভাবে" কারো জন্য কিছু করা।
পরিষ্কার করে' বলো তোমার শর্ত !
নইলে এমন ভৃত্য থেকে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

মেফিস্টো বল্লে—

"এখানে" আমি অক্লান্ত সেবক, চলবো তোমার রাশ গলায় পরে,'
চলবো তোমার ইঙ্গিত মাত্রে,
কিন্তু "সেখানে" যখন আমরা মিলিত হব
তখন তুমি করবে আমি যা করলাম।

ফাউস্ট বল্লে, এই "সেখানে"র চিন্তায় সে বিব্রত নয়। তার আনন্দের উৎস এই পৃথিবী, এই প্রতিদিনের সূর্য, এসব ছেড়ে যখন সে চলে যাবে তখন ঘটুক যা খুশী, তখন ভাববার দরকার হবে না সে স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে।

এই চুক্তি নিষ্পন্ন করবার জন্য মেফিস্‌টো তাকে আহ্বান করে' বল্লে-

তোমাকে দেব এমন জিনিষ যা কেউ কখনো দেখেনি।

ফাউসট অবজ্ঞা প্রকাশ করে' বল্লে—

কৃপার পাত্র শয়তান, তুমি দিতে পার আমি যা চাই তাই!
মানুষের আত্মার পরম প্রয়াস
কবে বুঝতে পেরেছে তোমার মতো জীব?
তোমার দেওয়া ভোজ্য তৃপ্তি দেয় না কখনো;—
তুমি দিতে পার টক্‌টকে সোনা,
পারার মতো চঞ্চল, গলে যায় আঙুলের ফাঁক দিয়ে,—
দিতে পার এমন তন্বী আমার বক্ষলগ্ন থেকে
যে চটুল আঁখি হানে অপরের প্রতি—
দিতে পার সম্মানের দিব্য আস্বাদ
যা মিলায় উল্কার মতো।
দেখাও সেই ফল যা তুলবার আগেই যায় পচে,
আর সেই গাছ, যাতে প্রতিদিন জন্মে নতুন নতুন পাতা!

মেফিস্‌টো বল্লে—

এতে আমার ভয় পাবার কিছু নেই;
এমন জিনিষ আমার আছে, দেখাতেও পারি নিঃসন্দেহ।
কিন্তু বন্ধু, এমন দিন হয়ত আসবে
যখন আমরা খুঁজবো শান্তি, কামনা করবো নিবিড় সুখ।

ফাউস্‌ট বল্লে—

যদি কখনো আরামে সুখশয্যায় নিজেকে দিই এলিয়ে,
সেই ক্ষণেই যেন হয় আমার জীবনের অবসান!
ভুলিয়ে চলতে পার আমাকে স্তোকবাক্যে
সুখের আয়োজনে,
যে পর্যন্ত না হই আমি আত্মবিস্মৃত—
সেই দিন হবে আমার শেষ দিন।
এই আমার পণ।

মেফিস্‌টো বল্লে—

বেশ তাই।

ফাউস্‌ট বল্লে—

নিশ্চয়! নিশ্চয়!

যেদিন চলমান মুহূর্তকে আমি বলবো,
"আর একটুকু থাকো—এত সুন্দর তুমি !"
সেদিন বেঁধো আমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে,
বরণ করবো সেই দিন চরম ধ্বংস !
সেদিন পাবে তুমি মুক্তি সেবা থেকে।
... .

তাদের চুক্তি নিষ্পন্ন হলো রক্তের অক্ষরে, কেননা, মেফিস্টোর মতে রক্ত দিয়ে যা লেখা হয় তার মর্যাদা কিছু ভিন্ন রকমের।

যে জীবন ফাউস্ট এখন যাপন করতে চাচ্ছে সে সম্বন্ধে সে মেফিস্টোকে বল্লে—

...বৃথা আমি হয়েছিলাম উচ্চাভিলাষী,
আমি বরং সমকক্ষ তোমাদের ;
সেই মহীয়ান দেবযোনি থেকে পেয়েছি অবজ্ঞা,
প্রকৃতির রহস্যের দ্বার রুদ্ধ আমার সামনে ;
ছিন্ন হয়েছে অবশেষে চিন্তার সূত্র—
জ্ঞান আনে অবর্ণনীয় বিরক্তি।
সন্ধান করা যাক এখন ভোগ সমুদ্রের তলকূল,
তাতে যদি প্রশমিত হয় কামনার জ্বালা !
মায়ার অভেদ্য গুণ্ঠনে আবৃত হয়ে
আসুক নব নব বিস্ময়, চকিত মোহিত করতে।
যোগ দিই কালের উদ্দাম নৃত্যে,
ঘটনার প্রবাহে !
আনন্দ ও দুঃখ,
দুর্ভাবনা ও সাফল্য,
আবর্তিত হয়ে চলুক যেমন খুশী ;
মানুষের পরিচয় অশ্রান্ত উদ্দীপনায় !

মেফিস্টো বল্লে, তার আপত্তি নেই কিছুতে, তবে সুখ-সেবনের পথে যে তারা অগ্রসর হচ্ছে সেক্ষেত্রে ফাউস্টের জন্য চাই অসঙ্কোচ—দ্বিধা করলে চলবে না।

ফাউস্ট বল্লে—

শুনেছ ত সুখ লক্ষ্য নয় আমার :
আমি চাই উদ্দাম আবর্তন, ভোগের তীক্ষ্ণতম যাতনা,
প্রেম-বিহ্বল ঘৃণা, উল্লসিত বিতৃষ্ণা।
আমার অন্তরে জ্ঞানের পিপাসা হয়েছে নিবৃত্ত,

কোনো ব্যথা থেকেই হবে না তা প্রতিহত,
মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে যত সুখ-দুখ
সব পরীক্ষিত হবে আমার অন্তরতম সত্তায় ;
ক্ষুদ্র ও মহৎ সবের রূপ জাগবে আমার আত্মায়,
সঞ্চিত হবে তাতে তাদের আনন্দ ও বেদনা ;
এমনিভাবে আমার নিজের সত্তা বিস্তৃত করবো তাদের সত্তায়,
আর শেষে সবার সঙ্গে লাভ করবো মানব-ভাগ্যের ব্যর্থতা ।

মেফিস্টো বুঝিয়ে বল্লে —

বিশ্বাস কর আমার কথা, হাজার হাজার বছর ধরে'
এই কঠিন মাংসের টুকরো চিবিয়ে চলেছি আমি—
দোল্‌নায় দোলা থেকে আরম্ভ করে খাট্‌লিতে চাপা পর্যন্ত
কোন মানুষ হজম করতে পারে নি এই পুরোনো খামিরা
জেনে রাখো — এই সমগ্র
সৃষ্ট হয়েছে ঈশ্বর বলে' যিনি আছেন তাঁর খুশীর জন্যে !
তিনি বিরাজ করেন একা অনন্ত মহিমায়,
আমাদের তিনি নিক্ষেপ করেছেন দূরে অন্ধকারে,
আর তোমাদের জন্য বিধান করেছেন একবার দিন আরবার রাত্রি ।

ফাউস্ট বল্লে—

কিন্তু আমি চাচ্ছি এই !

মেফিসটো তার অভ্যস্ত বক্র ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করলে ফাউস্টের আকাঙ্ক্ষার অসমীচীনতার দিকে, প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলে ফাউসটের খেয়াল যেদিকে গেছে তা অসার কবি-কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নয়—

ভাল কথা ।
কিন্তু ভয়ের কথা হচ্ছে এই—
শিল্প দীর্ঘায়ত, আর সময় সংকীর্ণ ।
সে জন্যে তোমার একটি কথা শোনা দরকার :
কোনো কবির সঙ্গে কর ভাব —
ছুটুক তার কল্পনা,
তারপর শোভা পাও তার তৈরি মুকুট পরে'
ঝলমল করছে যাতে বিচিত্র গুণাবলী—
সিংহের বিক্রম,
বন্য হরিণের ক্ষিপ্রতা,

ইতালীয়ের উষ্ণ শোণিত,
উত্তরাঞ্চলের দৃঢ়তা !
তার কাছ থেকে বুঝে নাও কেমন করে'
এক সূত্রে বাঁধা যায় মহত্ত্ব আর হীনতা,
যৌবনের উদ্দামতার কালে
কেমন করে' প্রেম করতে হয় ঘৃণা করতে হয় নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে !
এমন একজনের দেখা পাওয়া আমার বড় সাধ ;
এ'র নাম আমি দিতাম শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোট-ব্রহ্মাণ্ড।

ফাউসট্ অধীর হয়ে বল্লে—
কি মূল্য আমার, যদি সমস্ত মানবতার মুকুট
ধারণ করতে না পারি আপন মাথায় !

মেফিসটো বল্লে—
কেন, মোটের উপর তুমি যা তুমি তাই।
মাথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পার যত খুশী কোঁকড়ানো পরচুলা লাগিয়ে,
পায়ে লাগাতে পার আধহাতউঁচু-গোড়ালির জুতো—
কিন্তু আসলে রয়ে যাচ্ছ তুমি যা তাই।

ফাউস্ট সখেদে বল্লে—
দেখছি আমি মস্তিষ্ককে বৃথা করেছি ভারাক্রান্ত
মানুষের বিচিত্র চিন্তাভাবনার দ্বার ।
যখন বিরত হই পাঠশ্রম থেকে
তখন জাগেনা আমার অন্তরে কোনো নতুন শক্তি,
বাড়ে না আমার উচ্চতা তিল পরিমাণেও
অনন্তের নিকটবর্তী নই আমি আদৌ !

মেফিসটো তখন বল্লে—
মশায়ের চোখে ব্যাপারগুলো এইবার পড়েছে
যেমন পড়ে আর দশজনের চোখে।
চলতে হবে আমাদের বুদ্ধি খরচ করে
জীবনের আনন্দ নাগালের বাইরে চলে যাবার পূর্বেই।
কি বিড়ম্বনা ! হাত পা ত আছেই,
আর আছে মাথা আর পুরুষত্ব—
কিন্তু তাই বলে' যাতে নতুন করে' পেলাম তৃপ্তি
তা কি পুরোপুরি নয় আমার ?

যদি আমার আস্তাবলে থাকে ছয়টি ঘোড়া
তাদের শক্তি কি নয় আমারও শক্তি ?
—ছুটে চলি তখন পূর্ণতম মানুষের মহিমায়
যেন পদক্ষেপ করে' চলেছি চব্বিশ পায়ে !
ছাড়ো—বৃথা তত্ত্বচিন্তা ছাড়ো—
সংসারে ঝাঁপিয়ে পড় আনন্দে !
বলছি তোমাকে—তোমার তত্ত্বসন্ধানী উজবুকটি
আসলে এক ভূতে-পাওয়া জন্তু,
ছুটে বেড়াচ্ছে সে মাঠে মাঠে,
অথচ তার চারপাশে রয়েছে সরস সবুজ ঘাস।

এখানে ছাত্রদের নিয়ে অসার আলোচনায় তিক্তবিরক্ত না হয়ে সে তাকে বল্লে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। অদূরে একটি ছাত্রের পদধ্বনি শোনা গেল। ফাউসট বল্লে—এর সঙ্গে দেখা করবার মতো মনের অবস্থা তার নয়। এই বলে' সে কক্ষ ত্যাগ করলে। তার ঢোলা পোষাক পরে' মেফিসটো বসলো ফাউসট হয়ে আর মন্তব্য করলে :—

বিচার ও বিজ্ঞানকে তুমি করেছ অবজ্ঞা,
—যার বাড়া নির্ভরের বস্তু মানুষের জন্য আর নেই !
পড়েছ জাদুর জালে
মিথ্যার রাজার পাল্লায়—
আর নেই তোমার অব্যাহতি।

এর পর প্রবেশ করলে এক ছাত্র। মেফিসটো ও ছাত্রের কথোপকথন বিখ্যাত,—এতে প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানচর্চার ত্রুটির প্রতি গ্যেটের কটাক্ষ। বেয়ার্ড টেইলর বলেন, এটি লেখা হয়েছিল মের্ক-এর সঙ্গে গ্যেটের অন্তরঙ্গতার কালে—নিজের কলেজ-জীবনের স্মৃতি তখন তাঁর মনে অম্লান। এর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হচ্ছে :—

তর্কবিজ্ঞান সম্বন্ধে :—

প্রকৃত পক্ষে চিন্তার সূক্ষ্ম বুনানি হচ্ছে
তাঁতির কাপড় বুনানির মতো ;
এক তাঁতে চলেছে হাজার সুতা,
মাকু চলেছে দ্রুত,
অদৃশ্যভাবে সুতার সঙ্গে সুতা হচ্ছে গাঁথা,
বেরিয়ে আসছে বিচিত্র বসন।
তার পর আসছেন নৈয়ায়িক,

প্রমাণ করছেন তিনি, সম্ভবপর নয় এ ভিন্ন আর কিছু হওয়া;
প্রথম প্রস্থান এই—আর দ্বিতীয় প্রস্থান এই,
তৃতীয় আর চতুর্থ হবে—তা থেকে যা সিদ্ধান্ত হয় তাই ;
যদি না থাকতো প্রথম ও দ্বিতীয়,
ঘটতো না তবে তৃতীয় আর চতুর্থ।
সব দেশের পণ্ডিতরাই এতে মহা বিশ্বাসী,
কিন্তু তাদের মধ্যে জন্মে না একজনও তাঁতি।

দর্শন সম্বন্ধে :—

মনে রেখো, খুব গভীরভাবে বোঝা চাই সেই সব কথ
যা বুঝে ওঠা কুলোয় না মানুষের মাথায় !
তা মাথায় ঢুকুক আর না-ই ঢুকুক
সে-সব সম্বন্ধে পাবে কিন্তু এক একটি গালভারি শব্দ।

আইন সম্বন্ধে :—

সমস্ত আচার-ব্যবহার ও আইন
সংক্রামিত হয়ে চলেছে, গোপনে, মানবজাতির চিরন্তন ব্যাধির মতো-
এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে,
এক দেশ থেকে অন্য দেশে।
সেই যুক্তির বালাই, দান হয় অপকর্ম ;
দুর্ভাগ্য তোমার যদি জন্মেছ নাতি হয়ে !
যে আইন ও অধিকার জন্মেছে আমাদের সঙ্গে বিধিবদ্ধ না হয়ে,
হায়, তা বুঝবার জন্য নেই কারো মাথাব্যথা।

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে:—

এই বিদ্যায় দেখবে
ভুল পথ এড়িয়ে চল কত শক্ত ;
এর মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক বিষ,
কোন্‌টি বিষ আর কোন্‌টি ঔষধ তা বাছাই করা কঠিন।
সব চাইতে ভাল হচ্ছে এ বিদ্যায় একজনের কথা শোনা,
সোজাসুজি গুরুর বাক্য জ্ঞান করবে সত্য।
সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করবে শব্দের উপরে !
তাহলে সব চাইতে নিরাপদ দরজা দিয়ে
ঢুকতে পারবে ধ্রুবের মন্দিরে।

....

বুদ্ধি আর যেখানে থৈ পায় না
সেখানে এসে হাজির হয় শব্দ।
শব্দ নিয়ে লড়াই করা যায় কত চমৎকারভাবে ;
শব্দের সাহায্যে সহজে দাঁড় করানো যায় মতবাদ.
শব্দের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় আরামে ;
শব্দ থেকে কেউ খসিয়ে নিতে পারে না কণামাত্রও।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে :—

বৃথা ঘুরছ বিজ্ঞানের মহলে মহলে,
প্রত্যেকে ততটুকু শেখে যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব।

জীবন সম্বন্ধে :—

পাণ্ডুর হয়ে গেছে সমস্ত তত্ত্ব,
সবুজ আছে শুধু জীবন-বৃক্ষ।

ছাত্রটি তার খাতায় পরম ভক্তিভরে ফাউসট-রূপী মেফিসটোর এক লাইন লেখা নিয়ে চলে গেল। পুনরায় এলো ফাউসট, বল্লে—এখন যেতে হবে কোথায় ?

মেফিসটো বল্লে—

যেখানে তোমার খুশী,
প্রথমে আমরা দেখব ক্ষুদ্র জগৎ, তার পর বৃহৎ জগৎ।

এখানে ক্ষুদ্র জগৎ বলতে বোঝা হয়েছে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন, আর বৃহৎ জগৎ বলতে বোঝা হয়েছে বৃহত্তর সংসার-জীবন, অর্থাৎ রাজ্যশাসন যুদ্ধ ঐতিহ্য ইত্যাদি। প্রথম জগতের পরিচয় সাধারণত ফাউসট প্রথম খণ্ডে, আর দ্বিতীয় জগতের পরিচয় ফাউসট দ্বিতীয় খণ্ডে।

মেফিসটোর কথায় ফাউসট বল্লে—

আমার মুখে রয়েছে লম্বা দাড়ি,
তা নিয়ে সম্ভবপর হবে না স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করা।

… … … …

মেফিসটো বল্লে—

তোমার এ সব ভয় শীগ্‌গিরই যাবে ঘুচে ;
আত্মবিশ্বাসী হও, তাহলে বুঝবে বাঁচবার রহস্য।

মেফিসটোর মায়া-চাদরে বসে তারা শূন্য দিয়ে উড়ে চল্‌লো।

পঞ্চম দৃশ্য

লাইপৎসিগে আউআরবাখ-এর তয়খানা

মদ খাওয়া হল্লা আর অশ্লীল গান চলেছে, তার সঙ্গে চলেছে গালাগালি ঘুষোঘুষি,—অবশ্য খুব উৎকটভাবে নয়। এখানে প্রবেশ করে মেফিস্টো ফাউস্টকে বল্লে—

প্রথমে তোমাকে আনলাম এখানে,
এই এক গ্লাসের ইয়ারদের বৈঠকে,
দেখ কেমন সহজভাবে কেটে যাচ্ছে জীবন।
প্রতিটি দিন এদের জন্য উৎসব-দিন :
বুদ্ধি এদের সামান্য, সন্তোষ অপর্যাপ্ত,
ঘুরপাক খাচ্ছে এরা নিজেদের ক্ষুদ্র চক্রে,
যেন বিড়ালছানা খেলছে আপন ল্যাজের সঙ্গে ;
যেন কখনো ধরে না এদের মাথা,
যতক্ষণ পাওয়া যায় ধার
ততক্ষণ কাটে স্ফূর্তিতে, বেপরোয়া ভাবে।

এদের প্রতি খুব সম্মান দেখিয়ে, কখনো একটু আধটু খোচা দিয়ে, মেফিস্টো এদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলে ; ধরলে এদের সঙ্গে গান। জাদুবিদ্যার সাহায্যে এদের জন্য ভাল ভাল মদের ব্যবস্থা করলে। সেই সব মদ গ্লাস গ্লাস এরা খেতে লাগলো আর সমস্বরে গান ধরলে—

আমরা চরি যেন পাঁচশ' শূয়োর—
মানুষের মাংস খাই আমরা।

এদের দেখিয়ে মেফিস্টো বল্লে—

দেখ এদের সুখ—এদের মুক্তি !

ফাউস্ট বল্লে—

চল এখান থেকে যাই, আর দেরী করে কাজ নেই।

গ্লাস থেকে মদ ছিটকে পড়াতে আগুন জ্বলে উঠল। তখন সবাই মারমূর্তি হয়ে উঠলো মেফিস্টোর 'পরে। মেফিস্টো মন্ত্রবলে এদের অচল করে' দিলে, ভুলিয়ে ধরালে একের দ্বারা অন্যের নাক। তারপর সে ও ফাউস্ট অদৃশ্য হয়ে গেল। ইয়ারদের যখন চৈতন্য হলো তখন তাদের কেউ কেউ বল্লে—জাদুকররা উড়ে চলে গেছে মদের পিপেয় চড়ে।

লাইপৎসিগে অবস্থানকালে গ্যেটে এই আউআরবাখ-এর তয়খানা আর তার দেয়ালে ফাউস্ট ও মেফিস্টোর পুরোনো ছবি দেখেছিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডাকিনীদের পাকশালা

এক প্রকাণ্ড কড়াই এক নীচু উনুনের উপরে বসিয়ে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। এক বড় বাঁদরী সেই ফুটন্ত রসের গাদ কাটছে আর দেখছে রস যেন উথলে না পড়ে। অদূরে বসে গোদা-বাঁদর—ছানাগুলোর সঙ্গে আগুন পোহাচ্ছে। কড়াই থেকে যে বাষ্প উঠছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিচিত্র মূর্তি। ঘরের দেয়ালে ও ভিতরের ছাদে দেখা যাচ্ছে জাদুবিদ্যার নানা অদ্ভুত যন্ত্রপাতি।

এ দৃশ্য স্বভাবতই শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের ডাকিনীদের দৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। মূল ফাউস্ট উপাখ্যানের সঙ্গে এই দৃশ্যের মাত্র এইটুকু যোগ যে এখানে ডাকিনীদের দেওয়া আরক পান করে' ফাউস্ট নবযৌবন লাভ করছে আর তারপরই মার্গারেটকে দেখে একান্ত মুগ্ধ হচ্ছে।

এখানে এসে ফাউস্ট খুব বিতৃষ্ণা বোধ করলে। মেফিসটোকে বল্লে—

…বলতে চাও এই পাগলামি কাণ্ডকারখানার সাহায্যে
আমি লাভ করবো নবস্বাস্থ্য ?
….প্রকৃতি অথবা কোনো মহৎ মানুষ
আজো কি আবিষ্কার করতে পারেনি কোনো যোগ্য ওষুধ ?

মেফিসটো বল্লে, নবযৌবন লাভের প্রকৃতি-নির্দেশিত পন্থা হচ্ছে এই—

…যাও মাঠে
লাগো চাষের কাজে ;
আকাঙ্ক্ষা আর অনুভূতি
কর যথেষ্ট সীমাবদ্ধ
জীবনধারণ কর প্রকৃতির দেওয়া অকৃত্রিম খাদ্যে ;
গরুর সঙ্গে কাটাও গরুর মতো… ;
নিজের জমিতে সার জোগাও নিজে…কাটো নিজের ফসল ;
এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায় আশি বৎসরেও যৌবন রক্ষার।

ফাউসট বল্লে এত হীন কাজ তার পোষাবে না ;….মেফিসটো নিজে কি এই আরক তৈরী করতে পারে না ?

মেফিসটো বল্লে—

…শুধু কৌশল আর বিদ্যা দিয়েই হয় না ;
কাজে চাই ধৈর্যও।
শান্ত মস্তিষ্কে সৃষ্টিতে নিয়োজিত থাকতে হয় দীর্ঘদিন :

মন্তের সূক্ষ্ম তীব্র পচন ঘটে কালেই।
প্রয়োজন বহু উপাদানের—
দুর্লভ ও বিস্ময়াবহ সেসব।
শয়তান শিখিয়েছে এদের, মিথ্যা নয়,
কিন্তু শয়তান অসমর্থ এটি প্রস্তুত করতে।

এই বাঁদরের চেহারার ডাক-ডাকিনীদের কথাবার্তা খুব অদ্ভুত—অমার্জিত ত বটেই। এদের এই আরক তৈরির কালে ফাউসট পায়চারি কর্‌ছিল এক আয়নার সামনে। সহসা তাতে ফুটে উঠ্‌লো এক অপূর্ব নারীমূর্তি। দেখা মাত্রই এর প্রতি ফাউসট এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলে—বিস্মিত হয়ে সে বল্লে—

নারী হতে পারে এমন মনোহারিণী?
এই মোহন ভঙ্গিতে এলায়িত মূর্তিতে দেখছি আমি
সমস্ত স্বর্গের মস্থিত নিছনি!
আছে কি কিছু মর্ত্যে এর সমতুল?

মেফিসটো বক্র ভঙ্গিতে বল্লে—

নিশ্চয়। ঈশ্বর হেন ব্যক্তির খাটুনি হয়েছিল ছয়দিন ধরে'
আর শেষে খুশী হয়ে বলেছিলেন তিনি—চমৎকার!
চমৎকার-কিছু সেজন্যে ত' পাওয়া চাইই!
দেখে নাও এইবার চোখ ভরে';
যদি চাও, দিতে পারি তোমাকে এমন প্রেয়সী;
কত ভাগ্যবান্ সে অন্ধ নিয়তির বিধানে
গৃহে বরণ করে নেবে যে এমন বধূ!

ফাউসট আয়নার দিকে তাকিয়েই রইল।

দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় আরক প্রস্তুত হলো—ফাউসট তা পান করলে। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কালে সে বল্লে—

আর একবার চেয়ে দেখ্‌ব আয়নার দিকে,
কত সুন্দর সেই নারী-মূর্তি!

মেফিসটো বল্লে—

কক্ষনো না! বরং নারীর সৌন্দর্যের চরম
অচিরে দেখবে তুমি রক্তমাংসের দেহে।

জনান্তিকে বল্লে—

দেখবে রক্তের উপরে এই আরকের ক্রিয়ার ফলে
প্রতি নারীকে হেলেনার মতো রূপসী!

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ

ফাউসটের পাশ দিয়ে যাচ্ছে মার্গারেট। ফাউসট অগ্রসর হয়ে বল্লে—

সুন্দরী ভদ্র-কন্যা, যদি অপরাধ না নেন,
আপনার সেবায় নিয়োজিত হতে পারে আমার বাহু ও সঙ্গ।

মার্গারেট বল্লে—

আমি ভদ্র-কন্যা নই, সুন্দরীও নই,
বাড়ী যেতে আমার দরকার হবে না আপনার সঙ্গের।

ফাউসটের হাত ছাড়িয়ে সে চলে গেল। ফাউসট বালিকাকে দেখে একান্ত মুগ্ধ হলো। তার সরল সংযত ব্যবহার, ঝাঁঝালো কথা, গণ্ড ও ওষ্ঠাধরের লালিমা, সবই তাকে উতলা করলে। মেফিসটো এলে সে বল্লে, একে তার চাই।

মেফিসটো বল্লে—

তাকে!
এইমাত্র সে আসছে গির্জা থেকে পাপের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করে,
প্রতি পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে;
আমি শুনছিলাম তার চেয়ারের পেছনে বসে,—
সম্পূর্ণ নিষ্পাপ তার কুমারী-হৃদয়,
কোনো প্রয়োজন ছিল না তার মার্জনা-ভিক্ষার।
আমার শক্তি নেই এমন কচি অন্তরের উপরে।

ফাউসট বল্লে—

কিন্তু এর বয়স চৌদ্দর উপরে।

মেফিসটো বল্লে—

কথা বলছ দেখছি নাগরচূড়ামণির মতো—
যার জন্য চাই প্রতি ফুল,—
ধারণা তার, যত উপহার
যত উপচার, সব তারই জন্য!
কিন্তু সব সময়ে ত সফল হওয়া যায় না এতে

ফাউসট বল্লে—

পরমশ্রদ্ধেয় নীতিবাগীশ, সাবধান হও।
নীতির বিধান সম্বন্ধে প্রয়োজন নেই একটি কথারও!
চুক্তি অনুসারে আমার যা প্রাপ্য সব চাই আমি;

যদি সেই আনন্দ-মূর্তি
বাহুবন্ধনে না পাই অর্ধরাত্রে,
তবে বারোটা বাজার সঙ্গেই অবসান হবে আমাদের চুক্তির।

কিছু কথা কাটাকাটির পরে মেফিসটো বল্লে—

…পরিষ্কার করে' বলছি তোমাকে শেষবার,
এই মাধুর্যময়ী কন্যাকে কখনো লাভ করতে পারবে না তাড়াতাড়ি করলে!

কি ভাবে একে পাওয়া যাবে মেফিসটো তার আভাস দিলে। ফাউসট অধীর আগ্রহে মেফিসটোকে হুকুম করলে তার প্রিয়ার জন্য উপহারের যোগাড় করতে।

অষ্টম দৃশ্য

সন্ধ্যা—একটি সুসজ্জিত কক্ষ

মার্গারেট চুল বাঁধতে বাঁধতে বলছে—

যে ভদ্রলোককে দেখেছি আজ তিনি কে,
এ সংবাদ যদি কেউ দিতে পারতো তবে তাকে দিতাম কিছু বখশিশ।
সুপুরুষ ইনি,
উচ্চ বংশেরও নিঃসন্দেহ;
তাঁর চেহারায় বলেছিল সে কথা,
নইলে কি হতেন এত সাহসী!

মার্গারেট বেরিয়ে গেল। প্রবেশ করলে মেফিসটো ও ফাউসট। গৃহের শৃঙ্খলা দেখে মেফিসটোও মুগ্ধ হলো—সেই শৃঙ্খলায় যেন মার্গারেটের অমল আত্মা প্রতিফলিত।—ফাউসট কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার অন্তর এতখানি ভরে' উঠ্‌লো যে মেফিসটো তাকে কিছু বলতে চাইলে সে বল্লে—

দয়া করে' আমাকে একলা থাকতে দাও।

ক্রোচে বলেছেন, মার্গারেট সম্পর্কে ফাউসট উৎকট ভাবে লোভী হয়ে উঠেছে, প্রথম কয়েক দৃশ্যের সেই বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর ও সবল-চিত্ত ফাউসট এখানে বদলে গেছে। ক্রোচের এই উক্তি মোটের উপর অতিশয়োক্তি। মার্গারেট সম্বন্ধে ফাউসটের মনে লোভ যে না জন্মেছে তা নয়, কিন্তু আর অপূর্ব-সচেতন আত্মা লোভের কবলে একান্তভাবে বন্দী হয়ে পড়েনি। মার্গারেটের গৃহের শ্রীময় দারিদ্র্য সম্বন্ধে সে বলছে—

সর্বত্র কেমন ফুটে আছে
শান্তি, শৃঙ্খলা, সন্তোষ!

এ দারিদ্র্য পূর্ণ কী মাধুর্যে !
কী আনন্দে পরিপূর্ণ এই সংকীর্ণ কক্ষ !

কামরার চামড়ায়-মোড়া বড় চেয়ারে বসে তার মনে হলো, উৎসব-দিনে পিতা-পিতামহের চারপাশে এখানে কেমন ভিড় করেছে ছেলেমেয়ের দল, সেই দলে 'ছল মার্গারেটও ; একটি বিছানার মশারি তুলে দেখে সে বল্লে—

...এখানে যেন লীলাচ্ছলে প্রকৃতির হাতে
মুকুল বিকশিত হয়েছে পারিজাতে।
এখানে শায়িত ছিল
প্রাণ-সমৃদ্ধ শিশু ;
তার তনু, প্রসন্নতর প্রভাবে,
এখানে লাভ করেছে দেবদুর্লভ পূর্ণতা !

মার্গারেট সম্পর্কে নিজের লোভ সম্বন্ধে সে বলছে—

এখানে কি কোনো জাদু-বাষ্প আছে ?
আশু-তৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম,
কিন্তু প্রেমের স্বপ্ন-রসে আমি এখন নিমজ্জিত !
হাওয়ার প্রতি পরিবর্তনের খেলেনা কি আমরা ?
এই মুহূর্তে যদি সে এসে পড়ে,
তাহলে এই অপরাধের জন্য কী প্রায়শ্চিত্ত আমি করবো !
প্রকাণ্ড বর্বর তাহলে কত ক্ষুদ্র হয়ে
তার পায়ে লুটিয়ে হবে তৃপ্ত, লজ্জিত !

মেফিসটো ফাউসটের হাতে গহনার পেটী দিয়ে বল্লে—

তাড়াতাড়ি আলমারিতে রেখে দাও,
এ দেখে তার মাথা ঘুরে যাবে তা শপথ করে বলতে পারি।

ফাউসট বল্লে—

বুঝে উঠ্‌তে পারছি না—রাখবো কি ?

শেষে আলমারি খুলে মেফিসটো পেটীটি রেখে আলমারি বন্ধ করে দিলে, তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল ফাউসট।

তাদের পরে প্রদীপ হাতে প্রবেশ করলে মার্গারেট। সে ঘরের জানালা খুলে দিলে, আর কাপড় ছাড়তে ছাড়তে গাইতে লাগ্‌লো—

এক যে ছিল টুলে দেশের রাজা
ভালবাসা ছিল তাহার খাঁটি,

প্রিয়া তাহার ছাড়লো ভবের মায়া,—
দিয়ে গেল একটি সোনার বাটি।

এই বাটি ভরে ভরে রাজা মদ খেতেন, তাঁর চোখ ভরে উঠ্‌তো জলে। মরবার কালে সবই তিনি দিলেন উত্তরাধিকারীকে, দিলেন না শুধু এই বাটিটি। শেষবারের মতো তিনি ডাকলেন তাঁর সামন্তদের, সমুদ্রের ধারে তাঁর পূর্বপুরুষের দালানে করলেন ভোজের আয়োজন। শেষবারের মতো প্রাণ ভরে খেলেন মদ এই বাটি থেকে, তার পর বাটি ছুঁড়ে ফেললেন সমুদ্রের জলে—

বাটি পড়লো জলে, গেল ডুবে,
ডুবে গেল অতল সাগরে,
রাজার দুটি চক্ষু এলো মুদে—
উঠ্‌লো না মদ আর সে অধরে।

এই গানে অজ্ঞাতসারে গুঞ্জরিত হচ্ছে মার্গারেটের মনের নব অনুরাগ।

আলমারি খুলে কাপড় রাখতে গিয়ে গহনার পেটী দেখে মার্গারেট বিস্মিত হলো; ভাবলে—তার মায়ের কাছে কেউ বন্ধক রেখেছে। পেটীর সঙ্গে চাবি ছিল। খুলে ঝক্‌ঝকে সব অলঙ্কার দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হলো। এমন জরিজহরত ত খুব বড়লোকের বাড়ীর মেয়েরাই উৎসবের দিনে পরে! কার এ সব! মুক্তার ছড়াটা তার চুলে কি মানাবে!

গহনাগুলো পরে' সে আয়নার সামনে দাঁড়ালো—বলতে লাগ্‌লো—

যদি শুধু কানের দুলগুলোই আমার হতো!
পরলেই দেখায় আলাদা রকমের।
রূপ-যৌবনে কি লাভ?
মন্দ নয় রূপ-যৌবন,
কিন্তু কেইবা তাকায় তার দিকে।
লোকে একটু-আধটু প্রশংসা করে—দয়া করে'।
সবাই তাকায় সোনাদানার দিকে,
সোনায় মেলে সব।
হায়, আমরা গরীব।

নবম দৃশ্য

বেড়াবার পথ

ফাউস্‌ট পায়চারি করছে, দেখাচ্ছে তাকে চিন্তান্বিত। মেফিসটো এসে মহা চেঁচামেচি করে বললে—যে সব অলঙ্কার মার্গারেটকে দেওয়া হয়েছিল তা গেছে

পাত্রীর পেটে! গহনা দেখেই মার্গারেটের মা বুঝে নিলে এসব শয়তানের কারসাজি, শয়তানের ভয় তার খুব বেশী। পাত্রী এসে সহজেই বুঝলে আসল ব্যাপারটা, বল্লে—অধর্মের জিনিষ হজম করবার ক্ষমতা একমাত্র গির্জারই আছে। এই বলে সে নিয়ে গেল সব গহনা ব্যাগ ভর্তি করে ধন্যবাদ দিলে যতটুকু দেবার, কিন্তু বেশী করে' দিলে এর জন্য পরকালে যে পুরস্কার পাওয়া যাবে সেই সংবাদ।

গহনাগুলো হারিয়ে মার্গারেট মনমরা হয়ে আছে এই কথা শুনে ফাউসট বল্লে, পুর্বের চাইতেও দামী আর এক সেট গহনা মার্গারেটের জন্য চাই। মেফিসটো বল্লে—ব্যাপারটা ত ছেলেখেলা নয়। ফাউসট বল্লে—আমার হুকুম।

যেতে যেতে মেফিসটো বল্লে—

এমন প্রেমে-পড়া পাগল
আকাশ ভরতে চাইবে নতুন নতুন সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র দিয়ে
তার প্রিয়ার খুশীর জন্যে।

দশম দৃশ্য

প্রতিবেশিনীর বাড়ী

প্রতিবেশিনীর নাম মার্থা। একা একা সে তার স্বামীর কথা বলছে—

ভগবান তার ভাল করুন,—
কিন্তু আমার জন্যে যা তার করবার ছিল তা সে করেনি।
চলে গেল সে বিদেশে,
আমি পড়ে রইলাম খড়ের গাদায়,—
তাকে ত কোনো দুঃখই দিইনি।
ভগবান জানেন তাকে আমি কত ভাল বাসতাম,
আজো তার কথা ভুলতে পারিনি!
(সে কাঁদতে লাগলো)
হয়ত বা মরেই গেছে! হায় আমার দশা!
একখানা কাগজও নেই যে দেখাব!

মার্গারেট কাঁপতে কাঁপতে এসে ডাকলে—মার্থা মাসি! মার্থা বল্লে—মার্গারেট তোর হয়েছে কি!

মার্গারেট বল্লে—

আমি দাঁড়াতে পারছিনা, পা কাঁপছে!
এক বাক্স পেয়েছি, আগেরটার মতো,

আলমারির মধ্যে ! আবলুশ কাঠের—
সব কি সুন্দর !
আগেরটার চাইতে আরো দামী !

মার্গারেট বল্লে—

বাছা, তোমার মাকে দেখিওনা,
আগেরটার মতো এটাও তাহলে যাবে পাদ্রীর পেটে।

মার্গারেট খুব খুশী হয়ে তাকে গহনাগুলো দেখালে। তার গায়ে সব গহনা পরিয়ে দিয়ে মার্থা বল্লে—

আহা তোর কি সুকপাল !

মার্গারেট বল্লে—

কিন্তু পরে' ত রাস্তায় বেরুতে পারবো না।
গির্জায়ও কাউকে দেখাতে পারবো না।

মার্থা বল্লে —

আমার এখানে সময় সময় আসিস,
এখানে চুপে চুপে গহনাগুলো পরিস,
পরে ঐ আয়নার সামনে ঘণ্টাখানেক হাঁটিস,—
দেখে আমরা দুজনেই খুশী হব।
তারপর সুযোগ বুঝে পরব দিনে,
নেমতন্নে, এক একখানা করে' বার করিস,—
কোনো দিন হার, কোনো দিন দুল, এই ভাবে ;
তোর মার চোখে পড়বে না কিছু, বানিয়ে বলা যাবে তাকে।

দরজায় ঘা পড়লো। মার্গারেট ভয় পেলে বুঝি তার মা-ই এসেছে, কিন্তু এলো মেফিসটোফিলিস। খুব সম্ভ্রম দেখালে সে মার্গারেটের প্রতি, মার্থাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বল্লে—একজন বড়লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। মার্থা মার্গারেটকে ডেকে বল্লে—

....ভদ্রলোক তোকে ঠাউরেছে খুব বড়মানষের ঝি।

মার্গারেট বল্লে—

আমি গরীবের ঝি,
উনি খুব দয়াল—
এ সব গহনা আমার নয়।

মেফিসটোর উদ্দেশ্য মার্থাকে হাত করা—অবশ্য মার্গারেটের জন্যে। সে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মার্থাকে জানালে—তার স্বামী মারা গেছে ইতালিতে, তার কবর সে

দেখে এসেছে ; যা সে উপার্জন করেছিল সব উড়িয়েছে পথে পথে, রেখে যায়নি কিছুই, মরবার সময়ে বলে গেছে তার আত্মার সদ্‌গতির জন্যে খরচ করে ধর্মকর্ম করাতে। নানা কথায় মার্থাকে উত্যক্ত করে' আর আশান্বিত করে' শেষে সে বল্লে—আজ সন্ধ্যায় খুব বড়দরের একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সে আসবে, তারা দুজনে হবে তার স্বামীর মৃত্যুর সাক্ষী, তাতে মার্থার আবার ইচ্ছামত বিয়ে করবার সুবিধা হবে—মার্গারেটও সে সময়ে উপস্থিত থাকবেন। মার্গারেট বল্লে—তেমন ভদ্রলোকের সামনে সে ত লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়বে। মেফিসটো বল্লে—এমন কোনো রাজাও নেই যার সামনে জড়সড় হতে হবে মার্গারেটকে।

মেফিসটো ও মার্থার কথাবার্তায় যেমন ফুটেছে মেফিসটোর দুষ্টবুদ্ধি, তেম্নি ফুটেছে মার্থার স্থূল প্রকৃতি, লোভ, আর দারিদ্র্যের জন্য দুশ্চিন্তা। মেফিসটোর ভাষায় দূতীগিরিতে সে আদর্শস্থানীয়া।

একাদশ দৃশ্য

রাজপথ

ফাউস্ট ব্যস্ত হয়ে মেফিসটোকে জিজ্ঞাসা করলে কতদূর কি হলো। মেফিসটো বল্লে—বাহবা! একেবারে জ্বলছ দেখছি! সে সংবাদ দিলে—অবিলম্বে ফাউসট তার প্রিয়া গ্রেটখেনকে লাভ করবে, আজ সন্ধ্যায় মার্থার বাড়ীর পেছনের বাগানে তাদের দেখা হবে। তবে একটি কাজ ফাউস্টকে করতে হবে—তাকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে মার্থার স্বামী মারা গেছে, তাকে কবর দেওয়া হয়েছে পাদুয়ায়। ফাউস্ট বল্লে—তাহলে ত গিয়ে দেখে আসতে হবে তার কবর। মেফিসটো তাকে বিদ্রূপ করলে সরলতার অবতার বলে', বল্লে—সত্য হোক মিথ্যা হোক বলতে হবে তাকে এ কথা হলপ করে।

ফাউসট বল্লে—

যদি মাত্র এই ফন্দিই বের করে' থাক
তবে আমাকে করতে হবে এটি নামঞ্জুর।

মেফিসটো ফাউসটকে কিছু শক্ত করে' পাকড়াও করলে—

বেশ কথা! কিন্তু ধর্মপুরুষ
এই কি জীবনে প্রথম দিচ্ছ
মিথ্যা সাক্ষী,
ঈশ্বর, জগৎ, জগতে আছে যা কিছু,
মানুষ, মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের তত্ত্ব,

এসব সম্বন্ধে নির্দেশ করনি কি সূত্র আর সংজ্ঞা,
অম্লানমুখে অকুতোভয়ে ?
কিন্তু যদি প্রবেশ কর গভীরে
তবে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, এসব ব্যাপারে,
বেশী ওয়াকিবহাল নও তুমি মার্থার স্বামীর মৃত্যু আর কবর-বাসের চাইতে।

ফাউস্ট বল্লে—
পরিচয় দিচ্ছ—তুমি তার্কিক আর মিথ্যাভাষী।

মেফিস্টো বল্লে—
হবেও বা—তোমার মনের গহনের খবর ত আর রাখিনে !
নইলে কেমন করে', খাঁটি প্রেমিকেরই মতো,
বেচারা মার্গারেটকে পারবে তুমি ভোলাতে, হাত করতে,
আর নিবেদন করবে তাকে সত্যতম প্রেম ?

ফাউস্ট বল্লে—
নিবেদন করবো অন্তর থেকেই।

মেফিস্টো বল্লে—
খুব ভাল কথা !
বলবে তাকে, আজীবন তুমি রবে তারই,
বলবে প্রেম সর্বশক্তি, ঐশ্বরিক—
এও ত বলবে অন্তর থেকেই ?

ফাউস্ট বল্লে—
থামো থামো ! নিশ্চয়ই বলবো ! যখন জ্বলে এই শিখা,
আর তার অর্থ আর তীব্রতা প্রকাশ করে' বলবার মতো
খুঁজে পাইনা ভাষা ;
ফিরি তখন সমস্ত জগতে পাগল মনে,
কামনা করি মহত্তম বাণী,
নাম দিই এই অলৌকিক দাহের
চির-অতৃপ্ত, চিরন্তন,—
সে কি শয়তানী মিথ্যা অভিনয় ?

মেফিস্টো বল্লে—
কিন্তু মিথ্যা নয় যা বলেছি !

ফাউস্ট বল্লে—
শোনো ভাই,

আর বকিয়ো না আমাকে।
যে চায় কিছু, মুখে জোর থাকলে,
হবেই তার জিৎ।
কিন্তু আর নয়; কথায় বিরক্তি ধরে' গেছে,
তোমারই জিৎ, যেহেতু অন্য উপায় নেই।

দ্বাদশ দৃশ্য

বাগান

মার্গারেট ফাউস্টের বাহুসংলগ্না আর মার্থা বেড়াচ্ছে মেফিসটোর সঙ্গে। একবার কথা বলতে বলতে সামনে আসছে মার্গারেট ও ফাউস্ট, আর বার আসছে মার্থা ও মেফিসটো।

মার্গারেট বলছে—

বুঝতে পারছি মহাশয় আমার অজ্ঞতার প্রতি দয়া দেখাচ্ছেন,
নিজেকে নামিয়ে আনছেন অনেক নীচুতে—এতে লজ্জা পাচ্ছি।
পর্যটক সহজেই খুশী
যে কোনো খাবারে; জানি আমি
আমার এই তুচ্ছ আলাপে
কখনো খুশী হতে পারেন না এমন জ্ঞানী লোক!

ফাউস্ট বলছে—

তোমার একটি চাহনি, একটি কথা, আমাকে অনেক বেশী মুগ্ধ করে
জগতের সমস্ত জ্ঞানীর জ্ঞানালোচনার চাইতে।

[ফাউস্ট মার্গারেটের হস্ত চুম্বন করলে।

মার্গারেট বল্লে—

কেন বিরক্ত হচ্ছেন! কেমন করে'
এই হাতে চুমো দিতে পারেন—এত কদর্য
কর্কশ আমার হাত!
কত কাজ করি—করেই যাচ্ছি, করেই যাচ্ছি,—
মার খুব কড়া নজর এদিকে।

[তারা চলে গেল।

মার্থা বলছে—

মশায় ত কেবলই দেশ-বিদেশে ঘোরেন?

মেফিস্‌টো বল্লে—

হায় হায়, ব্যবসা আর কর্তব্য কেবলই আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় !
চলে যাবার সময়ে কত জায়গা থেকেই না যাই মনে বেদনা বয়ে নিয়ে ;
কখনো কোথাও যে একটু দেরী করবো এমন সাহস হয় না !

মার্থা বলছে—

যৌবনের গরম রক্তের দিনে ভালই লাগে
বোঁ বোঁ করে' ঘুরে বেড়ানো ;
কিন্তু তারপর আসে দুর্দিন,
স্ত্রী পুত্র কিছু নেই, একলাটি কবরে সেঁধোনো—
ভাল লাগে না কারো।

মেফিস্‌টো বল্লে—

ভয়ে ভয়ে দেখছি আমারও ভাগ্যে ঘটতে যাচ্ছে তাই !

মার্থা বল্লে—

মশায় বিচক্ষণ, সময় থাকতে সে কথা বুঝুন।

[তারা চলে গেল।

মার্গারেট বলছে—

চোখের আড়াল হলে কি আর মনে থাকে !
বিনয় আপনার স্বভাবগত ;
কিন্তু কত জায়গায় আছে আপনার কত বন্ধু
সহজেই দেখবেন আমার চাইতে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কত বেশী।

ফাউস্‌ট বল্লে—

দেবশিশুর মতো সরল তুমি, বিশ্বাস কর আমার কথা,
যাকে বলা হয় বুদ্ধি তা অনেক সময়ে অহঙ্কার আর অন্ধতা মাত্র।

মার্গারেট বল্লে—

কেমন করে' ?

ফাউস্‌ট বল্লে—

হায়, সরলতা আর পবিত্রতা কখনো সজাগ নয় নিজের সম্বন্ধে,
কখনো বোঝে না আপন অমল মূল্য, অপূর্ব সম্মোহন !
সহিষ্ণুতা ও বিনয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
পরমকারুণিক প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মার্গারেট বল্লে—

আমার কথা মনে করবেন কচিৎ কখনো,

আপনার কথা আমার মনে পড়বে কত সময়ে।

ফাউস্ট বলে—

তোমার বুঝি খুব একলা কাটে ?

মার্গারেট বল্লে—

হঁা,—আমাদের গৃহস্থালী এখন ছোট হয়ে পড়েছে,
কিন্তু নজর রাখতে হয় আমাকে সব দিকে।
কোনো ঝি নেই আমাদের, আমাকেই করতে হয়
রান্না, শেলাই, বুনুনি, ঝাঁট দেওয়ার কাজ—
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ;
গৃহস্থালীর ছোটবড় কোনো কাজে
এতটুকু খুঁৎ চলবে না মায়ের কাছে।
আমাদের যে খরচ কমাবার খুব দরকার আছে তা কিন্তু নয়,
আর সবার তুলনায় আমাদের বরং চলতে পারে একটু বেশী আরামেই।
বাবা রেখে গেছেন একটি ছোটখাটো ভাল সম্পত্তি—
শহরের কাছে বাড়ী আর বাগান।
আজকাল আমাকে আর করতে হয় না তেমন হুড়-হাঙ্গামা ;
আমার ভাই হয়েছে সৈন্য,
আমার ছোট বোনটি গেছে মারা।
তার জন্যে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল আমাকে,
কিন্তু তেমন কষ্ট করতে আজো আমি রাজি,
কত ভালবাসতাম তাকে !

মার্গারেটের কথায় প্রকাশ পেল যখন তার বাবার মৃত্যু হয় তখনো তার ছোটো বোনের জন্ম হয়নি। সে যখন জন্মালো তখন তার মা'র মরমর অবস্থা। সেই অবস্থায় মার্গারেট নিজে যত্ন করে', জলমেশানো দুধ খাইয়ে, গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে তাকে মানুষ করে।

ফাউস্ট বল্লে—

আর এর পরিবর্তে লাভ করেছিলে অতি নির্মল আনন্দ !

মার্গারেট বল্লে—

কষ্টও আমাকে করতে হয়েছিল কিন্তু খুব।
রাত্রে ওর দোলনা রেখে দিতাম
আমার বিছানার পাশেই ; একটু নড়ে উঠলেই
উঠতাম জেগে, থাকতাম কান পেতে ;

ওকে খাওয়াতে হতো, কখনো গরম করতে হতো পাশে শুইয়ে,
কখনো বিছানা ছেড়ে
এই বেগা মেয়েকে কোলে নিয়ে নেচে নেচে পাড়াতে হতো ঘুম,
আর সকালে দিতে হতো ধুইয়ে মুছিয়ে ;
এর উপর বাজার করা, রান্না,
প্রত্যেক দিন কাটতো এইভাবে সারা বছর ধরে'।
ওঃ বলুন এত খেটে কি আর ভাল লাগে ;
কিন্তু এতে খাবার আর ঘুম লাগ্‌তো চমৎকার।

[তারা চলে গেল।

মার্থা বলছে—
বলতে চাচ্ছি আপনার মনে কি কখনো আগ্রহ জাগেনি ?
মেফিসটো বল্লে—
দেখছি মহিলাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করা বিপজ্জনক।
মার্থা বল্লে—
আহা, আপনি বুঝছেন না !
মেফিসটো বল্লে—
বড় আফসোসের কথা যে আমার চোখে কিছু পড়ে না,
কিন্তু নিঃসন্দেহ আপনি করুণাবতী।

[তারা চলে গেল

ফাউস্ট জিজ্ঞাসা করলে মার্গারেট আজ তাকে চিনেছিল কিনা।
মার্গারেট বল্লে—তাকে দেখেই সে চোখ নত করেছিল।
ফাউস্ট বল্লে—
ক্ষমা করেছিলে আমার অসঙ্কোচ,
আমার অবিনয়ের অপরাধ,—
ফিরছিলে যখন সেদিন গির্জা থেকে ?
মার্গারেট বল্লে—
আমি হয়ে পড়েছিলাম দিশাহারা, এমন ঘটেনি কখনো :
কেউই ত করতে পারে না আমার নিন্দা।
মনে হচ্ছিল, হায় হায়, আমার ব্যবহারে
প্রকাশ পেয়েছিল কি কোনো অসংযম,—স্বেচ্ছাচার ?
ভদ্রলোকের মনে যেন হঠাৎ জেগেছিল—
এই মেয়েটিকে পাওয়া যেতে পারে সহজে !

অকপটেই স্বীকার করবো, বুঝতে পারছিলাম না
আপনার প্রতি কি অনুকূল ভাব জাগছিল আমার বুকে ;
রাগ হচ্ছিল আমার নিজের 'পরে
আপনার উপরে যে বেশী রাগ করতে পারছিলাম না সে জন্যে !

ফাউস্ট আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বল্লে—

প্রেমময়ী !

মার্গারেট বল্লে—

রসুন !

[একটি ফুল তুলে নিয়ে সে একটি একটি করে' পাপড়ি ছিঁড়তে লাগ্‌লো]

ফাউস্ট বল্লে—

এ দিয়ে কি তোড়া তৈরি করবে ?

মার্গারেট বল্লে—

না, অম্‌নি খেলা করছি।

ফাউস্ট বল্লে—

কেমন ?

মার্গারেট বল্লে—

যান, আপনি হাসবেন।

[সে পাপড়ি ছিঁড়তে লাগলো আর অস্ফুটভাবে কি বলতে লাগ্‌লো]

ফাউস্ট বল্লে—

কি বলছ ?

(মার্গারেট অস্ফুটভাবে বলে চললো—আমাকে ভালবাসে—বাসে না—ভালবাসে—বাসে না—আর এই অনুক্রমে পাপড়ি ছিঁড়ে চললো। শেষ পাপড়িটি যখন তার হাতে তখন অনুক্রম অনুসারে তাকে বলতে হলো—ভালবাসে ; সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ভালবাসে আমাকে !)

ফাউসট বল্লে—

সরলহৃদয়া, এই ফুলের বাণী
তোমার জন্য হোক স্বর্গের বাণী ! সত্যই ভালবাসে সে তোমাকে !
বোঝো তুমি এর অর্থ ? এই ভালবাসার !

ফাউস্ট আবেগে মার্গারেটের হাত ধরলে। মার্গারেট বল্লে—

আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে !

ফাউস্ট বল্লে—

ভয় কোরো না প্রিয়তমে ! এই চাহনি,

এই সাবেগ করস্পর্শ,
প্রকাশ করুক যা প্রকাশাতীত !
প্রকাশ করুক পূর্ণতম আত্ম-নিবেদন—
পূর্ণতম আত্মনিবেদনের অন্তহীন আনন্দ !
হাঁ অন্তহীন—এর অন্ত আনবে নৈরাশ্র।
অন্ত নয়—অন্ত নেই এর !

মার্গারেট নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। ফাউস্ট্ ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল চিন্তান্বিত মুখে, তারপর করলে মার্গারেটের অনুসরণ।

মার্থা এগিয়ে এসে বল্লে—

…আমাদের সখা-সখী কোথায় ?

মেফিস্টো বল্লে—

এই গলি দিয়ে উড়েছেন তাঁরা—
লীলাচঞ্চল প্রজাপতি !

ত্রয়োদশ দৃশ্য

বাগানের লতামণ্ডপ †

মার্গারেট ছুটে এসে দাঁড়ালো সেই লতামণ্ডপের দরজার আড়ালে, তর্জনী স্থাপন করলে ওষ্ঠাধরে, আর উঁকি দিতে লাগ্‌লো দরজার ফাঁক দিয়ে। ফাউস্ট্‌কে আসতে দেখে বল্লে—

ঐ আসছে !

ফাউস্ট্ লতামণ্ডপে প্রবেশ করে' বল্লে—

দুষ্টু, হয়রান করছ :
ধরেছি তোমাকে এইবার !

[সে তাকে চুম্বন করলে।]

মার্গারেট তাকে জড়িয়ে ধরে প্রতিচুম্বন করে' বল্লে—

প্রিয়তম বন্ধু, তোমাকে ভালবাসি অন্তর থেকে।

[দরজায় ঘা দিলে মেফিস্টো।]

ফাউস্ট্ সরোষে বল্লে—

কে ?

† এই দৃশ্যের সঙ্গে শকুন্তলা-র তৃতীয় অঙ্ক তুলনীয়

মেফিসটো বল্লে—

বন্ধু।

ফাউস্ট বল্লে—

জানোয়ার!

মেফিসটো বল্লে—

এইবার হয়েছে বিদায়ের সময়।

মার্থা এসে বল্লে—

হাঁ মশায়, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ফাউস্ট মার্গারেটকে বল্লে—

আপনাকে এগিয়ে দেবার অনুমতি-প্রার্থী!

মার্গারেট বল্লে—

না না না—নমস্কার!

ফাউসট বল্লে—

তাহলে নিতেই হবে আমাকে বিদায় আপনাদের কাছ থেকে!

নমস্কার!

মার্থা বল্লে—

নমস্কার!

মার্গারেট বল্লে—

আশা করি শীগগিরই আবার হবে দেখা!

ফাউস্ট ও মেফিসটো চলে গেলে মার্গারেট একা একা বল্লে—

ভগবান, দুনিয়া-সংসারের এত কথা
ভাবতে পারেন ইনি! লজ্জিত বিস্মিত হয়ে
আমি দাঁড়িয়ে থাকি এঁর সামনে,
বলি এঁর সকল কথায়—হাঁ;
এক অবোধ শিশু আমি, বুঝি না এমন জ্ঞানী
আমাতে পেতে পারেন কিইবা।

চতুর্দশ দৃশ্য

অরণ্য ও পর্বত-কন্দর।

ফাউস্টের স্বগতোক্তি। তার উক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে প্রকৃতির প্রতি তার অতিগভীর অনুরাগ— প্রকৃতির শান্ত রুদ্র উভয় রূপের প্রতি—প্রকৃতির রহস্যের সামনেই

সে অনুভব করে তার অন্তরাত্মার রহস্য। কিন্তু প্রকৃতি যেমন তাকে উদ্‌বোধিত করে মহত্তর ভাবলোকে, দান করে তাকে ঈশ্বরের নৈকট্য, তেম্‌নি সেই প্রকৃতির বিধানেই তার লাভ হয়েছে মেফিসটোফিলিস—যে তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী; কিন্তু সেই সঙ্গীর বাণীতে প্রকৃতির অপূর্ব দান তার জন্য হয়ে ওঠে অর্থশূন্য; সেই মেফিসটো তার অন্তরে জ্বালিয়ে চলেছে পরমসুন্দর মার্গারেটকে লাভের অসঙ্গত কামনা।

এর পর প্রবেশ করলে মেফিসটো। ফাউস্‌টের প্রকৃতি-প্রেম নিয়ে সে খুব ঠাণ্ডা বিদ্রূপ করলে, বল্লে, তার (মেফিসটোর) সাহায্য না পেলে এতদিনে ফাউসটের দশা হতো আঁধার গর্তের পেচকের মতো; সে আরো জানালে ফাউসটের প্রেমিকা তার জন্য মরছে দিন রাত কেঁদে, ভাবছে ফাউসট পালিয়েছে তাকে ফাঁকি দিয়ে।—তাদের অনেক কথা কাটাকাটি হলো। ফাউসট বুঝলো মার্গারেটের জন্য তার অন্তরে একই সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে সুগভীর প্রেম ও কল্যাণ-কামনা আর দুরন্ত বাসনা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে পরিচালিত হলো মেফিসটোর দ্বারা।

লুইস এই দৃশ্যের সার্থকতা খুঁজে পান নি।—এর সার্থকতা মনে হয় এই যে প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে ফাউসট প্রশমিত করতে চাচ্ছে মার্গারেটের জন্য তার বাসনার উদগ্রতা।

পঞ্চদশ দৃশ্য

মার্গারেটের কক্ষ

মার্গারেট একা একা চরকা কাটছে আর গান গাচ্ছে:

নেই শান্তি সুখ,
ব্যথাভরা বুক;
স্বস্তি নেই আর—
হায় দুঃখ সার!

সে নেইরে কাছে,
সব মরে আছে;
তিতা এ সংসার
তিতা ঘর-বার।

আহা আমার শির,
মরত রে আর থির;

বুদ্ধি কিছু নেই—
হারিয়ে গেছে খেই।

নেই শান্তি সুখ,
ব্যথাভরা বুক ;
স্বস্তি নেই আর—
হায় দুঃখ সার।

তারে দেখার আশে
বসি জান্‌লা পাশে ;
বাইরে ছুটে ধাই—
তারে যদি পাই !

উচ্চ বীর কায়,
কি সুন্দর ধায় !
বদন-ভরা হাসি,
চোখে বিজ্‌লি-রাশি।

মোহন তার বাণী,
মধুর কণ্ঠখানি,
হাতের পরশ তার,
চুমা—সুধার ধার !

নেই শান্তি সুখ,
ব্যথা-ভরা বুক,
স্বস্তি নেই আর—
হায় দুঃখ সার !

তারেই চাহে মন,
চাহে সর্বক্ষণ ;
বাহুর বাঁধনে
বাঁধবো বুকে মনে।

চুমা খাব মুখে,
খাব মনের সুখে,
সেই চুমারই পরে
'যাব আমি মরে'!

ষোড়শ দৃশ্য

মার্থার বাগান

ফাউস্ট ও মার্গারেটের মধ্যে সঙ্কোচের ব্যবধান তিরোহিত হয়েছে, মার্গারেট ফাউস্টকে ডাকছে হাইনরিখ বলে। মার্গারেটের অন্তরে রয়েছে একটি ধর্মভাব—যেমন সহজ তেমনি প্রবল। ফাউস্ট ধর্ম-অনুষ্ঠানে যোগ দেয় না দেখে সে দুঃখিত, তার সন্দেহ হয়েছে, হয়ত ফাউস্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। তার কথার উত্তরে ফাউস্ট এই বিখ্যাত উক্তি করলে (অবতরণিকায় এটি উদ্ধৃত হয়েছে):

আমাকে ভুল বুঝোনা প্রিয়তমে!
স্পর্ধা কার তাঁকে ব্যক্ত করবে!
বলবে কে—তাঁকে জানি? তাঁতে বিশ্বাস রাখি!
অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে অস্বীকার করবে কে তাঁকে,
বলবে কে—বিশ্বাসী তাঁরে নই!

সর্বধর
সর্বাশ্রয়
ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে আমাকে নিজেকে?
মাথার উপরে নেই কি আকাশের খিলান?
পায়ের নীচে অবিচলিত ধরণী?
সামনে জলছে না কি বন্ধুর-মতো-চেয়ে থাকা
চিরদিনের তারা?
চোখ কি আমার তাকাচ্ছে না তোমার চোখে,
দেখছে না তোমাকে?
অনুভব কি করছ না তুমি মনে প্রাণে
তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির লীলা
—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য?
পূর্ণ হোক সেই বিরাট শক্তির দ্বারা তোমার হৃদয়।

আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে
তখন নাম দিও এর
আনন্দ হৃদয় প্রেম ভগবান—যা খুশী।
আমি অক্ষম এর নাম দিতে।
অনুভূতিই আমার সব;
নাম শুধু কোলাহল ও কুহেলি—
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় আচ্ছন্ন।

এই উক্তি সম্বন্ধে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন: এখানে ফাউস্‌ট শুধু কথার জাল রচনা করেছে, তার উদ্দেশ্য মার্গারেটকে ভোলানো। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয় না কেননা ঈশ্বর সম্বন্ধে গ্যেটে এই ধরণের উক্তি বহু জায়গায় করেছেন।

ফাউস্‌টের কথা শুনে মার্গারেট কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলো, বল্লে, ধর্মযাজকও এই ধরণের কথা বলেন, তবে একটু ভিন্ন ভাবে। তবু সে বল্লে, হয়ত ফাউস্‌ট খৃষ্টান নয়—

বহুদিন ধরে' দেখে দুঃখ পাচ্ছি
তোমার সংস্রব এমন লোকের সঙ্গে।

ফাউসট বল্লে—

কেন?

মার্গারেট বল্লে—

তোমার সঙ্গে ফেরে যে লোকটি, তোমার বন্ধু,
তার প্রতি আমার ঘৃণা অন্তরের অন্তস্থল থেকে;
সারা জীবনে
কিছুই জাগায়নি আমার অন্তরে এমন তীব্র ঘৃণা
যেমন তার বিকট মুখ।

ফাউস্‌ট বল্লে—

না না—ভয় করো না তাকে প্রিয়তমে।

মার্গারেট বল্লে—

তাকে দেখে আমার রক্ত যায় হিম হয়ে।
আর কারো প্রতি বিরূপ নয় আমার মন,
কিন্তু তোমাকে দেখার জন্য আমার মন যতই উতলা হোক
তাকে দেখেই আমাতে জাগে অদ্ভুত ভয়;
আমার জোর বিশ্বাস লোকটা মন্দ!
ভগবান ক্ষমা করুন যদি তার প্রতি অন্যায় করে' থাকি।

ফাউসট বল্লে—

জগতে বহু অদ্ভুত লোক ত আছেই।

মার্গারেট বল্লে—

তার মতো লোকের সংসর্গে যেন কখনো আমাকে কাটাতে না হয়।
ঘরের ভিতরে যখন সে আসে,
চারদিকে সে তাকায় বিতৃষ্ণা-ভরা দৃষ্টিতে,
প্রকাশ পায় তার অশুভ ইচ্ছা;
বোঝা যায় কিছুরই জন্ম নেই তার দরদ।
তার মুখের উপরে পরিষ্কার ছাপ মারা রয়েছে—
ভালবাসা তার কাছে উপহাসের বস্তু।
তোমার বাহু-বন্ধনে কত সুখী,
কত ভয়ভাবনাহীন, কত অনুগত, কত প্রেমময় আমি;
কিন্তু সে সামনে এলে আমার হৃদয় হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত।

ফাউসট বল্লে—

অমঙ্গল-আশঙ্কী দেবদূত তুমি!

মার্গারেট বল্লে—

এত অভিভূত হয়ে পড়ি আমি
যে তার পদধ্বনি কানে এলে
আমার অন্তর থেকে যেন তোমারও প্রতি ভালবাসা পায় লোপ।
সে কাছে থাকলে আমার আসে না ভগবানের কাছে প্রার্থনা।
তাতে আমার অন্তরে জ্বলে আগুন;
হাইনরিখ, প্রিয়তম, তোমারও দশা নিশ্চয়ই তেমন হয়।

ফাউসট বল্লে—

এর নাম বিতৃষ্ণা।

এইবার মার্গারেট যেতে চাইলে। ফাউসট প্রার্থনা জানালো তাদের নিবিড়তর মিলনের। মার্গারেট বল্লে, তার কামরার দরজার খিল সে খুলে রাখতে পারতো, কিন্তু সে ঘুমায় তার মায়ের সঙ্গে, আর তার মায়ের ঘুম হয়ে পড়েছে বড় পাতলা। ফাউসট তাকে ঘুমের ওষুধ দিলে, বল্লে, তিন ফোঁটা খাওয়ালে তার মা-র হবে গাঢ় ঘুম। মার্গারেট বল্লে—

কিইবা আমার না করবার আছে তোমার খুশীর জন্যে!
কোনো ক্ষতি ত হবে না এতে তার?

ফাউস্ট বল্লে—

তাহলে কি তোমাকে বলতাম এই ওষুধ দিতে ?

মার্গারেট বল্লে—

হায় বন্ধু, বুঝি না, তোমার মুখ দেখলেই
কেন হয়ে পড়ি তোমার এত অনুগত ;
তোমার জন্য করেছি ত বহু—
কিইবা আর আছে বাকি।

মার্গারেট চলে গেলে এলো মেফিসটো, বল্লে—

বাঁদরী ! গেছে নাকি ?

ফাউস্ট বল্লে—

আবার আড়িপাতা শুরু করেছ ?

মেফিসটো বল্লে—

শুনেছি সবই,—
আচার্যদেবের নিষ্ঠার এইবার হয়েছে পুরো পরীক্ষা ;
নিশ্চয়ই এতে খুব উপকার হবে তাঁর !
ছুঁড়ীরা জানবার জন্য খুব ব্যগ্র
তাদের নাগরদের সনাতন ধর্মমত ঠিকঠাক আছে কিনা,
সেখানে যদি তাদের দেখে অনুগত তবে বোঝে তাদের বাগানো হবে সোজা।

ফাউস্ট বল্লে—

পিশাচ, তোমার চোখে কখনো পড়বে না, বুঝবারও সাধ্য নেই তোমার,
এই পরম পবিত্র আত্মা, জাগ্রত প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ,
অপূর্বপ্রেমময়, অনির্বচনীয়—
সরল বিশ্বাস যার চোখে মুক্তির একমাত্র উপায়—কত ব্যথিত সে
এই ভাবনায় যে তার প্রেমিক চলেছে বিনাশের পথে !

মেফিসটো বল্লে—

ওগো রূপ-মুগ্ধ, অতিরূপ-মুগ্ধ !
তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে চালাচ্ছে এক ছুঁড়ী।

ফাউসট আরো গালাগালি করলে। মেফিসটো বল্লে—

দেখছি মুখ দেখে মানুষ চেনার বিদ্যায় ইনি ওস্তাদ হয়ে উঠেছেন !
আমাকে দেখেই বুঝে ফেলেন তিনি—কেমন করে' তা আর বলে উঠতে পারেন না ;

আমার মুখোসে তিনি গন্ধ পেয়েছেন ভয়ঙ্কর-কিছুর ;
সন্দেহ আর তাঁর নেই যে আমি কোনো অপদেবতা,—
হয়ত বা শয়তান স্বয়ং !
ভাল ভাল—আজ রাত্রে ?

ফাউসট বল্লে—

তাতে তোমার কি ?

মেফিসটো বল্লে—

তাতে আমারও খুশী।

সপ্তদশ দৃশ্য

ঝরণার ধারে

জল আনতে গিয়ে মার্গারেটের আলাপ হচ্ছে লিস্‌বেথ নাম্নী এক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে। লিসবেথ সংবাদ দিচ্ছে পাড়ার এক কুমারীর পতনের ; অতি কঠোর মন্তব্যে সে এই দুর্ভাগিনী মেয়েটিকে বিঁধছে—মেয়েরা এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন করে' থাকে। এই বিপন্না কুমারীর দশা মার্গারেটকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তার নিজের অবস্থার কথা। বাড়ী ফিরে একা একা সে বলছে—

কি গালাগালিই না একদিন করেছি
যখন শুনেছি কোনো অভাগিনী কুমারীর পতনের কথা !
মুখে যতটা কুলোয় তার চাইতেও
বেশী বকাবকি করেছি অন্যের অপরাধ নিয়ে।
অপরাধ যত এঁকেছি তাকে আরো কুৎসিত করে',
ভেবেছি তাকে আরো বীভৎস,
আর নিজেকে জ্ঞান করেছি একান্ত ভাগ্যবতী ;—
কিন্তু আজ—আমি পাপের মূর্তি !
আহা, আমাকে যা আকর্ষণ করেছিল বিপথে,
ভগবান, তা কত সুন্দর ! কত মধুর !

অষ্টাদশ দৃশ্য

শহরের ফটক-সংলগ্ন ছোট মন্দির, তার দেয়ালের কুলুঙ্গিতে মেরী-মাতার মূর্তি, সেই মূর্তির সামনে ফুলদানিতে নতুন ফুল সাজাতে সাজাতে মার্গারেট প্রার্থনা করছে—

চাও ওগো কুমারী,
ব্যথায় পূর্ণা,
সদয় মুখে আমার ব্যথায় 'পরে !

বক্ষে তোমার বিদ্ধ হয়ে আছে তরবারি,
অসীম যাতনায়
তাকিয়ে রয়েছ তুমি হত পুত্রের পানে !

তাকিয়ে রয়েছ স্বর্গের পিতার পানে ;
তোমার দীর্ঘশ্বাস
বহন করছে তোমার ও স্বর্গের পিতার বেদনা !

হায়, ধারণার অতীত,
প্রকাশের অতীত,
যে যাতনায় পিষ্ট হচ্ছে আমার মজ্জা !
কেন নিরবধি জ্বলছে এই হৃদয়,
কেন কাঁপছে, কেন মিনতি করছে,
জানো তুমি, শুধু তুমি !

হায় যেখানেই যাই,
যাতনা, যাতনা, যাতনা—
যাতনায় জর্জর আমার বুক !
একা—ঘুম নেই চোখে—
কাঁদি কাঁদি, কাঁদি রাত্রি দিন,
ভেঙে খান খান হয় আমার অন্তর ।

জানালার ফুলদানিগুলো
সিক্ত হয়েছিল আমার চোখের জলে,
তুলেছিলাম যখন এই সব ফুল
প্রভাতে তোমার মন্দির সাজাবার জন্যে ।

আমার নির্জন কক্ষে
প্রবেশ করেছিল প্রভাতের রক্তরশ্মি,—

তখন দুঃসহ বেদনায়
জেগে বসে' আমি শয্যার পরে !

দয়া কর, উদ্ধার কর মৃত্যু আর কলঙ্ক থেকে !
ওগো কুমারী,
ব্যথায় পূর্ণা,
চাও মুখ তুলে আমার ব্যথার পরে !

ঊনবিংশ দৃশ্য

রাত্রি—মার্গারেটের কক্ষের সামনের রাজপথ

সৈনিক ভালেন্‌টিন—মার্গারেটের ভাই—তার গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করছে মার্গারেটের পতনের জন্যে—যে-মার্গারেটকে নিয়ে একদিন সে বুক ফুলিয়ে কথা বলেছে তার ইয়ারদের বৈঠকে। আজ সেই ইয়ারদের সামনে সে হৃতমান, লাঞ্ছিত, দিশাহারা।

অদূরে দেখা দিল ফাউসট ও মেফিসটো। ভালেন্‌টিনের সন্দেহ হলো এরাই মার্গারেটের সর্বনাশকারী। সে তাদের আক্রমণ করলে। দুপক্ষে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হলো। শেষে মেফিসটোর নির্দেশে ফাউসটের আঘাতে ধরাশায়ী হলো ভালেন্‌টিন। মেফিসটো ফাউসটকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এই যোদ্ধাদের তর্জন-গর্জনে আকৃষ্ট হয়ে এলো মার্থা, মার্গারেট ও আরো বহু লোক। মুমূর্ষু ভালেন্‌টিন কঠোর ভাষায় মার্গারেটকে তিরস্কার করলে; মার্থার কথায় চটে গিয়ে বল্লে—তার মতো দূতীকে শেষ করে'যেতে পারলে সে সহজেই লাভ করতে পারতো তার সব অপরাধের জন্য মার্জনা। অনতিবিলম্বে তার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেল।

বিংশ দৃশ্য

গির্জা

গম্ভীরস্বরে ধর্মসঙ্গীত গীত হচ্ছে। মার্গারেটের পাশে বসে এক অপদেবতা: সে ক্রমাগত মার্গারেটকে শোনাচ্ছে তার দুষ্কৃতির কথা—তার হাতের ঘুমের ওষুধে তার মা গেছে মারা, তার জন্যে তার ভাই হয়েছে খুন, তার লজ্জাকর সন্তান-সম্ভাবনা—এই সব। সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী বাণীতে অন্যান্য প্রার্থনাকারী পাচ্ছে সান্ত্বনা, কিন্তু সেই বাণীতে মার্গারেটের অন্তরের অস্বস্তি হচ্ছে তীব্রতর। শেষে সে মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

একবিংশ দৃশ্য

ভাল্‌পুর্গিস-এর রাত্রি

ভালপুর্গিস হচ্ছেন অষ্টম শতাব্দীর এক মেয়ে-সাধু। প্রাচীন টিউটন-ধর্মের পরাভব ও নব খৃষ্টান ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার পরে ইনি জার্মানীতে হলাণ্ডে ও ইংলণ্ডে খুব জনপ্রিয় হন। এঁর উৎসবের দিন ছিল ১লা মে। সেই দিনই ছিল প্রাচীন ধর্মের এক পর্বদিন—টিউটনরা সেদিন নির্দিষ্ট গিরিশিখরসমূহে তাদের বলি-উৎসব সমাধা করতো ও আলো জ্বালতো। নব ধর্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ধর্মের দেবতারা হয়ে পড়লো অপদেবতা। কিন্তু প্রাচীন ও নবীনের অদ্ভুত মিশ্রণের ফলে কালে কালে এই ভালপুর্গিস-রাত্রির উৎসব ব্লক্‌স্‌বের্গ (Blocksberg) পর্বতচূড়ায় প্রেত-প্রেতিনীর উৎসবরূপে জনপ্রসিদ্ধি লাভ করল।

পাহাড়ের উপরে ফাউস্ট ও মেফিসটোফিলিস উঠ্‌লো আলেয়ার আলোকে পথ দেখে। এই প্রেত-প্রেতিনীদের বা ডাক-ডাকিনীদের সম্মেলনে খুব স্ফূর্তি চলেছে—উচ্ছৃঙ্খল নাচ গান তার অঙ্গ। তরুণী প্রেতিনীরা দিগ্‌বসনা, আর বৃদ্ধারা নিজেদের আবৃত করেছে সযত্নে। এক বুড়ীর সঙ্গে নাচলো আর অশ্লীল গান গাইলে মেফিসটো, আর এক তরুণীর সঙ্গে নাচলো ফাউস্ট। কিন্তু ফাউস্ট আনন্দবোধ করলে না।

হঠাৎ দূরে যেন সে দেখলে মার্গারেটের মূর্তি—এখন দেখাচ্ছে ফেকাশে, বিমর্ষ; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সে....যেন তার পায়ে বেড়ি। মেফিস্‌টোকে সে জিজ্ঞাসা করলে এ সম্বন্ধে। মেফিসটো বল্লে—কিছু নয়, সব ভোজবাজি।—সে ফাউসটের মনোযোগ আকর্ষণ করলে পাহাড়ের আর এক চূড়ায় যে নাটক চলেছে তার দিকে।

দ্বাবিংশ দৃশ্য

ভাল্‌পুর্গিসের রাত্রির স্বপ্ন

পরীদের রাজা-রাণী ওবেরন ও টিটানিয়ার বিবাহের স্বর্ণজুবিলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (শেক্‌স্‌পীয়রের Midsummer Night's Dream স্মরণীয়)। তাতে নানা দেবযোনি ও প্রেতাত্মার সম্মেলন হয়েছে। এই সব দেবযোনি ও প্রেতাত্মার কথাবার্তার সাহায্যে কবি বিদ্রূপ করেছেন স্‌টোলবের্গ-ভ্রাতৃদ্বয়, নিকোলাই, লাফাটর, ফিক্‌টে, হেনিংস্‌ প্রমুখ সমসাময়িক সমালোচক, কবি, শিল্পী, দার্শনিক ও জননেতাদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা নিয়ে।

মূল ফাউস্ট-পরিকল্পনায় এর স্থান ছিল না। প্রধানত শিলারের আগ্রহে এটি 'ফাউস্টে'র অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সার্থকতা হয়ত এই যে ফাউস্ট ডাকিনীদের সঙ্গলাভ

করে আনন্দিত হতে পারেনি তাই মেফিসটো তাকে খুশী করতে চেষ্টা করছে চিন্তা-জগতের এই অদ্ভুত দৃশ্যের দ্বারা।

এই ধরণের আর একটি রূপক দৃশ্যও কবি এর পরে যোগ করতে চেয়েছিলেন—তার খানিকটা লেখাও হয়েছিল; কিন্তু সেটি আর যোগ করা হয়নি। বেয়ার্ড টেইলরের গ্রন্থের ভাষ্যে সেটি উদ্ধৃত হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

মেঘাবৃত দিন—প্রান্তর

সমস্ত নাটকে শুধু এই দৃশ্যটি গদ্যে লিখিত।

ফাউস্ট জানতে পেরেছে মার্গারেট অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার মৃত্যু অবধারিত। দুঃখে দুশ্চিন্তায় সে প্রায় পাগল হয়ে গেছে। মেফিসটোকে সে বলছে—

> ....বিশ্বাসঘাতক অপদার্থ, তুমি এসব লুকিয়ে রেখেছ আমার কাছ থেকে!....বন্দী সে! উদ্ধারের আশা নেই !...আর আমাকে রেখেছ ভুলিয়ে বিস্বাদ আমোদে, জানতে দাওনি তার বর্তমান দুর্দশা, পড়তে দিয়েছ তাকে এমন ভাবে ধ্বংসের কবলে!

মেফিসটো শান্ত কণ্ঠে বল্লে—সে-ই ত প্রথম নয়।

ফাউস্ট উত্তেজিত হয়ে বিষম গালাগালি করলে, বল্লে, মেফিসটোর চিরদিনের জন্য লাভ হোক ঘৃণিত কুকুরের রূপ—যে রূপ সে কখনো কখনো ধারণা করে। সে বলতে লাগ্‌লো—

> ...প্রথম নয়! হায় হায়, এ দুঃখ মানবধারণার অতীত যে একাধিক ব্যক্তি বিনষ্ট হয়েছে এমন দুর্দশায়—অনন্তক্ষমাশীলের সামনে একজনের এমন নিদারুণ বিনাশে সবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি কি? একজনের দুঃখে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে আমার মর্ম, আর তুমি শান্তভাবে হাসছো সহস্রের বিনাশ দেখে!

মেফিসটো বল্লে :—

> মানুষকে এমন দিশাহারা হতে দেখে আমাদেরও বুদ্ধি যায় ঘুলিয়ে। যদি না-ই পারবে তবে আস কেন আমাদের সঙ্গে? চাও উড়তে, অথচ মাথাঘোরা সম্বন্ধে সাবধান হওনি? আমরা গিয়েছিলাম তোমার কাছে, না তুমি এসেছিলে আমাদের কাছে?

ফাউসট বল্লে—

> অমন করে তোমার বিকট দাঁত দেখিও না আমাকে! আমার ভয়ানক

ঘৃণার উদ্রেক হয়।—পরমমহিমময়, তুমি প্রকাশ করেছ নিজেকে আমার সামনে, জান তুমি আমার অন্তরাত্মা। কেন তুমি আমাকে যুক্ত করেছ এমন শ্রেন-স্বভাব সঙ্গীর সঙ্গে যার উপজীবিকা অনর্থ, যার আনন্দ ধ্বংসে।

মেফিস্টো বল্লে—

বক্তব্য শেষ হয়েছে?

ফাউসট বল্লে—

তাকে উদ্ধার কর! নইলে নিপাত যাও! চরম অভিশাপে অভিশপ্ত হও অন্তহীন কালের জন্য!

মেফিসটো বল্লে—

কর্মফলের বন্ধন শিথিল করবার সাধ্য আমার নেই, তার নিক্ষিপ্ত বজ্র রোধ করতেও পারবো না।—তাকে উদ্ধার করো! কে তাকে নিক্ষেপ করেছে ধ্বংসের তরঙ্গে? আমি না তুমি?

ফাউস্ট পাগলের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌লো। ঠিক হলো মেফিসটো ফাউসটকে নিয়ে যাবে মার্গারেটের কারাকক্ষে তাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করবার জন্য যা করবার সব করবে।

চতুর্বিংশ দৃশ্য

রাত্রি—প্রান্তর

মেফিস্‌টো ও ফাউস্ট উড়ে চলেছে কালো মায়া-ঘোড়ায় চড়ে। তারা দেখলে মিস্ত্রীরা বধমঞ্চের মতো কি এক জিনিষ তৈরি করছে। অতি ছোট দৃশ্য এটি, কিন্তু এই ছোট্ট দৃশ্যে রাত্রির স্তব্ধতা আর মার্গারেটের বধের আয়োজনের ভীষণতা চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কারাগার

কারাগারের লোহার দরজার সামনে চাবির গোছা ও প্রদীপহাতে ফাউস্ট :-

এক অজানা আতঙ্ক অনুভব করছি আমি ;
মানুষের পুঞ্জীভূত দুঃখ অভিভূত করছে আমাকে এই স্থানে।
এই অন্ধ আর্দ্র কারাগারে বন্দী সে,
কিন্তু তার সমস্ত অপরাধ হচ্ছে এক মধুর মোহ!

তাকে মুক্ত করতে এখনো করছি দেরী ?
তার সম্মুখীন হতে হচ্ছি ভীত ?
আর দেরী নয়—আমার দ্বিধা ত্বরান্বিত করছে তার মৃত্যু।

[সে তালা খুলতে লাগ্‌লো ; ভিতর থেকে আসছে গানের সুর।

বধ্‌লো মোরে মা কুলটা,
ফেল্ল খেয়ে পাষাণ বাপ !
দরদী বোন বনের মাঝে
হাড়ে দিল মাটির চাপ !
গাছের ছায়ে ধীর বাতাসে
হৈলাম বনের পাখী রে,
গান গাই, আর বনে বনে
উড়ি উড়ি উড়ি রে !

ফাউস্‌ট (তালা খুলতে খুলতে)—

সে ভাবতেও পারছে না তার প্রেমিক এত কাছে ;
তার কানে যাচ্ছে তার শিকলের ঝনঝন, খড়ের বিছানার মচমচ।

[ভিতরে প্রবেশ করলে।

মার্গারেট (খড়ের বিছানায় মুখ লুকিয়ে)—

হায় হায় ! ঐ আসছে ! ওঃ মরা কি কষ্টের !

ফাউস্‌ট (চাপা গলায়)—

চুপ চুপ—কোনো শব্দ নয়—আমি এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে।

মার্গারেট (তার সামনে লুটিয়ে)—

তুমি ত মানুষ ! আমার দুঃখের পানে চাও।

ফাউস্‌ট—

তোমার চেঁচামেচিতে প্রহরীরা জেগে উঠ্‌বে, তোমাকে পাক্‌ড়াও করবে

[সে শিকল হাতে নিয়ে খুলতে চেষ্টা করলে।

মার্গারেট (জানুপেতে বসে)—

ওগো জল্লাদ, কে তোমাকে দিয়েছে
আমার উপরে এত ক্ষমতা ?
রাত দুপুরে তুমি আমাকে নিতে এসেছ :
দয়া কর, বাঁচতে দাও আমাকে ;
ভোরের ঘণ্টা বেজেছে বেশীক্ষণ ত হয়নি !

[সে উঠে দাঁড়ালো।

কত কম আমার বয়স, কত কম !
মরবো এত শীগগির !
রূপও ছিল আমার—তাই হয়েছিল আমার কাল।
বন্ধু ছিল কাছে, এখন সে দূরে :
মালা গেছে ছিঁড়ে, ফুল সব পড়েছে ছড়িয়ে।
অত কষে ধরো না আমার হাত !
ছেড়ে দাও আমাকে, কি করেছি আমি তোমার ?
রাখো, রাখো আমার মিনতি !
কোনো দিন তোমাকে দেখিনি এর পুর্বে !

ফাউস্‌ট—

এও সইতে হবে আমাকে ?

মার্গারেট—

আমি ত এখন সম্পূর্ণ তোমার হাতে।
কিন্তু আগে আমার বাছাকে দুধ দিতে দাও !
সমস্ত রাত আমি তাকে বুকে করে' রেখেছিলাম ;
আমার কাছ থেকে তাকে ওরা নিয়ে গেল, আমাকে বিরক্ত করার জন্যে,
এখন বলছে কি না আমি মেরে ফেলেছি' তাকে।
আর মনে সুখ পাব না কখনো।
আমায় নিয়ে ওরা গান বেঁধেছে ! বড় বদ ওরা !
একটা পুরোনো গানের ঐ রকম ধুয়ো ;
কে বল্লে ওদের সেই গান এমন করে' গাইতে ?

ফাউস্‌ট (জানু পেতে বসে।)—

তোমার সামনে লুটিয়ে তোমার চিরদিনের প্রেমিক !
ঘোচাতে চায় সে তোমার সব দুঃখ।

মার্গারেট (তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে।)—

এসো, জানু পেতে সাধুদের আমরা ডাকি আমাদের লুকিয়ে রাখতে !
পাশের সিঁড়ির নীচে,
চৌকাঠের নীচে,
ঐ দেখ জলজল করে' জলছে নরকের আগুন !
শয়তান
ভয়ঙ্কর গর্জন করে'

খুঁজে ফিরছে
তার শিকার

ফাউস্‌ট—

মার্গারেট ! মার্গারেট !

(মার্গারেট কান পেতে শুনে)

এই কণ্ঠস্বর ছিল আমার বন্ধুর !

[সে সোজা উঠে দাঁড়ালো, তার শিকল খুলে পড়লো ।]

কোথায় সে ? শুনলাম সে আমাকে ডাকছে ।
মুক্ত আমি ! কেউ বন্দী করতে পারবে না আমাকে ।
ছুটে গিয়ে ধরবো তার গলা জড়িয়ে,
রইব তার বুকে লুটিয়ে !
দরজায় দাঁড়িয়ে সে ডাকলে—মার্গারেট !
চারদিকে তখন নরকের দাউ দাউ আগুন আর বিশ্রী চীৎকার,
আমার বন্ধুর আদরভরা মধুর কণ্ঠ আমি চিনলাম !

ফাউস্‌ট—

সে আমি !

মার্গারেট—

তুমি ! ওগো আর একবার বলো !

[তাকে জড়িয়ে ধরে']

হাঁ সেই ! সেই ! কোথায় আমার সব যন্ত্রণা !
কারাগারের দুঃখ আর বেড়ি ?
আমি পেয়েছি উদ্ধার !—
আবার দেখছি সেই রাস্তা
প্রথমে তোমাকে যেখানে দেখেছিলাম ;
আর সেই বাগানে, কত ফুল ফুটে আছে,
মার্থা আর আমি চেয়ে থাকতাম তোমার আসার পথ পানে ।

ফাউস্‌ট (তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে')—

এসো, এসো আমার সঙ্গে !

মার্গারেট—

আর একটুকু থাকো, তুমি থাকলে মন চায় না যাই !

[আদর করতে লাগল ।]

ফাউস্ট—

শীগগির চল—এখনি!
যদি আর দেরী কর
তবে আমাদের পস্তামোর অবধি থাকবে না।

মার্গারেট—

চুমো খাও!—আর খেতে পার না?
বন্ধু, চলে গেছ ত সেদিন,
এরই মধ্যে ভুলে গেছ চুমো খাওয়া?
তোমার বুকে আছি, তবু মন কেন আমার এত উতলা?
এই বুক একদিন আমার জন্য হয়েছিল স্বর্গ
তোমার চোখের চাহনি, তোমার মুখের কথা থেকে,—
তুমি চুমো খেতে—চুমো খেয়ে খেয়ে যেন আমার দম বন্ধ করে' দিতে।
খাও চুমো!
নইলে আমি চুমো খাব!

[ফাউস্টকে আলিঙ্গন করলে]

আহ্ হা—তোমার ঠোঁট ত হিম!
একটুও নড়ে না।
কোথায় তোমার ভালবাসা!
কে করলে আমার এমন ক্ষতি!

[সে ফাউস্‌কে ছেড়ে চলে গেল।]

ফাউস্ট—

এসো, আমার সঙ্গে এসো! একটু সাহস কর লক্ষ্মী:
এই শীগগিরই তোমাকে বুকে নিয়ে আদর করবো হাজার গুণ;
এখন এসো আমার সঙ্গে! রাখো আমার কথা।

[মার্গারেট তার দিকে ফিরে)

তুমিই ত! ঠিকই তুমি!

ফাউস্ট—

হাঁ আমি! চলে এসো!

মার্গারেট—

তুমি দেবে আমার শিকল খুলে,
নেবে আবার আমাকে কোলে,

কিন্তু আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ না কেন ?—
জানো, জানো বন্ধু, দিচ্ছ কার শিকল খুলে ?

ফাউস্ট—

শীগগির এসো ! আর রাত নেই ।

মার্গারেট—

আমার মাকে আমি ফেলেছি মেরে ;
আমার ছেলেকে দিয়েছি জলে ডুবিয়ে ;
ও-ছেলে কি আমাদের হু'জনের নয়—তোমারও নয় ?
সত্যিই তুমি ! বিশ্বাস ত হয় না—
আমার হাতে রাখো তোমার হাত ! স্বপ্ন নয় !
তোমারই আদরের হাত !—কিন্তু এ যে ভিজা !
মুছে ফেলো, মুছে ফেলো ! মনে হচ্ছে
এখনো হাতে লেগে রয়েছে রক্ত !
হা ভগবান—করেছ কি তুমি ?
রাখো তলোয়ার রাখো খাপে !
মিনতি করছি !

ফাউস্ট—

ভুলে যাও প্রিয়তমে, যা হয়ে গেছে,
তোমার প্রতি কথা হানছে আমাকে মৃত্যু-বাণ !

মার্গারেট—

না মা ! তুমি বেঁচে থেকে আমাদের জন্য ফেলো চোখের জল
শোনো এখন কেমন করে দেবে আমাদের কবর ;
করবে এসব
কালই ;
সব চাইতে ভাল জায়গায় দেবে মা-র কবর,
তার পাশে আমার ভাইয়ের কবর,
আমার কবর দেবে একটু দূরে,
খুব দূরে কিন্তু নয় !
আমার বাছাকে দেবে আমার ডান বুকের কাছে শুইয়ে ;
আর কেউ থাকবে না আমার পাশে !—
আহা, তোমার বাহু-বন্ধনে জড়িয়ে থাকা
ছিল আমার স্বর্গ-সুখ !

আর পাব না, আর পাব না সে সুখ !
আমার সাধ তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরি প্রিয়তম,
কিন্তু তুমি ত চাও না আমার চুমো ;
তবু ত সেই তুমি—দেখছি তোমার আদর-ভরা চাহনি !

ফাউস্ট—

যদি বোঝো সেই আমি, তবে এসো আমার সঙ্গে !

মার্গারেট—

কোথায়—বাইরে !

ফাউস্ট—

হাঁ, বাইরে গেলেই মুক্তি !

মার্গারেট—

যদি বাইরেও থাকে কবর—মৃত্যু থাকে ওঁৎ পেতে !
এখান থেকে যাবো চিরবিশ্রামের জায়গায় ;
আর কোথাও নয়—কোথাও নয় !
চলে যাচ্ছ তুমি ? হায় হাইনরিখ, আমিও যদি পারতাম যেতে !

ফাউস্ট—

পার তুমি ! সবল কর তোমার ইচ্ছা ! দরজা খোলা।

মার্গারেট—

সাহস করি না আর যেতে : আর নেই আশা।
পালিয়ে গিয়ে কি হবে ? তারা ত নেবে আমার পিছু !
বাঁচতে হবে আমাকে ভিক্ষা করে',
এর উপরে রয়েছে বিবেকের যন্ত্রণা !
কত কষ্টের হবে বিদেশে বিভুঁয়ে পালিয়ে বেড়ানো,
এত করেও শেষে ত পড়তে হবে ধরা !

ফাউস্ট—

আমি থাকবো তোমার সঙ্গে !

মার্গারেট—

শীগগির ! শীগগির !
রক্ষা কর তোমার জলে ডোবা ছেলে !
যাও যাও ! সরু পথ ধরে,
খালের ধার দিয়ে,
পুলের উপর দিয়ে,

বনের মধ্যে,
বাঁয়ে যেখানে তক্তা দেওয়া আছে
ডোবায়।
তাড়াতাড়ি ধরো!
তুলে ফেলো!
এখন হাঁসফাঁস করছে!
বাঁচাও! বাঁচাও!

ফাউস্ট—

গ্রেটখেন, প্রেমময়ী, একটু মাথা ঠিক কর!
একটু চেষ্টা করলেই ত পাও মুক্তি!

মার্গারেট—

যদি শুধু সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে পারতাম!
আমার মা সেখানে বসে' রয়েছে এক পাথরের উপরে,—
ভয়ে হিম হয়ে আসে আমার সব শরীর!
আমার মা রয়েছে বসে' এক পাথরের উপরে,
তার মাথা ঢুলে ঢুলে পড়ছে,
তার চোখের পাতা পড়ছে না, মাথা নড়ছে না, তার ভারী মাথা পড়লো লুটিয়ে,
এত ঘুম তার—আর জাগবে না।
সে ঘুমুচ্ছিল—আমাদের কাটছিল আনন্দে;
হায়, কত সুখের ছিল সে-সব দিন!

ফাউস্ট—

কথায় আর অনুনয়ে কিছুই হবে না;
তোমাকে নিয়ে যাব জোর করে' তুলে।

মার্গারেট—

না— ছেড়ে দাও আমাকে! জোর করো না বলছি!
অমন খুনীর মতো ধরো না আমাকে!
তোমার ভালবাসার জন্যে করেছি ত সবই।

ফাউস্ট—

ভোর হয়ে গেল: প্রেমময়ী আমার! প্রেমময়ী আমার!

মার্গারেট—

ভোর হলো! হাঁ ভোর হলো—আমার জন্য শেষ ভোর!

এই দিন হতে পারতো আমার বিয়ের দিন।
বলো না কাউকে ছিলে তুমি মার্গারেটের সঙ্গে :
হায় আমার ফুলের মালা !—
সব গেছে নষ্ট হয়ে !
আবার হবে আমাদের দেখা।
কিন্তু নাচের মজলিসে নয় !
লোক জড়ো হচ্ছে কারো মুখে কথা নেই,
ভরে যাচ্ছে মাঠ ময়দান
আর রাস্তা :
মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে·······
ধরছে আমাকে, বাঁধছে ! নিয়ে যাচ্ছে
বধের জায়গায়—ইঙ্গিত করছে।
প্রত্যেকের ঘাড় কাঁপলো যেমন উদ্যত হলো
চকচকে অস্ত্র আমার ঘাড়ের পরে !
জগৎ পড়ে রইল কবরের মতো নিঝুম !

ফাউস্ট—
হায়—যদি আদৌ জন্ম না হতো আমার !

মেফিস্টো (বাইরের দরজার সামনে)—
চলে এসো, নইলে গ্যাছ !
দেরী, সাধাসাধি, ভয়, সব বৃথা !
আমার ঘোড়াগুলো শীতে কাঁপছে ;
ভোর হলো বলে'।

মার্গারেট—
দরজার ওখানে ভূতের মতো মাথা জাগিয়ে উঠ্‌লো কে ?
সেই লোক ! সে ! তাড়িয়ে দাও ওকে !
এই পবিত্র জায়গায় ওর কি দরকার ?
আমাকে চায় নাকি !

ফাউস্ট—
বাঁচাবোই তোমাকে।

মার্গারেট—
ভগবানের বিচার ! এই আমি হাজির তোমার সামনে।

মেফিস্‌টো—

চলে এসো চলে এসো! নইলে তার অদৃষ্টের ভাগী হতে হবে তোমাকে।

মার্গারেট—

পিতা, তোমারি আমি। উদ্ধার কর আমাকে।

যত আছ দেবদূত, দেবদূত-বাহিনী, এসো নেমে।

ঘিরে দাঁড়াও আমার চারদিকে, রক্ষা কর আমাকে।

হাইনরিখ, তোমার দশা দেখে ভয় পাচ্ছি।

মেফিস্‌টো—

হাঁ তার বিচার যা হবার তা হলো!

শব্দ (উপর থেকে)—

সে উদ্ধার পেল।

মেফিসটো (ফাউসটের প্রতি)—

এসো আমার সঙ্গে।

[ফাউসটকে নিয়ে সে চলে গেল।

ভিতর থেকে বিলীয়মান শব্দ—হাইন্‌রিখ! হাইন্‌রিখ!

এই দৃশ্য সম্বন্ধে লুইস বলেন, এর অসহ করুণতা আমাদের চোখে জল আনে বিশ বারের পাঠেও। তাঁর মতে এর মূলের সহজ সরল অতি গভীর বেদনা ভাষান্তরে প্রকাশ অসম্ভব। মার্গারেট সম্বন্ধে তিনি বলেন—

স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়রও মার্গারেটের মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি—
হৃদয়াবেগ, সরলতা, অকৃত্রিমতা ও কমনীয়তার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ।

সেই সঙ্গে স্মরণ করা দরকার মার্গারেটের অন্তরের অপূর্ব পবিত্রতা। তার হৃদয়াবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে এই পবিত্রতা সুসঙ্গত—যেমন সহজ ও প্রবল তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তেমনি সহজ ও প্রবল তার পবিত্রতা।

ক্রোচে বলেছেন, আদিতে মার্গারেটে প্রকাশ পেয়েছে সহজ প্রবৃত্তি, কিন্তু পরে তাতে জেগে উঠেছে "আত্মা"। তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ না করলেও চলে! কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, মার্গারেটে আগাগোড়া "সহজ-প্রবৃত্তি" ও "আত্মা"র অপূর্ব সমাবেশ; অথবা "সহজ প্রবৃত্তি" ও "আত্মা" এ দুয়ের বিরোধ তার মধ্যে নেই—যেমন গ্যেটের মধ্যে নেই বলা চলে। তার করুণ অনুশোচনা (অষ্টাদশ দৃশ্যে) আসলে হয়তো পাপ-বোধ নয়, অপ্রত্যাশিত অকরুণ ঘটনার সামনে অসহায়তা-বোধ ও শালীনতা-বোধ। ভগবানে বা পরমকল্যাণে ও সৌন্দর্যে তার প্রত্যয় যে সহজাত তার পরিচয় তার 'পতনে'র পূর্বেই আমরা পেয়েছি।—মার্গারেট সম্পর্কে ক্রোচের শেষ মন্তব্যটি সুন্দর—

গ্রেট্‌খেনের বিষাদময় কাহিনী হচ্ছে কাব্য-জগতের সেই সব অলৌকিক ব্যাপারের অন্যতম যেসবে সম্মিলিত হয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তি, পূর্ণ পরিণতি ও অনায়াস, এ সবের উৎপত্তি-মূলে পূর্ণ-উদ্দীপ্ত কবি-কল্পনা—সেইক্ষণে প্রতি ব্যাপার কবির নয়নে প্রতিভাত হয়েছিল তার গভীরতম সত্য রূপে আর কবির মুখে উচ্চারিত হয়েছিল অব্যর্থ শব্দ—অব্যর্থ শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়।

ফাউস্‌ট-চরিত্রকে ক্রোচে দুইভাগে ভাগ করে দেখেছেন—প্রথম দিকের ফাউস্‌ট আর শেষের দিকের ফাউস্‌ট। এই দুটি তাঁর মতে দুই স্বতন্ত্র চরিত্র; প্রথম দিকের ফাউস্‌টের সঙ্গে মিল রয়েছে ভের্টরের, কিন্তু ফাউস্‌টের দুঃখ ভের্টরের তুলনায় অনেক উঁচুদরের; এই ফাউসটে ফুটে উঠেছে আধুনিক চিন্তার সঙ্কট—আধুনিক চিন্তা যে মুক্তি পেয়েছে প্রাচীন ধর্মমতের দাসত্ব থেকে অথচ এ পর্যন্ত তার লাভ হয়েছে শুষ্ক যুক্তিবাদ মাত্র, সেই ব্যাপারটি; চিন্তা যখন আত্ম-বিচারে রত হয় ও অতিক্রম করতে চেষ্টা করে স্বরচিত অসার সিদ্ধান্তের মায়াজাল সেই চিরন্তন মুহূর্ত রূপায়িত হয়েছে এই ফাউস্‌টে।—শেষের দিকের ফাউস্‌ট ক্রোচের মতে অপ্রধান চরিত্র। সে মোটের উপর এক দায়িত্বহীন তরুণ, ভোগে যার একান্ত আগ্রহ ও আনন্দ; শেষের দিকের প্রধান চরিত্র গ্রেটখেন।

ক্রোচের ফাউস্‌ট-চরিত্রের এমন বিভাগ আমরা স্বীকার করে নিতে পারিনি। এ সম্পর্কে একথাও স্মরণ করবার আছে যে মানুষের মনে প্রায়-পরস্পর-বিরোধী ভাব একই সময়ে খেলতে পারে, তাতে তার ব্যক্তিত্ব নষ্টই হয় না। শেষ দৃশ্যে গ্রেটখেনের দুর্ভাগ্যের সামনে ফাউস্‌টের যে মর্মভেদী উক্তি—

হায়—যদি আদৌ জন্ম না হতো আমার!

তার সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে প্রথম দিকের ফাউস্‌টের। ফাউস্‌ট-চরিত্র যদি বাস্তবিকই এমন দ্বিধাখণ্ডিত হতো তবে কাব্যহিসাবে ফাউস্‌ট কখনো এত চিত্তাকর্ষক হতে পারতো না, কেননা যা একই সঙ্গে বিচিত্র ও অখণ্ড নয় তাকে সার্থক শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে আমাদের মন মেনে নেয় না।—পণ্ডিতের বিচারের চাইতে বেশী মর্যাদা কালের বিচারের।

মেফিসটোফিলিসের পরিকল্পনায় তত্ত্বের প্রাধান্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মেফিসটোফিলিসও মোটের উপর ব্যক্তি হয়ে আমাদের সামনে বিরাজ করছে। সে মধ্যযুগের বিকট শয়তান নয়; একান্ত পরিচ্ছন্ন তার বুদ্ধি—মানুষের সমস্ত আবেগ-উৎসাহের বাড়াবাড়ির সামনে ফুটে রয়েছে তার চটুল হাসি। তার মুখোস পরে' অনেক সময়ে কথা বলেছেন গ্যেটে স্বয়ং। তাকে আমরা ভালবাসি না, সেই সঙ্গে তাকে ভুলতেও পারি না।

জার্মানীর অনেক দার্শনিক ও সমালোচক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে ফাউস্টে প্রকাশ পেয়েছে জীবন-সমস্যার সমাধানের ব্যাপকতম প্রয়াস। ক্রোচে বলেছেন তাঁদের সে-চেষ্টা অপচেষ্টা', কেননা, কাব্য জীবন-আলেখ্য জীবন-দর্শন নয়, জীবন-দর্শন যুগে যুগে বদলায়। কিন্তু ক্রোচের কথা একটু বিশেষিত করা দরকার। কবির প্রধান কাজ যে ছবি আঁকা তা মিথ্যা নয়, সেই ছবি আঁকার কাজে তিনি যদি সফলকাম না হন তবে তাঁর সব চেষ্টা হয় পণ্ডশ্রম এও মিথ্যা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে এও মিথ্যা নয় যে সেই ছবি আঁকার সঙ্গেই মিলিয়ে থাকে যাকে জীবন-দর্শন বা জীবনের গতিপথের নির্দেশ বলা হয় সেই ধরণের ব্যাপার—যেমন প্রকৃতির বিধানে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ফল। অবশ্য কবির নির্দেশ আর দার্শনিক বা সমালোচক বা নীতিবিদের নির্দেশ এক ধরণের ব্যাপার নয়। কবির নির্দেশের নাম দেওয়া যেতে পারে প্রেরণা-দান বা আলোক-দান। মহৎ কাব্যের সঙ্গে এই প্রেরণা-দান বা আলোক-দান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যেমন জীবন-ব্যাপারের সঙ্গেও এই প্রেরণার বা আলোকের অঙ্গাঙ্গী যোগ। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাণী স্মরণ করা যেতে পারে:

> ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভাল লাগল সেই জিতল ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভেতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।
>
> কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্য উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই ত মানুষের বিচার করা।

রোমান্টিকরা ফাউস্টকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁদের মতের এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসাবে। তাঁদের দাবি যে অপ্রবল নয় তার পরিচয় রয়েছে গ্যেটের নিজের এই উক্তিতে:

ফাউস্ট প্রথম খণ্ড মোটের উপর আত্মকেন্দ্রিক—এক দিশাহারা সঙ্কীর্ণ-পরিসর আবেগ-প্রধান প্রকৃতির পরিচয়।

কিন্তু রোমান্টিকদের দাবি অগ্রাহ্য করা যায় এই বিবেচনা থেকে যে সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও ফাউস্টে ফুটেছে জীবনের নিবিড় অনুভূতি ও রূপায়ণ,—রোমান্টিদের প্রবণতা সাধারণত সেদিকে নয়। রোমান্টিক মনোভাবকে গ্যেটে যে রুগ্‌ণ আখ্যা দিয়েছিলেন তা কটুক্তি নয়, গভীরভাবে সত্য; ভাববিলাসিতা 'রোমান্টিসিজমে'র প্রাণ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	২৪	১৭১৪-১৭৯১	১৭৪১-১৭৯১
৪৪	২৩	প্রেমে	প্রেরণায়
৪৮	১২	সাহায্য	সাহায্যে
১১৫	১৮	অন্যান্য	প্রকৃতির অন্যান্য
১১৮	৩	in	is
১১৮	১০	Passed	Pressed
১১৯	১৩	পতিব্রতপ্রাণা	পতিগতপ্রাণা
১৪৩	১০	সম্প্রদায়ের	সম্প্রদায়কে

নির্দেশিকা